ভূমিকা

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথের অমঙ্গলবোধ

আমরা একালে প্রত্যেকেই ভাড়া বাড়িতে বাস করি, আমার যিনি বাড়িঅলা তাঁকেও কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রচুর পরিমাণে কর দিতে হয়, শুধু এদের নয়, পাড়ায় গজিয়ে-ওঠা মস্তানদের টাকা না দিলে বাড়ির মালিক হয়েও বাস করা চলে না সেখানে। এ ছাড়া রাজনৈতিক পালা বদলের ভাঙা ইট মাঝে মাঝে আসতে বাধ্য। সেখানে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাই মনে হয়, পালিয়ে যাই, দেশ ত্যাগ করি ; কিন্তু পালিয়ে গিয়েও মুক্তি নেই ; আমি দেশ ছাড়া, প্রবাসী, ভদ্রতা সৌজন্য টাকা পয়সা সবই আছে, ঘরে টেলিফোন টেলিভিশন, দ্রুত যাবার জন্য মোটর আছে, তবু আমার ভাষায় আমি কথা বলতে পারি না। বিদেশি ভাষা রপ্ত করে নিজেকে ঢেকে রেখেছি, যখন গভীর রাত্রি নামে, আকাশের তারা চোখ উল্টিয়ে কাঁদে, শাদা বিছানায় অবচেতনের পাপ নেচে ওঠে, তখন ভাবি এই অর্থের নিরর্থকতা অথবা নিরর্থকতার অর্থ আমাকে কোথায় কতদূর নিয়ে যায়। এই অবচেতনার পাপে যাকে আমার রাত্রির সঙ্গিনী করি, তার সঙ্গে আমার যোগ দেহের, মনের নয় ; কেননা আমার মনটা তো এই বিদেশে সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ; অমায়িক ভদ্রতায় হাসি, ডিনারে বসি। এখানে আমি যদি দৈহিক শক্তিতে আসুরিক প্রতিভা লাভ করতে পারি, নারী হয়তো সন্তুষ্ট হতে পারে কিছুকালের জন্যে সমগ্র সম্পর্ককে উড়িয়ে দিয়ে, কিন্তু আমি যদি সংবেদনশীল হই তাহলে আমার দৈহিক ক্ষমতা অপটু হবেই এবং অপটু হলে নারী উদাসীন বা হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ত হবে এবং পরিশেষে আগামেম্‌নোনের মতো মৃত্যুবরণ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। এক্ষেত্রে ভালোবাসাকে শুধু প্রশ্ন করতে হয়, 'ভালোবাসা কি তোর নাম'। এই অপরিচয়ের বেদনা নিয়েই দুই বিরোধের মধ্যে নিয়ত বাস আমাদের হয়। এই ভালোবাসায় তখন লেগে থাকে ঈর্ষা বঞ্চনা ও অসত্য ; এতে প্রেমের তীব্রতা বাড়ে কিন্তু প্রেমের শান্তি মেলে না ; বোদলেয়ারের ভাষায় 'নির্বেদের মরুভূমিতে ভীষণের মরূদ্যান' : এই ভীষণ আমাদের সদা জাগ্রত করে রাখে, নরক ও স্বর্গের সেতু হলো এই ভীষণ ; নারীকে তখন বোদলেয়ারের মতো জিজ্ঞেস করতে হয়, 'তুই কি স্বর্গের

গভীরতা থেকে অথবা নরকের অতল থেকে উঠে এসেছিল? তোর চোখ নারকীয় ও স্বর্গীয়।' কেননা কোনো শাস্তিই তো সে আমাকে দিতে পারে না, এই দ্বন্দ্বের কোন একটা মুহূর্তে মনে হয় প্রকৃতি মরে গেছে, ধাতব ঔজ্জ্বল্য শুধু চেতনাকে জাগিয়ে রেখেছে এবং আমায় এই চেতনায় অজানার গভীরে কিছু খুঁজছি (Au fond de l'Inconnu pour trover nouveau!) কিন্তু এটা চরম অবস্থা। সাধারণ অবস্থায় নিরাশ্রয়তা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে আত্মদ্বন্দ্ব ও ও আত্মবিরোধের সংঘর্ষ সর্বদা তীব্র হয়ে ওঠে। একালে আমরা সকলেই মনের জগতে বিদেশে বাস করছি এবং দুই জগতের বিরোধে ভুগছি। সংশয় ও সন্দেহ আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে, ঈশ্বর আছে মনে করি কিন্তু এ ব্যাপারেও সন্দেহ, অথচ নরক থেকে মুক্তি চাই।

এই বিরোধ আমাদের জীবনের সর্বত্র, স্বর্গ মর্ত্যে, দেহ ও মনে, বস্তু ও চেতনায়, কাম ও প্রেমে, অর্থ ও ধ্বনিতে। কিন্তু বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে আত্মচৈতন্যে। চৈতন্যের মধ্যেই এই বিরোধ ঘনীভূত। শুধু বিরোধ নয়, এই চৈতন্য দ্বিধাখণ্ডিত, অতীতে যা ছিল, বর্তমানে তা নেই, বর্তমানে যা আছে ভবিষ্যতে তা নেই, অতীতের আমির সঙ্গে ভবিষ্যতের আমির যোগ প্রায় নেই।

সচেতন জ্ঞাতা একরকম, আর সচেতন জ্ঞাতা যাকে জানছে তার স্বরূপ আর এক প্রকার। চেতনা অন্য কিছু থেকে আলাদা, কেননা চেতনা অন্য কিছুকে জানছে; চেতনা ও চেতনার বস্তু এক নয়, অথচ দুয়ের মধ্যে যোগ আছে, যোগ আছে বলেই বিয়োগ করছে, চেতনাকে অন্য কিছু থেকে আলাদা করছে শূন্যতা, এই শূন্যতা হলো অসত্তা। চেতনার মধ্যে এই অসত্তা বা শূন্যতা নিহিত এবং চেতনায় এই শূন্যতা আছে বলেই সে এগোয়, পৃথিবীতে প্রবেশ করে। সত্তা ও চৈতন্যের বিরোধের মাঝখানে আছে শূন্যতা, এই শূন্যতা নির্বেদের বা মৃত্যু-ভয়ের। মৃত্যুভয়ের ভেতরে আমরা শূন্যতায় পৌঁছুই, এই পৌঁছুনোও একরকম এগোনো। এইভাবেই চৈতন্য নিয়ত এগোয়। সুতরাং সত্তা ও চৈতন্যের বিরোধ ঘটছে শূন্যতার মাধ্যমে, আবার চৈতন্যের মধ্যে চৈতন্যের বিরোধ ঘটছে আর এক শূন্যতায়।

এই শূন্যতা বা মৃত্যুভয়ই হলো একালের মানসিকতা, দুই জগতের মাঝখানে বসে সে আমাদের ভয় দেখায়। বোদলেয়ার ভালেরি ও রিলকের কবিতায় এর রূপ চমৎকার ফুটে উঠেছে। 'পড়ো জমির' মধ্যে এলিঅট

তারই ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কাব্যের বিচিত্র সংবেদনায়। বিপদের মধ্যে বিস্ময় লুকিয়ে আছে, উল্লাস ও অতল গভীরতা পাশাপাশি অবস্থান করে। জন্ম ও মৃত্যু রিল্‌কের অনুভূতিতে একই প্রকার। শূন্যতা যেমন সার্ত্রের দর্শনে চৈতন্যের গভীরে, তেমনি এই শূন্যতা জগতে, জগতের পরপারে, আকাশ ও মাটির মাঝখানে, সমাজ ও ব্যক্তির বোধে। এই শূন্যতায় ভগবান হারিয়ে গেছে, আবার চকিতে দেখা দেয়। আমরা পৃথিবীর যেখানেই বাস করি না কেন, এই শূন্যতা আমাদের পেয়ে বসেছে। এই শূন্যতা অসত্তার, ভয়ের ও মৃত্যুর ; আবার এই শূন্যতার মধ্য দিয়েই এগোচ্ছি, জগতে প্রবেশ করছি এবং স্বাধীনতা ও মূল্যবোধ গড়ে তুলছি নিয়ত। চৈতন্যের এই স্বাধীনতার মধ্যেই মুক্তি। এই মুক্তি রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' কবিতার মুক্তি নয় : 'আকাশ আছে, শুধু সেথায় একটি সুরের ধারা/অসীম নীরবতার কানে বাজাচ্ছে একতারা। এই এক-মুখীনতা ও শাশ্বত সত্যের স্থির বোধ আমরা হারিয়েছি।' রোমান্টিকেরা এগোয়, অজানা দেশে যায়। কিন্তু চৈতন্যের মধ্যে এই শূন্যতা তাদেরকে দ্বিধান্বিত করেনি, সামনে এগোয় লক্ষ্য ঠিক রেখে ; এই লক্ষ্যে হয়তো কখনো পৌঁছনো যাবে না, তাতে অতৃপ্তি বা অসন্তোষ নেই, আছে মধুর বিষাদ। এই বিষাদ আমাদের অনন্ত অতৃপ্তির মধ্যে আনন্দ দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের অমঙ্গলবোধ এবং আধুনিকতার পাপ এক নয়। এবং দুয়ের তুলনা একরকম মূঢ়তা। রবীন্দ্রনাথ মঙ্গল বলতে বুঝতেন সংগতি ও সামঞ্জস্য-বোধ। মঙ্গলের মূল নিহিত রয়েছে শান্তির মধ্যে। শান্তি থেকে এই মঙ্গল উদ্‌গত হয়েছে বলে সমস্ত জগৎকে মঙ্গল রক্ষা করছে স্নেহময়ী জননীর মতো। অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বন্ধনে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধছে। পৃথিবীর ধূলিকণার সঙ্গে সূর্যগ্রহতারার যোগ নিবিড় হয় এই মঙ্গলের জন্যে। সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু লাভক্ষতির মধ্যেও এই মঙ্গল বিরাজিত। মঙ্গল আছে বলে সুখ ও দুঃখের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধন আমরা উপলব্ধি করে অন্তরের দিকে যাই, আপাতবিরোধের মধ্যে মিলন রয়েছে। সুখ ও দুঃখ, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে এই বিরোধ নেই ; কিন্তু বিরোধ থাকলেই অমঙ্গল, এবং এ সম্বন্ধে অচেতন হলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পাপ। মঙ্গলস্বরূপ সমস্ত বিরোধের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন। ব্যক্তি যখন এই ঐক্যে নিজেকে স্থাপিত করতে পারে না, তখনই অমঙ্গল ব্যক্তিমানুষকে পীড়ন করে ; দুঃখবোধ জাগে অপূর্ণতার জন্যে ; দুঃখের সাধনায় সে এগোয়, আর যার মধ্যে এই ঐক্যবোধ

নেই, সে পাপের মধ্যে নিমজ্জিত, সে জড়। 'ধর্ম' বইয়ে অন্তত এসব কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।

এই অমঙ্গলবোধ আধুনিকের পাপবোধের সঙ্গে যুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের এই বোধের সঙ্গে লাইব্‌নিৎসের অমঙ্গলবোধের অদ্ভুত মিল আছে। মানুষের সীমার ফলই হলো পাপ; এই সীমা বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদই বিরোধ বাধায়। এমনিভাবে সমস্ত কিছুকে বিরোধহীনভাবে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু প্রতিটি বস্তুর মধ্যে যে বিরোধ আছে এখানে তা স্বীকৃত হয়নি, এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও নেই। আধুনিক মানুষ প্রতিটি বস্তুর মধ্যে এই বিরোধ দেখে, এমন কি কোটনের মধ্যে এই বিরোধ নিহিত। বস্তুর মধ্যে যেমন তেমনি শরীরের মধ্যেও এই বিরোধ এবং দেহাভ্যন্তরস্থ চেতনার মধ্যে এই বিরোধ ও দ্বন্দ্ব আরো তীব্র। এখান থেকেই পাপ বা অমঙ্গলবোধের শুরু আমাদের যুগের।

বোদলেয়ারের পাপবোধ এসেছে তাঁর ক্যাথলিক ধর্মীয় বোধ থেকে, জন্ম মুহূর্তে শয়তান রক্তের মধ্যে বাসা বাধে, অথচ স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে পীড়িত করে। এই ধর্মীয় পাপবোধ একালের সকলের নয়। কিন্তু বোদলেয়ার যখন বলেন নীতি ও শরীরের গহনে অতল জন্ম নেয়, তখন এই অতল শূন্যতা আমাদের বিভ্রান্ত করে।

আমাদের চৈতন্যের বা বিবেকের মধ্যে এক প্রকার 'মানবিক সত্য' সর্বদা সক্রিয়; এই 'মানবিক সত্য' ভয়ের, উদ্বিগ্নতার; চৈতন্যের মধ্যে ভয়ের ক্রিয়াশীলতা আমাদের অপরাধবোধ জাগায়, এই অপরাধবোধ আমাদের সচেতন করে তোলে, তীব্র করে আমাদের অনুভূতি ও চেতনা। চৈতন্যের মধ্যে এই 'মানবিক সত্তাই' সমস্ত পাপবোধের মূল। আমাদের চৈতন্য আজ দ্বিধান্বিত, দ্বিধাবিভক্ত, চৈতন্যের মাঝখানে সদা ক্রিয়াশীল শূন্যতা।

এই উদ্বিগ্নতা যেমন পাপবোধ জাগায়, তেমনি হয়ে-ওঠার সম্ভাবনা এর মধ্যে আছে। এই হয়ে-ওঠার সম্ভাবনাই আমার মুক্তি ও স্বাধীনতা। এই সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায় যদি আমার চৈতন্যকে অস্বীকার করি, অপরে আমার মধ্যে আধিপত্য করে। অথচ অপরকে ও বস্তুজগৎকে আমি অস্বীকার করতে পারি না; এখানেই বিষয়ীর বিরোধ ঘটছে বিষয়ের সঙ্গে, বিষয় চাইছে বিষয়ীকে গ্রাস করতে, বিষয়ী চাইছে বিষয়কে অস্বীকার করে হয়ে উঠতে, এতেই পাপ বা অপরাধবোধ জাগছে, এই অমঙ্গলবোধ আমাদের চেতনায়

অন্তর্নিহিত; এই অমঙ্গলবোধ আমাদের বন্দী করছে, এই বন্দীদশা থেকে আমাদের মুক্তি নেই যেন। অথচ চেতনার মধ্যে নিহিত এই ভয় বা পাপবোধ থেকে জাত বিরোধ আমাদের হয়ে-ওঠার সম্ভাবনাকে জাগিয়ে দিচ্ছে সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে।

এমনিভাবে সংবেদনশীল মানুষ হয়ে ওঠে সর্বদা, চেতনার বোধে নিহিত পাপবোধে সে বিদ্রোহ করে সব সময়। প্রেম ঈর্ষা ব্যক্তিত্ব সময় রিয়্যালিটির কোনো স্থায়ী মূল্য নেই চেতনার বোধে; চেতনা কিভাবে গ্রহণ করে, তার ওপর নির্ভর করে এদের মূল্য। কিন্তু চেতনার বোধকে শুদ্ধ করে শুধু উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করলে চৈতন্যের মুক্তি হয় না, চৈতন্যের মধ্যে উদ্দেশ্যও একপ্রকার শূন্যতা সৃষ্টি করে, এই শূন্যতা চৈতন্যের একপ্রকার সক্রিয়তা; একে অস্বীকার করলে সাম্প্রতিক হওয়া যায় বুদ্ধি ও কনসেপ্টে, কিন্তু আধুনিক হওয়া যায় না স্পেণ্ডারের ভাষায়। আধুনিক মানুষ চৈতন্যে সামগ্রিক হয়ে উঠতে চায়, তাই সংবেদনা অবচেতনা বুদ্ধি উদ্দেশ্য ক্রিয়া কোনো কিছুকে বাদ দিতে পারে না সে। চৈতন্যের ভেতরে অতল খাদ রয়েছে বলে সে পূর্ণ হতে চায় সব কিছু গ্রহণ করে। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদকে যদি মনের বস্তু করে নিই, তাহলে তার কাছ থেকে কিছু উপকার আমরা পেতে পারি। মার্কসীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে চেতনার এই নিয়ত ক্রিয়াশীলতা স্বীকার করে নিলে আধুনিকতার ব্যাপারটা সেখানে আর অপাঙক্তেয় থাকে না, কিন্তু মুশকিল এই যে ওঁদের আদর্শের তত্ত্বগত কনসেপ্ট কখনোই অভিজ্ঞতায় বা চেতনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে না, বা মিশ খায় না, তাই পেছনে পড়ে থাকে। তত্ত্বের কোনো স্বতন্ত্র মূল্য নেই, যদি না চেতনায় এই তত্ত্ব সক্রিয় হয়ে ওঠে বিরোধের সংঘর্ষে।

রবীন্দ্রনাথ এই বিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন বাইরের দিক থেকে; কিন্তু চৈতন্যের এই সমস্যায় তাঁকে পড়তে হয় নি। তাঁর পরম কখনো স্থির অসীম, শাশ্বত, কখনো অসীম আনন্দময়, সীমা ও অসীমের মধ্যে তাঁর নিরন্তর লীলার আনন্দ। এই লক্ষ্যকে স্থির রেখে রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়ের বেদনা নিয়ত রঙিন হয়ে উঠেছে। কিন্তু চৈতন্যের ভেতরে খাদ তাঁর চিত্তকে ভয়ের বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে পাপবোধ জাগায়নি। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের পাপবোধের সঙ্গে আধুনিকদের পাপবোধের পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের পাপবোধ অনেকটা ধর্মীয়, আমাদের পাপবোধ মূলত আধ্যাত্মিক। আবু সয়ীদ আইয়ুব এই সত্য অস্বীকার করে আমাদের নিন্দাবাদ করেছেন বোদলেয়ারের সূত্র ধরে।

কিন্তু আইয়ুব নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অস্তিত্বের সমস্যাকে চেতনায় জানতে চেষ্টা করলে একালের অমঙ্গল সম্বন্ধে স্থবির সত্য ব্যক্ত করতে পারতেন না। পঞ্জাব থেকে এসে এখানে বাংলা শিখেছেন অথচ বাংলার ভাষার রক্তের স্পন্দন তিনি অনুভব করতে পারেন না, অন্তত লেখায়; তিনি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করেছেন, তিনি হিন্দু সংস্কৃতির চর্চা করেন, অথচ থাকেন নির্বাসিত হয়ে। এই অবস্থাগুলির সম্মুখীন হয়ে চেতনায় ডুব দিলে তিনি চেতনার দুই প্রান্তের মধ্যে অতল শূন্যতা দেখে উদ্বিগ্ন হতেন হয়ে-উঠবার জন্যে। এই চেতনার সক্রিয়তাকে পরিহার করতে পেরেছেন বলেই একালের আধুনিকদের অমঙ্গল ও পাপ ঠিক ধরতে পারেন না তিনি। এই চেতনা থেকে পরম শক্তিশালী রাষ্ট্রনেতাও আজ মুক্তি পায় না। আর শাশ্বত পরমেরও তো ক্ষয় চলছে, পৃথিবী চলতে চলতে একটু সরছে, এই সরে-যাওয়া শেষ পর্যন্ত কবে কখন কোথায় কি বিপন্ন ঘটাবে জানি না, সূর্যের রশ্মি কি শুধুই সরল পথে যায়, বেঁকে না? যদি বেঁকে তাহলে সহজ পথ আর কোথায়! নিউটনীয় পরম কাল ও পরম দেশ আপেক্ষিকতায় ভেঙে গেছে, দর্শকের দৃষ্টিতে তার মূল্য; ভর শক্তি হয়ে যায়, শক্তির সঙ্গে ভরের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং বস্তুর শক্তি কণাত্তম কত্বে আর নিশ্চিত নেই। এই বিরোধ-জনিত সমস্যা আমাদের আত্মদর্শনের মুখোমুখি করে; দেশ ও কাল আজ বিষয়ীগত, অথচ অসীম মুক্তি আমাদের পেয়ে বসে। সুতরাং পরমের সঙ্গে জগতের বিরোধে যে অমঙ্গল, সেই অমঙ্গল আমাদের নেই; কেননা পরমের বোধটাই ভেঙে যাচ্ছে, আছে চেতনা, এই চেতনায় পরম ধরা দেয় শুধু সম্ভাবনা-ময় হয়ে-ওঠার মধ্যে।

এই হয়ে-ওঠা চৈতন্যই মানুষকে আজ অন্তর্মুখীন করে তুলেছে, এই অন্তর্মুখীনতা কখনো বাইরের জগৎকে অস্বীকার করে না, কেননা লাইব্‌-নিৎসের 'মোনাড' এই পৃথিবীতে আজ অচল। এই চৈতন্যের মধ্যে বিরোধই তাকে সন্দিগ্ধ ও চঞ্চল করে তুলেছে, কোথাও সে শান্তি পায় না, আশ্রয় পায় না, ('পরান আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না')। প্রকৃতি ও সভ্যতার বিরোধ আমাদের অবচেতনায় সংঘর্ষ বাধায়, চৈতন্যের দ্বন্দ্বে তারই প্রকাশ ঘটে। ইঙ্গিতময় জাদু, রহস্যময় অন্ধকার, বিস্ময় উত্তেজনা ভয় ঘৃণা আঘাত আমাদের পাগল করে; প্রকৃতি থেকেও ডুবে যায়; ইন্দ্রিয়সংবেদনা আমাদের উন্মাদনা জাগিয়ে আত্মায় সমাজে শহরে যৌনতায় মদে কখনো ডুবে যায়, ডুবতে

গিয়েও বিশুদ্ধ চৈতন্যের অনুভবে তার শিহরন জাগে। তাই শহর থেকে পালিয়ে গিয়ে আদিমতা ও নিষ্ঠুরতায়, বিস্ময় ও আনন্দে স্বাস্থ্য পায় এই চৈতন্যে দ্বন্দ্বপীড়িত মানুষ, এই কারণে আদিমতা একালের একটি ধর্ম ; এই অবক্ষয় ও নির্বেদ থেকে মুক্তি চায় সে। কিন্তু আবার তাকে ফিরে আসতে হয়, সেখানে জ্ঞেয় না জানলেও জানছি শুধু ; হৃদয়ের মধ্যে সংগ্রাম, ধাঁধা তৈরি হয়, অনু-পরিমাণ অভিজ্ঞতার মধ্যে চরিত্রের কোনো স্থিরতা গড়ে উঠছে না, এবং উদ্দেশ্য থাকলেও শুধু ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে বলে জগতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারছে না সে, নিজেকেও এর মধ্যে মানিয়ে নিতে পারে না, তখন রবীন্দ্রনাথের মতো মনের ভেতরে খেলাঘর বাঁধে না একালের মানুষ, মনের মধ্যে অনন্ত যাত্রায় সে বেরয়, এই যাত্রাপথের সুদীর্ঘ সমারোহ একসঙ্গে বিস্ময় ও ভয়ের পাহাড় জাগায়, মনের আকর্ষণে-বিকর্ষণে নিয়ত চলার মধ্যেই বীরত্ব। এখানে তার চেতন-অবচেতন-বুদ্ধি-কল্পনা মিলে গিয়ে 'সমষ্টিগত অবচেতন' গড়ে ওঠে, এর সাহায্যে শুধু বর্তমান নয়, তিনটি কালের সামগ্রিক বোধের সঙ্গে সমগ্র জগতের পরিপূর্ণতা ধরতে চেষ্টা করে, এখানে ইচ্ছা-অনিচ্ছা জড়িয়ে যায়, বুদ্ধি ও ইন্‌স্টিংক্ট একসঙ্গে বাসা বাঁধে, চেতন-অবচেতন মিলে মিশে যায়, অনন্ত সংবেদনার স্রোতে সংবেদনাময় চিত্রকল্পের নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে, এই নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা একমুখীন নয় বলেই চেতনার মধ্যে বিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ থেকে দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব থেকে সামনে এগোবার স্বাধীন শক্তি পায়, মুক্তি লাভ করে। আধুনিকতার এই বোধ আগের যুগে এমনভাবে ছিল না। সমাজ পরিবেশে এই বোধ গড়ে উঠেছে, সাহিত্য আবার এই বোধ সমাজের রক্তে ছড়িয়ে দিয়েছে, পৃথিবীর মহত্তর পরিবর্তন না ঘটলে অস্তিত্বের এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে। এই বইয়ে আধুনিকতার এই সূত্রেই সব কবিদের আলোচনা করা হয়েছে।

এই আলোচনাগুলি প্রায় সবই 'লা পয়েজি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সাঁ-জন্ প্যার্সের ও রাইনের মারিয়া রিল্‌কের ওপর প্রবন্ধ দুটি নতুন। রিল্‌কের ওপর প্রবন্ধটি অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলি যখন বেরয় তখন বিভিন্ন পাঠক এর প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছিলেন, সেই ভরসাতেই পুস্তকাকারে ছাপাতে সাহসী হয়েছি। আমার অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও ডঃ শ্রীঅমলেন্দু বসু এলিঅটের ওপর প্রবন্ধটির যে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তা আমার সাহিত্যজীবনের পাথেয়। আমি কিছু কিছু ফরাশি

জানি, এবং সেই ভাষা ধরেই অন্য ভাষায় প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছি। জর্মন আমি উচ্চারণ ছাড়া কিছুই জানি না, ইংরেজির মাধ্যমে আমাকে রিল্‌কে পড়তে হয়েছে, এই অপরাধ ও ত্রুটি আমি স্বীকার করে নিচ্ছি; আমার মানবজীবনের সার্থকতা যদি ঘটে তাহলে মূল ভাষা জেনে আমার এই বক্তব্য আর একটু স্পষ্ট করতে চেষ্টা করবো পরবর্তীকালে। ষাট ও সত্তর দশকের মনোভাব হলো দেশীয় ব্যাপারে মনোনিবেশ করা; এদিক থেকে আমি এলিঅটের ধারায় কিছুটা দীক্ষিত, এলিঅটের মতো আমিও মনে করি বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যেরই একটি অংশ, বাংলা সাহিত্যের চেষ্টা বিশ্বসাহিত্যের সম্মিলিত চেষ্টারই অংশীদার। এই বোধ তিরিশের উল্লেখযোগ্য সব কবিই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছেন; এই বইটি সেই ধারারই অগ্রগতি, মাঝে ছেদ পড়েছে। এগুলির সাহায্যে আমাকে এবং বাংলা কবিতাকে নতুন করে কিছুটা গড়ে নিতে চাই। যৌবনের রুদ্ধ আবেগ উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেলে নতুন আবেগ লাভ করতে হয় নতুন পরিবেশে। আমি পণ্ডিত নই, স্থির ও স্থবির সিদ্ধান্তে তাই টিকে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, একই জিনিসকে বিভিন্ন সময়ে ও দেশে নতুন করে দেখতে ও উপলব্ধি করতে চাই, যেমন ক্রোচের ইন্‌টুইশনে ধরা পড়ে। এবং সাহিত্য শুধু সংবেদনা নয়, সংবেদনায় ইন্দ্রিয়াতীত বিশুদ্ধ চৈতন্যের উপলব্ধিও ধরা পড়ে।

বইটির তাড়াতাড়ি মুদ্রণের ফলে কিছু কিছু বানান ও উচ্চারণ ভুল রয়ে গেছে। চার পৃষ্ঠায় আঠারো পঙক্তিতে 'অত্যন্ত'-র জায়গায় 'অন্তত'; একাত্তর পৃষ্ঠায় পঞ্চম পঙক্তিতে 'সেন্সেনাল'-এর জায়গায় 'সেন্সেশনাল'; পঁচাত্তর পৃষ্ঠার তৃতীয় পঙক্তিতে 'বিদ্যমান'-এর জায়গায় 'বিদ্যমান'; একশ বারো পৃষ্ঠায় সাতাশ পঙক্তিতে 'জগদাতীতের' জায়গায় 'জগদতীত'; একশ সাতাশ পৃষ্ঠায় শেষ পঙক্তিতে 'একপ্রেশনিজমে'র জায়গায় 'এক্সপ্রেশনিজম' পড়তে হবে।

ফরাশি কবিতা আলোচনা করতে গেলে বোদলেয়ার মালার্মে র‍্যাঁবো ও ভালেরির কথা আসতে বাধ্য। তবে এ সম্বন্ধে বাংলায় কিছু আলোচনা হয়েছে বলে তাঁদের কথাকে সামনে রেখে অন্য কবির বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এঁরা অধিকাংশই বাংলা সাহিত্যে অর্ধপরিচিত বা অপরিচিত।

উৎসর্গ

ডঃ শ্রীঅমলেন্দু বসু

শ্রীচরণেষু

সূচি

পেত্রার্কার প্রেম ১
বোক্কাচ্চিওর সাহিত্যভাবনা ১৭
উন্‌গারেত্তির কবিতা ২৯
ইউজেনিও মন্তালে ৪৬
এজরা পাউণ্ডের সাহিত্যচিন্তা ৬১
পাউণ্ডের কবিতার বিচার ৭২
এলিঅটের 'পড়োজমি' ও আধুনিক কবিতা ৮০
রাইনের মারিয়া রিল্‌কে ৯১
সাঁ-জন্ পার্সের 'আনাবাস' ৯৯
পাবলো নেরুদা ১০৯
কংক্রীট কবিতা ১১৯

পেত্রার্কার প্রেম

সম্মিলিত গোষ্ঠীবোধ ভেঙে গেল টুকরো টুকরো হয়ে; বিশ্বরাজ্য চুরমার হয়ে গেল স্বতন্ত্র রাজ্যে, ধনসম্পত্তি ব্যাবসা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, এবং সকলের অধিকারবোধই স্বতন্ত্র হয়ে শীর্ষ সীমায় পৌঁছুতে লাগলো, এ হেন খ্রীশ্চান একাধিপত্য ও রীতিনীতি মনে ও মনের ভেতরে অন্তর্মুখীন বিশ্বাসে পরিণত হলো তখন; যে মুহূর্তে অন্তর্মুখীন বিশ্বাস স্থাপিত হলো, সেই মুহূর্তে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র মহিমা স্বীকৃত হলো; এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা নিয়ে এলো বিশেষ স্থানের ভাষার স্বাতন্ত্র্য; ভাষার মধ্য দিয়েই বুদ্ধি ও বিদ্যা নূতন করে বিচার করে দেখলো নিজেকে ও জগৎকে; তাই পুরনো তত্ত্ব ভেঙে গেল, বিরোধ বাধলো, এই বিরোধের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও জগৎ এগোতে লাগলো ইতিহাসের সঙ্গে। ব্যাবহারিক নীতি ও ধর্মের স্থবিরতা আনুষ্ঠানিক ও প্রতিষ্ঠানিক দেবতা রেনেসাঁসে শেষ হয়নি; কিন্তু স্থূল স্থবিরতার উর্ধ্বে রিয়্যালিটির বিশুদ্ধ জ্ঞান মানুষের সেন্সিবিলিটির সূক্ষ্ম জগৎকে অনেক দূরে প্রসারিত করে দিলো, সে শুধু খায় না, দেবতাকে পুজো দেয় না, শোয় না, অপরের নির্দেশ শোনে না; নিজের মতো ভাবে, চিন্তা করে, স্বপ্ন দেখে, ইতিহাসের চেতনায় স্থবির শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করে। এই আত্ম-চৈতন্যই অন্তর্মুখীনতার জন্ম দেয়, অবিশ্বাস ও সংশয় ঘনীভূত করে, তৃপ্তির বদলে নিজের স্বভাবের মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব জাগিয়ে তোলে। এই দ্বন্দ্বমূলক প্রকৃতিতে আছে মানুষের হৃদয় ও জগৎ। এই হৃদয় ও জগৎরূপী প্রকৃতির ভেতরে শুধু বিরোধ ও দ্বন্দ্ব; মিলনের চেষ্টা করা হয়, যেমন আকুইনাস করেছিলেন, কিন্তু অগুস্তিনে এসে ভেঙে দেন; তবে দু'জনের কেউই প্রকৃতিকে অস্বীকার করতে পারলেন না। প্রকৃতিই জয়ী হলো শেষ পর্যন্ত। এই প্রকৃতি যখন মানুষের হৃদয়কে দেখে, তখন সে মানবতার প্রতিষ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়; যখন জগৎকে দেখে, তখন বিজ্ঞান এসে হাত মেলায়; এই মানুষের ও বিজ্ঞানের জগৎ বিচার বিশ্লেষণে বোধে উপলব্ধিতে সাহিত্য ও দর্শনে পূর্ণ রূপ পায়, আমি যখন জগৎকে ভাঙি, বিচারবিশ্লেষণ করি, তখন

বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্যে যে মন কাজ করে, সেই মনকেই আর এক মন বিচার বিশ্লেষণ করতে বসে। গভীরভাবে নিয়ত এই বিশ্লেষণের বোধই অতৃপ্তি অসুখ অশান্তি বিষাদ নির্বেদ একদিকে নিয়ে আসে, এবং অন্যদিকে জড় প্রকৃতি থেকে মানুষ যে আত্মচৈতন্যে জয়ী হচ্ছে, তার আনন্দ নিয়ে আসে; বলা বাহুল্য, এই চৈতন্যের দীপ্তি গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের।

পেত্রার্কার জীবনে এইসব গুণাবলি একসঙ্গে দেখতে পাবো আমরা। রেনেসাঁসের মানুষ খণ্ডিত মানুষ নয়, পূর্ণ মানুষ এবং দ্বন্দ্বপীড়িত অসুখী মানুষ। একসঙ্গে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার বোধে তাড়িত। তিনি কিকেরোর শিষ্য, ভার্জিলের পূজারী, রোমের ঐক্য সম্বন্ধে উদ্‌গ্রীব, কিন্তু হোমারকে বাদ দিতে পারছেন না। ১৩৬০ সালে ১৮ই আগস্ট বোকাচ্চিওকে লেখা একটা চিঠিতে বলছেন: 'আমাকে আর একটি কথা যোগ করতে দিন; আমি বলি; জীবন হচ্ছে দ্বন্দ্ব ও শোকের ক্ষেত্র; অদ্ভুত সব দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে আমি প্রায়ই সংগ্রাম করেছি; এখানে এগুলি নিজের গুণে অদ্ভুত নয়, আমার ভাগ্যে এসে পড়েছে বলেই অদ্ভুত'; তবু চিঠি শেষ করেছেন এই কথা দিয়ে: 'জীবন নিজেই এই গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর কর্ম।' এই গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর কর্মময় জীবনকে পেত্রার্কা পেতে চেয়েছেন, এবং তার রূপ দিতে চেয়েছেন জীবনে। তিনি ধর্মে বিশ্বাসী, কিকেরোর মতো মনে করেন আমাদের আত্মার ভেতরে ঈশ্বরের জ্ঞান জন্ম থেকেই রয়েছে, এই জ্ঞান হচ্ছে মানুষের প্রকৃত উৎপত্তির স্মৃতি। কিন্তু তিনি চিঠিপত্রে লেখায় বারবার বলেছেন যে প্রকৃতিবিজ্ঞান অবশ্যই পঠনীয়, চিন্তা ও ধ্যান আমাদের মন ও বুদ্ধির কাছে প্রাকৃতিক খাদ্য। কিকেরো সম্বন্ধে তাঁর বিচার বিশ্লেষণও তীক্ষ্ণ ও তীব্র; কিকেরোর সোনালি বাগ্মিতা ও ঐশী বুদ্ধিকে তিনি প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রের অস্থিরতা ও চঞ্চলতাকে নিন্দা করেছেন, এবং লাতিন ভাষার মাধুর্য ও তীক্ষ্ণতা, স্বচ্ছ বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা আত্মসাৎ করতে দ্বিধা হয়নি তাঁর। ১৩৫৮ সালে ১৫ই অক্টোবর নেরি মোরান্দাকে লেখা একটি চিঠিতে কিকেরো সম্বন্ধে বলছেন: 'খৃস্ট আমার ঈশ্বর, অপরপক্ষে কিকেরো ভাষার রাজকুমার, যে-ভাষা আমি ব্যবহার করি।' কিকেরোর উদ্দেশে-লেখা চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি যে কিকেরো ভার্জিলের ইনিদ্‌কে হোমারের ইলিয়াদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, এবং পেত্রার্কাও এই একই মনোভাব পোষণ করতেন।

কিন্তু হোমারকে উদ্দেশ করে লেখা চিঠিতে বলছেন: 'এক কথায়, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা সূর্যের রশ্মির চেয়ে বৃহত্তর ও উচ্চতর, আমার বিচারে অন্য কেউই এমন মহত্তরভাবে তোমাকে দেখে না।' এবং পরে দুই কবিকে তিনি মিলিয়েছেন। ইউলিসিস বীর, সাহসী, যোদ্ধা দেশে দেশে সমুদ্রে সমুদ্রে সে ঘুরে বেড়িয়েছে, প্রায় সমগ্র পৃথিবী ঘিরে ঘুরছে সে ভার্জিলের ইনিসের মধ্যে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন। কিন্তু দুই কবিই একটি প্যাটার্নে কাব্য রচনা করেছেন। কারণ অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রজ্ঞা হয় না. যে লোক পৃথিবী দেখেনি, তার অভিজ্ঞতাও হয়নি। যে ঘরের বাইরে না বেরিয়েছে, পৃথিবী যার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়নি, সে বিভিন্ন বস্তু দেখবে কেমন করে। এই জীবনমুখী বিস্তারিত অভিজ্ঞতাই তাঁকে প্রাজ্ঞ করেছে, তাঁর সেন্সিবিলিটিকে বাড়িয়েছে এবং তাঁকে অস্থির ও চঞ্চল করে তুলেছে বিশেষ স্থানের ও গৃহের বেড়া। ('পথের হাওয়ায় কিন্তু সুর বাজে, বাজে আমার বুকের মাঝে বাজে বেদনায়') পেত্রার্কা পন্থ অনুসরণ করেছেন কিকেরোর কাছ থেকে, আর কবিতার ভাষা পেয়েছেন পুব্লিউস ভের্গিলিউস মারো অর্থাৎ ভার্জিলের কাছ থেকে; ভার্জিল রোমের ঐক্যবিধাতা, শুধু কবি নন; সেনেকার উদ্দেশে লেখা চিঠিটি নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ট্রাজেডির স্বরূপ উল্লেখ করতে গিয়ে বলছেন যে দেহ ও মনের বিশুদ্ধি স্বভাবে নেই। বিদ্যাদায়িনী মানবকে বিশুদ্ধ ও পূর্ণ হতে অস্বীকৃতি জানায়, অথবা সুন্দরের মধ্যেই সামান্য ত্রুটি লক্ষণীয়। বিরোধী বস্তুর সর্বদা একত্র সমাবেশে সন্দেহের ছায়া ফেলে। একটু পরেই আবার বলছেন: প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আনন্দের আতিশয্যকে পরীক্ষা করে দেখবেন, নির্দিষ্ট সীমায় তাঁর ইচ্ছাকে বাঁধবেন, কিন্তু যেহেতু জীবনের দুর্ঘটনা অসংখ্য, এবং পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বিধ্বস্ত, সেই হেতু প্রয়োজনের তাগিদেই উদ্‌ভ্রান্ত ভাগ্যকে অস্বীকার করবে। এগুলি আপাতবিরোধ, কিন্তু দুই কঠিন সত্যকে মেলাতে চাইছেন পূর্ণতার তাগিদে। তিনি রাজনীতি ও কূটনীতিবিদ্‌, কবি, পণ্ডিত, সম্রাট ও চার্চের ধ্বজাধারক, পথিক, বন্ধু, মুদ্রা ও প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সংগ্রাহক ও গবেষক, অবৈধ সন্তানের স্নেহশীল পিতা, নারীর প্রেমে সমর্পিত, দর্শন ও ইতিহাস চিন্তা করেছেন, পত্র লিখেছেন অসংখ্য। জীবনের এইসব কর্মের মধ্যেই পরিপূর্ণ পেত্রার্কাকে পাওয়া যাবে, কেননা সব মিলেই অস্তিত্বের ব্যক্তিত্বের রূপ

পাওয়া সম্ভব। বিরোধের মধ্য দিয়েই আত্মচৈতন্যের বোধ, স্বাধীনতা, মুক্ত বুদ্ধির অগ্রগতি প্রকাশ পেয়েছে।

এবং এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে আধুনিক মানুষের বিরোধ স্পষ্ট। বহুকাল পরে নীৎশে বলেছিলেন যে আধুনিক মানুষ একই সঙ্গে হ্যাঁ ও না স্বীকার করে। এই বিরোধময় পূর্ণ ব্যক্তিত্ব আমরা দান্তের মধ্যে পাইনা। তিনিও প্রেমের ও জগতের রিয়্যালিটি-বোধে আকুইনাসকে স্বীকার করে আধুনিক ও রেনেসাঁসের প্রথম পুরুষ; কিন্তু এই বিরোধ তাঁর মধ্যে তেমন নেই। কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন পেত্রার্কা, নির্জন প্রকৃতির রূপে পরমের উদ্ভাস দেখে উল্লসিত; আবার এই পরমই তাঁকে লোকালয়ে নিয়ে যায়, মাধুর্যময় বাগ্মিতায় ও কণ্ঠের স্বরের অপূর্ব জাদুতে সাধারণ লোককে মুগ্ধ করেন, এবং সাধারণের মধ্যেই অসাধারণকে অন্বেষণ করেন, তাই লরার মতো নারীর দেহে ঐশ্বরিক বিভা যুক্ত করে পরমের সঙ্গে মিলিয়ে দেন, এই পরম তো তাঁর ভেতরেই; এ সত্য জানেন, জানলেও এই শরীরবোধকে অস্বীকার করতে চান না, দেহের আলিঙ্গনে পেতে চান, কিন্তু অপ্রাপণীয়া লরা; তাই প্রয়োজন-বোধেই নিম্ন শ্রেণীর রমণীর সঙ্গে দেহদান করতে তাঁর বাধেনি। স্বাধীনতা পরম বস্তু; কিন্তু মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রে ও যাজকতন্ত্রে বিশুদ্ধ স্বাধীনতা কল্পনার বস্তু, এই অত্যাচারী সম্রাটের ক্রীড়নক হতে তাঁর আপত্তি থাকলেও বাধ্য হয়েছেন। সব মানুষই সমান, অত্যন্ত আদমের পাপকে স্বীকার করলে, কিন্তু দারিদ্র্যে মুক্তি নেই, ঐশ্বর্য চাই; এই ঐশ্বর্য ও বিলাস বিশপ ও রাজার কাছ থেকে গ্রহণ করছেন। পণ্ডিতের লাতিন ভাষা ও কবিতার জন্যে আশালীন দেশজ ভাষা দুইই তাঁর কাম্য। তাঁর দেশে ও কালের মধ্যেই বিরোধ ছিল। এই বিরোধকে পেত্রার্কা তাঁর সত্তায় পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন; এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়েই যুগকে প্রকটিত করেছেন তিনি। এখানেও দান্তের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য; দান্তে ব্যাপক, মহান, ঐশ্বর্যময়, সুগভীর, তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমকে বস্তুধর্মের কল্পনায় স্থাপিত করে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বিপুল জগৎ থেকে; কিন্তু পেত্রার্কা তাঁর কবিতার মধ্যে নিজের জীবনই ব্যক্ত করেছেন ধারাবাহিকভাবে, তাঁর কবিতা আত্মজীবনী ও আত্মকথন; রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতায় আমরা যা পাই, এই আত্মজীবনীর মধ্যে তৎকালের জীবনই ব্যক্ত হয়েছে নিবিড়ভাবে। আধুনিক কবিতা যে নিজের কথা বলে, পরের কথা বলে না, গভীরভাবে পেত্রার্কা থেকেই তার সূত্রপাত। পেত্রার্কার এই

ব্যক্তিজীবনের বিরোধ কবিতায় ভাষায় রূপ পেয়েছে অপূর্বভাবে, এই বিরোধময় সত্তা প্রভাঁস থেকেই নয়, তাঁর নিজের জীবন থেকেই উঠে এসেছে। যেমন বৈষ্ণব কবিতায় দেখতে পাই ('সকলি গরল ভেল,' 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল') এখানে বিরোধ ঘটছে নিয়তির ক্রিয়ায়, নিজের অংশ খুব নেই, কিন্তু পেত্রার্কা যেন নিজেই এই বিরোধের জন্মদাতা।) কোনো শান্তি নেই, কিন্তু যুদ্ধ করবো তার অস্ত্রও নেই, মনে আশা আছে, কিন্তু ভয় সর্বত্র, বরফে জমে যাই, জানি মাটির ওপর শুয়ে আছি, কিন্তু স্বর্গে ভেসে চলি, এই মাটিকে বুক জড়িয়ে ধরি, কি ঘৃণা মনে হয় তখনি।১

এই দ্বন্দ্বময় বিরোধের কথা তিনি যেমন কবিতায় বলেছেন তেমনি 'দে কন্‌তেম্‌প্‌, তু মুন্দি', জগতের ঘৃণা শীর্ষক রচনায় আরো স্পষ্ট করেছেন পেত্রার্কা নিজেকে। অগুস্তিনের সঙ্গে পেত্রার্কার কথোপকথনে তাঁর মনের গোপন সত্য প্রকাশিত হয়েছে, এ তাঁর স্বীকারোক্তি। অগুস্তিনে তাঁকে তিরস্কার করেছেন পেত্রার্কার মিথ্যা গর্ব, আকাঙ্ক্ষা যৌন কামনা ও আত্মসংযমের অভাবের জন্যে; ভর্ৎসনা করেছেন তাঁর স্বভাবের ভেতরে নৈরাশ্যবাদ আছে বলে; বিস্মিত হয়েছেন পেত্রার্কার মতো এমন বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত একটি সাধারণ নারীর প্রেমে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন দেখে। পেত্রার্কা উত্তর দিয়েছেন যে তাঁর প্রেম বিশুদ্ধ; হয়তো আতিশয্যে পাপ করেছেন; লরার আত্মার সঙ্গে তাঁর প্রেম, দেহের সঙ্গে নয়। এই দেহ বয়সের সঙ্গে অসুন্দর হবে বটে, কিন্তু আত্মা উন্নত হবে, প্রেম বৃদ্ধি পাবে। অগুস্তিনে অনুতপ্ত হয়েছেন যে এক নারীর প্রেম পেত্রার্কাকে ঈশ্বরের প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তিনি দেহের কথা বলেছেন পেত্রার্কা ও লরার সম্পর্কে। পেত্রার্কাও স্বীকার করেছেন লরাকে তিনি দেহ ও আত্মায় ভালোবাসেন, এই নারীর প্রেমই তাঁকে উন্নত করবে। অগুস্তিনে তীব্র নিন্দা করেছেন লরার প্রতি তাঁর কামনার জন্যে। বলেছেন, তিনি লরেল-ভূষণ নিয়েছেন লরাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে, কারণ লরেল ও লরা একই শব্দ থেকে এসেছে। অগুস্তিনে তাঁকে এই কামনা থেকে মুক্ত করবার জন্যে কিকেরোর উপদেশ দিলেন পেত্রার্কাকে, তৃপ্তি লজ্জা ও চিন্তাই তাঁকে মুক্ত করবে; কিন্তু পেত্রার্কার মন থেকে আত্মার উন্নত আদর্শ, দেহের দুর্বলতা ও জীবনের ক্ষণিকতা কখনোই লুপ্ত হয় নি, এগুলির জন্যেই তাঁর মর্ত্য প্রেম আরো তীব্র হয়ে উঠেছে।

কিন্তু গুরু অগুস্তিনেই কি এই বিরোধ ও দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত? বরং

জগতের এই ক্ষণিক জীবনে আমাদের আত্মা সদা সক্রিয় সংগ্রামশীল, অশান্ত ; হয়তো এগুলি পেরিয়েই ঐশী সত্যে শান্তি আসবে ; কেননা ঈশ্বরতো ভেতরেই কাজ করছেন, পূর্ণ ও আলোকিত করছেন, অসীমে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের। কিন্তু বিরোধ থেকেই যাচ্ছে।

ব্যক্তির সচেতন মনের পরম ও স্বনির্ভর নিশ্চয়তার ওপর অগুস্তিনে তাঁর দর্শন খাড়া করেছেন, আমাদের অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতাকে নিহিত পাতালকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিক দার্শনিকের মতো, এবং আমাদের আত্মিক ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা খুঁজেছেন ব্যক্তির ইচ্ছায়। কিন্তু ব্যক্তির এই সচেতন মন হারিয়ে গেল ধর্মের মোক্ষবোধে, এখানে ব্যক্তির সচেতন মনের ও ইচ্ছার কোন মূল্য নেই, হয় পাপে নতুবা ঐশী আশীর্বাদে সবই পূর্ব নির্ধারিত।

অগুস্তিনের দর্শনের ও ধর্মের বিরোধই পেত্রার্কার ব্যক্তিত্বকে আরো গভীর-ভাবে বিরোধময় করে তুলেছে তাঁর সারা জীবনে। অগুস্তিনের দর্শনের মধ্যে দেকার্তের 'কজিতো এর্গো সুম্'-এর বীজ নিহিত। তিনি চৈতন্যের নিশ্চয়তাকে সংশয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ; বাইরের জগৎ সম্পর্কে সংশয় থাকলেও সংবেদনার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সংবেদনা বিষয় ও বিষয়ীকে জানে। সন্দেহের মধ্য দিয়ে একদিকে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হচ্ছে সে, সঙ্গে তিনটি কালকে একসঙ্গে বর্তমানের মধ্যে জানছে, স্মৃতির মধ্য দিয়ে অতীতকে জানছে, আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎকে জানছে, আর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে বর্তমানকে জানছে সে। এবং এই সন্দেহ থেকেই জ্ঞান-চিন্তা-বিচার উপস্থিত হয়, এগুলির সাহায্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং আত্মচৈতন্যের নিশ্চয়তা সংবেদনা থেকেই আসছে, এবং সংবেদনার সাহায্যে আত্মচৈতন্যের প্রতিষ্ঠা সত্যকে নিয়ে আসছে। আত্মা হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সমগ্র ঐক্য।

সংবেদনা ভিত্তিভূমি ; কিন্তু সংবেদনা সুন্দর ও ভালোর বোধ আনতে পারে না ; তাকে জানতে গেলে সংবেদনা ছাড়িয়ে বিশুদ্ধ যুক্তিতে গিয়ে পৌঁছুতে হয়, এই যুক্তিই আমাদের উন্নততর জগতে নিয়ে যায়, এখানে সর্বজনীন বোধ গড়ে ওঠে। এর পেছনে যে শক্তি, তা হলো ঈশ্বর। এই ঈশ্বরও একপ্রকার আইডিয়া, যাকে সত্তা বলা যেতে পারে, যার মধ্যে সর্বজনীন সত্যের অস্তিত্ব আছে। এই আইডিয়ার মধ্যে সব কিছুর সমন্বয় হয়,

রিয়্যালিটি ও ঐশী মন এক হয়ে যায়। সত্য শিব সুন্দর মূর্তি পায়, (verum, unum, bonum, এখান থেকেই কি ব্রাহ্মরা সত্যশিবসুন্দর শব্দগুচ্ছ আহরণ করেছিলেন?) বিশুদ্ধ বুদ্ধির জ্ঞান ভগবানেরই জ্ঞান, পার্থিব জীবনে যা অপ্রাপণীয়। কিন্তু এই ঐশ্বরিক জ্ঞান অলৌকিক নয়, এই সত্তার অস্তিত্ব চৈতন্যের সমগ্রতায় নিহিত; এর ক্রিয়া নির্ভর করছে বিভাজন ও ঐক্যবিধায়ক শক্তিতে; এর পেছনে যে শক্তি কাজ করছে তা হচ্ছে ব্যক্তির ইচ্ছা, এর সাহায্যেই সে পরম আশীর্বাদ পেতে পারে। (মালার্মের সেই অ্যাব্সলিউট কি এখানে আভাসিত হচ্ছে না?) এই সত্তা বা আইডিয়া, জ্ঞান বা বিচার ও অভীপ্সা ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছে।

বাইরের জগৎকে ছেড়ে এই যে ভেতরের জগতে প্রবেশ করবার চেষ্টা হলো দর্শনে, এখানেই আধুনিকতার সূত্রপাত। ইন্দ্রিয়ের জগৎ ও বুদ্ধির জগৎ যুক্তির দ্বারা সংযুক্ত হলো। এই জগতে ঐশ্বরিক বিভা জড়িয়ে আছে, এবং এই জগৎ তৈরি হয়েছে ঐশ্বরিক শক্তি ও প্রজ্ঞায়, পাপ আছে ব্যক্তির মধ্যে, ঈশ্বরের নয়; পাপ বস্তু নয়, ক্রিয়া। সুতরাং এ পর্যন্ত অগুস্তিনে যে দর্শন প্রতিষ্ঠা করলেন তাতে আত্মচৈতন্যই দার্শনিকতায় মণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু গির্জা স্বীকার করে আদিম পাপ ও অলৌকিক মোক্ষে পৌঁছেছেন তিনি, এর সঙ্গে তাঁর দর্শনের কোনো যোগ নেই। পেত্রার্কা যেখানে আধুনিক, সেখানে তিনি এই আত্মচৈতন্যকেই স্বীকার করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে। কৌতূহল ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা অস্থিরচিত্ততা ভ্রমণ প্রেম জ্ঞান শিল্পের প্রতি প্রবণতা দেশপ্রেম—এ সকলের মধ্য দিয়ে তাঁর সংবেদনাই ব্যক্ত হয়েছে, এবং এই সংবেদনা আত্মচৈতন্যকে ও ব্যক্তিত্বকে নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে অগুস্তিনের মতোই শেষ জীবনে প্রেমকে অস্বীকার করে, পৃথিবীকে ঘৃণা করে, আদিম পাপকে বুকে নিয়ে কুমারী ম্যারির কাছে মুক্তির আবেদন জানিয়েছেন।২ এই দুই জগৎকে তিনি মেলাতে পারেন নি। তবু আত্মচৈতন্যে তিনি আধুনিক মানুষ। দান্তে সেখানে বিরাট, মহান, ঐক্যবিধাতা; তাঁর দর্শন আগাগোড়া মানবতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। আকুইনাসের দর্শনের সার নিয়েই তাঁর কাব্য গড়ে উঠেছে। এই দর্শনে মানুষ দুই জগতের যোগসেতু, এবং মানুষের মধ্যেই দুই জগৎ পরস্পরে মিলে গেল। অ্যারিস্টটলের ফর্মকে অদ্ভুতভাবে কাজে লাগিয়েছেন ও রূপান্তরিত করেছেন তিনি। বিশুদ্ধ ফর্মই বাস্তব, বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও সক্রিয় বুদ্ধিরূপে কাজ করে। বিশুদ্ধ ফর্মকে সত্তাধর্মী বলা

যায়, আর বস্তু হচ্ছে সহজাত ধর্ম। মানুষের আত্মা আমাদের দেশের তটস্থ শক্তির মতো। এই আত্মার মধ্যে সর্বনিম্নস্তরের বিশুদ্ধ বুদ্ধি আছে, আবার বস্তুর মধ্যে বস্তুর শ্রেষ্ঠ রূপও আছে; আত্মার মধ্যে যতোটুকু বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা ধর্ম আছে, তার ওপরই তার অনশ্বরতা নির্ভর করছে। এই দুটো ধর্মই মানুষের মধ্যে পরম বস্তুর ঐক্যে যুক্ত হয়, এই ঐক্যই একমাত্র ধর্ম। মানুষের সন্ধান ও ইচ্ছায় এই ঐক্য গড়ে ওঠে; তাই ব্যক্তিমানুষ রূপহীন বস্তুর সর্বনিম্ন স্তর থেকে আত্মার মধ্য দিয়ে অবিশ্রান্তভাবে বিশুদ্ধ বুদ্ধির জগতে পৌঁছয় ও সব শেষে পরম ধর্ম লাভ করে। দান্তের নরক হচ্ছে বস্তুর সর্বনিম্ন স্তর, যেখানে মুক্তির আশা নেই, জগৎও অর্থহীন, সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে ধীরে ধীরে পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গে পৌঁছয় আত্মা, সেখানে আত্মার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা প্রেমে রূপান্তরিত হয়, কারণ প্রেমই সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলকে চালিত করছে। এই প্রেম চিরন্তন ও পরম আলো, স্বচ্ছ বস্তু, যেখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হয়ে যায়।

বেয়াত্রিচের মধ্যে দান্তে এই প্রেমকেই মূর্তিময় করে তুলেছেন, তাই দান্তের কাছে বেয়াত্রিচে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিনারী নয়। এখানেই দান্তের প্রেমভাবনার সঙ্গে পেত্রার্কার প্রেমের অনুভূতির দুস্তর পার্থক্য। পেত্রার্কার প্রেম যন্ত্রণাময়, নিয়ত তাঁকে বিরোধ ও হতাশার মধ্য দিয়ে রক্তক্ষরণ করছে, মাঝে মাঝে মুক্তির ইঙ্গিত নিয়ে আসছে; কিন্তু দান্তের প্রেম বোঝা-নামানোর শান্তি, শ্রদ্ধা ভক্তি বিনতি ও শিষ্টাচারে এই প্রেম মধুর; কিন্তু পেত্রার্কার প্রেম মধুর হলেও নিষ্ঠুর। দান্তের প্রেম অলৌকিক বস্তু, ভগবানের দয়ায় মর্তে এসে পড়েছে, যদিও এই দয়া আত্মার মধ্যেই সহজাতভাবে রয়েছে; তাই এই আত্মাই শেষ পর্যন্ত প্রেমকে বুকে নিয়ে উন্নততর জগতে আলোকিত হয়ে ওঠে। কেননা স্বর্গ এই প্রেমকে নিয়ত পেতে চাইছে। মানুষের ভাগ্যে আছে শুধু করুণা, হয়তো এর সাহায্যেই সে আশীর্বাদ লাভ করবে। অতি নিম্নস্তরের মানুষ প্রেমের স্পর্শ অনুভব করতে পারে না, (এখানে আবার বৈষ্ণবদর্শনের সঙ্গে সাদৃশ্য ভাসছে), কিন্তু যে অনুভব করতে পারে, তার জীবন মহান হয়ে ওঠে। । ভগবানের দয়ার মতো প্রেমের শক্তি অনুভব করে, যা কিছু ক্ষতিকর সব ডুবে যায়। বেয়াত্রিচের মধ্যে ঈশ্বর নূতন কিছু সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, তাই তাঁর অপূর্বজ্যোতির্ময় রূপ, মঙ্গল ও সৌন্দর্যে তাঁর দেহ গঠিত, তাঁর চোখে প্রেমের অন্তর্ভেদী অগ্নিশিখা। যেহেতু এই প্রেমকেই দান্তে তাঁর

কবিতায় প্রকাশ করছেন, সেইহেতু তাঁর গানও প্রেমের মহিমা। অন্য একটি কবিতায় বলেছেন[৩] এই নারী এমন একটি বস্তু যে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এসেছে অলৌকিক কিছু দেখাবার জন্যে এবং মানুষের আত্মাকে মাধুর্যে সঞ্জীবিত করবার জন্যে (আবার বৈষ্ণবের যোগমায়া তত্ত্ব!)। অন্য একটি কবিতায়[৪], এই তত্ত্বকেই রূপ দিয়েছেন দান্তে; 'আমি সুন্দরী রমণীয় সজীব বালিকা, আমি যেখানে থাকি, সেখানকার সৌন্দর্য দেখাবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আমি স্বর্গে ছিলুম, আমার উজ্জ্বলতা দিয়ে তাদের আনন্দ দেবার জন্যে আবার আমি স্বর্গে ফিরে যাবো; যে আমাকে দেখে প্রেমে না পড়ে, প্রেম কি বস্তু সে বোঝে না। সব আনন্দই আমার মধ্যে আছে। ঈশ্বরের কথায় প্রকৃতিই আমাকে আসতে বলেছে; ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, রমণীগণ, তোমাদের সঙ্গ দিতে। প্রতিটি তারা তার আলো ও প্রভাব আমার চোখে বর্ষণ করে; আমার সৌন্দর্য জগতে নতুন, কেননা উন্নত জগৎ থেকে এই সৌন্দর্য আমার কাছে এসেছে; যার হৃদয়ে অন্যের আনন্দে প্রেম না বাস করে সে এই সৌন্দর্য জানতে পারবে না।' সুতরাং দান্তের প্রেম রক্তমাংসহীন ঐশ্বরিক বোধ; কিন্তু প্লেটনিক বলে মনে হয় না। দান্তের কাছে প্রেমই চিরন্তন ও পরম আলো, প্লেটোর ভাষায় 'আইডিয়া অব গুড্'। কিন্তু প্লেটোর কাছে প্রেম বা 'এরস' এই পরম বস্তু নয়, প্রেমের আলোচনা করতে গিয়ে প্লেটো 'আইডিয়া অব গুড্'কে রূপান্তরিত করেছেন 'আইডিয়া অব বিউটি'তে (Idea of Beauty), কিন্তু প্রেম ও সৌন্দর্য একাত্ম নয়, কারণ প্রেমের জন্ম ইন্দ্রিয় জগতে, তাই প্রেম হচ্ছে তাঁর কাছে মঙ্গল ও সৌন্দর্যের জন্যে অভাববোধজনিত চেতনা, অর্থাৎ উপায়; এর সাহায্যে শারীর সৌন্দর্য থেকে আত্মিক সৌন্দর্যে, আত্মিক সৌন্দর্য থেকে নৈতিক সৌন্দর্যে, নৈতিক সৌন্দর্য থেকে সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ জগতে পৌঁছনো যায়, যেখানে সত্যের ঐক্যবিধায়ী ও পূর্ণ জ্ঞান আছে। প্রেমিক এমনিভাবে পৌঁছয় সর্বজনীন সত্যের জগতে। প্রেম প্লেটোর কাছে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির জগতের মধ্যবর্তী। বরং প্লেটোর চেয়ে দান্তে প্রেমকে পরমের সঙ্গে একাত্ম করে আরো মহান করে তুলেছেন।

বোক্কাচ্চিও পেত্রার্কারই শিষ্য, তাঁর রূপভাবনা ও প্রেমের চিন্তাই ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কাব্যে। কিন্তু দ্বন্দ্বময় হৃদয়ের আর্তি যে শিল্পরূপ লাভ করেছে পেত্রার্কার কবিতায়, বোক্কাচ্চিওর কবিতায়, তা নেই। বাইরে বরফ জমেছে, শীতের কুয়াশা ও ঠাণ্ডা, আর কবি একাকী শোকে জ্বলছেন, দগ্ধ হচ্ছেন;

আর এই জ্বালা থেকে মুক্ত হবার জন্যে কেঁদে কেঁদে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। তাঁর কাছেও এই জগৎ ঘৃণ্য, তাই স্বর্গে যেতে চাইছেন প্রেমিকার পাশে বসবার জন্যে। কিন্তু বোক্কাচ্চিওর প্রতিভার স্ফূর্তি গদ্য গল্পে, যেখানে সমাজজীবনের সমগ্র বাস্তবতা বীভৎসতা নিষ্ঠুরতা যৌনতা নগ্নতা দুর্বিষহ আগুনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর সার্থকতা বস্তুধর্মিতায়।

পেত্রার্কার কাছে প্রেম দান্তেরও নয়, প্লেটোরও নয়; এই প্রেম মর্ত্যের, মানবীয়; যার মধ্যে শরীর, রক্ত ও মাংস, সৌন্দর্য, আসঙ্গলিপ্সা, অধিকারবোধ একই সঙ্গে কাজ করছে। লরা মধুর যেমন, তার কাছে ধরা না দেওয়ায় নিষ্ঠুর বটেও; এ কীটসের রোম্যান্টিকতা নয়, জীবনের যন্ত্রণার পাকে পাকে এই বিরোধী মনোভাব সত্যে উদ্ভাসিত। কেননা পেত্রার্কা জানেন প্রেম তাঁর নিয়তি, দান্তের ভাগ্য নয় যে বেয়াত্রিচের মতো লরা তাঁকে নিতে আসবে; এই নিয়তি ট্র্যাজেডির মতো স্থিতিবোধকে উপচে তোলে, পাপপুণ্য ন্যায়-নীতিকে মন্থন করে বিষ ও অমৃত তুলে আনে, পেত্রার্কার কবিতা তাই এতো নাটকীয়, এই কারণে ইতালিতে রেনেসাঁসের সময় স্বতন্ত্র নাট্যরূপ ইংলণ্ডের মতো গড়ে ওঠেনি। বেয়াত্রিচের মৃত্যুর পর দান্তে তাঁকে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে মহাকাব্য রচনা করেছেন; পেত্রার্কা লরার মৃত্যুতে পার্থিব দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবার আনন্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন তাঁর কাব্যসংগীতে; কারণ যতোদিন লরা বেঁচে ছিলো, ততোদিনই তাঁর দুঃখ ও যন্ত্রণা দুর্বিষহ ছিল; কিন্তু মৃত্যুর পরও কি তিনি এই নিয়তিরূপিণী প্রেমকে অস্বীকার করতে পেরেছেন? পারেন নি। তিনি বলেছেন এই প্রেমই নিয়তি যা তাঁর ধ্বংসকে বুনছে; এবং নিয়তি বলেই তিনি এই সত্য জানেন যে প্রেম তাঁর রোরুদ্যমান ক্লান্ত চক্ষুদ্বয়কে বুজিয়ে দেবে, অর্থাৎ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর মুক্তি নেই।[৫] এবং এখানে মৃত্যুও কম যন্ত্রণাদায়ক ও তিক্ত।

এই নিয়তিরূপিণী প্রেম তাঁকে একা থাকতে দেয় না, নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার জন্যেই ঘুরে বেড়ান, লোকের ভিড়ে যান, একা থাকলেই ভয় তাঁকে পেয়ে বসে।[৬] প্রতিদিন সহস্রবার মরছেন, সহস্রবার জন্মাচ্ছেন, কিন্তু মুক্তি নেই, ম্যারির কাছে প্রার্থনা জানিয়েও তাঁর মুক্তি আসেনি। এই ভয়ই তাঁর চৈতন্যকে দীপ্ত তীক্ষ্ণ করে তুলেছে, এর সাহায্যেই জগৎ বা রিয়্যালিটিকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, দেখেছেন জগৎ অতি নির্জন এবং নির্বাসিত, সঙ্গে

সঙ্গে কবি নিজেও। তাই জগৎকে ঘৃণা করছেন, আবার প্রেমের জন্যেই ভালোবাসতে চাইছেন। তিনিও প্রেম ও প্রেমিকাকে দিব্য জ্যোতির্ময়ী আনন্দ রূপে ভাবেন, নিয়ত উর্ধ্বজগতে টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু তারপরই নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেন আর যন্ত্রণায় কাতরে ওঠেন, অনুভবে অন্ধকার সত্তা জেগে ওঠে, পাপ-পুণ্য একাকার হয়ে যায়, আলো-অন্ধকার মিশে যায়, পশু ও মানব পাশাপাশি শুয়ে কথা কয়, দেহ ও আত্মা বিরোধ বাধায়, হাসি-কান্না বিষাদ-আনন্দ এক সঙ্গে সব জড়িয়ে থাকে। কখনো দেখেন প্রকৃতির মধ্যে লরার রূপ, রোমান্টিক কবিতার মতো প্রকৃতি ও নারী এক হয়ে যায় তখন, বিষাদের মাধুর্যে সৃষ্টিক্রিয়াকে পরিপূর্ণ করে তোলেন; এই বিষাদ তখন মধুর, আনন্দের চেয়েও উপযোগী, কেননা বিরহভাবনার মধ্য দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করে তোলা যায়।

কিন্তু এর থেকেও পেত্রার্কার প্রেমের কবিতা আমাদের আরো গভীরে অতল পাতালে নিয়ে যায়। এবং এখানেই ফরাশি কবিতার ধারার সঙ্গে তাঁর যোগ দেখতে পাই, যা ভিয়োঁ হয়ে বোদলেয়ারে এসে মিশেছে। পেত্রার্কা বলছেন[৭], আমি তাকে সুন্দর ও ভীষণ এমন ভাবে যেতে দেখি যে আমার আত্মা পালিয়ে যাবার জন্যে কেঁদে ওঠে। বোদলেয়ারও তাঁর সৌন্দর্যকে এই ভীষণ ও সুন্দরে মিশিয়েই দেখেছেন: 'তুই নিয়ত ধ্বংস ও আনন্দ রোপণ করেছিস, কিছুই সাড়া দিস না, অথচ তুই সব শাসন করছিস।'[৮] এই বিরোধ-ভাবনা ত্রুবাদুররাই জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু বিরোধের মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্যবোধ গড়ে ওঠে, পেত্রার্কাই তাকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করলেন, এই সৌন্দর্যবোধের মধ্যে নরক ও শয়তান দেবতার সঙ্গে বাস করছে কিনা তার স্পষ্ট প্রমাণ পেত্রার্কার কবিতায় নেই, কিন্তু পাপবোধ যে আছে, তার বিচিত্র উপাদান ছড়িয়ে আছে। এই রমণীই পাপ নিয়ে আসছে কবির হৃদয়ে, আর আছে পেত্রার্কার সৌন্দর্যের মধ্যে নির্বেদ; লরাকে অন্য ফুলের মধ্যে গোলাপের মতো দেখতে, কিন্তু সে আনন্দ বা দুঃখ কিছুই প্রকাশ করছে না, কিন্তু তাকে দেখে এক অবাচ্য ধূসর ভয় কবির মনে জেগে উঠছে, লরার শুদ্ধ সংগীত ও নিস্তেজ রূপ দেখে এক অন্ধকার ফুটে উঠেছে শিকারের মতো।[৯] এই অন্ধকার সন্দেহের মধ্য দিয়েই পেত্রার্কার জীবনের অস্তিত্বে আত্মচৈতন্য নিশ্চিত হচ্ছে, এবং নিশ্চিত আত্মচৈতন্য থেকে সমগ্র ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে।[১০]

লরাকে দেখেছিলেন পেত্রার্কা ১৩২৭ সালের ৬ই এপ্রিল। তারপর থেকেই তাঁর কাব্য রচনার শুরু। এই সময় থেকে তাঁর কবিতা ধারাবাহিকভাবে পড়লে বিচিত্র অনুভূতির চঞ্চলতার সঙ্গে একটা ক্রম পরিণতি লক্ষ্য করবো আমরা। দান্তে তাঁর প্রেমের গানকে তুলনা করেছেন পাখির সঙ্গে, কিন্তু পেত্রার্কার কবিতা আরো গভীর তলদেশের, তাই সে উৎসুক মনের আশ্রয় চাইছে, অরণ্য থেকে পায়ে পায়ে মানবজাতির কাছে আসছে। পেত্রার্কার মন এই অরণ্য, অরণ্যের মধ্যে যা আছে পেত্রার্কার ভেতরেও সেই সব গুণ পাওয়া যাবে।

লরাকে দেখেই পেত্রার্কার মনে হয়েছে নিরস্ত্র তিনি প্রেমের দেবতার কাছে। কিন্তু লরা এ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞাত। লরার মুখের কাপড় পেত্রার্কাকে ব্যথিয়ে তোলে, কারণ লরার মুখ তিনি দেখতে পান না। দুয়ের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে। শীতের আকাশ গ্রীষ্মের বাতাস লরার সুন্দর চোখের মধুর আলো অন্ধকার করে দেয়, এবং তারপর থেকেই লরার মধ্যে বিরোধ দেখতে পেয়েছেন। লরা মধুর, কিন্তু শত্রু, যোদ্ধা। এবং অনুমান করছেন দুয়েরই হৃদয়ের ওপর ভারি পাপ বোঝা হয়ে আছে; তবু তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তাকে দেখে ডায়ানার মতো মনে ভাবেন; আকাশ উষ্ণ আলোয় ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু পেত্রার্কা জমে যাচ্ছেন, ঠাণ্ডায় কাঁপছেন। প্রকৃতির সবুজ আলোয় তারই বিভা, তার নরম চোখের মধুর আলো ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু লরার হৃদয় অহংকারে পরিপূর্ণ। লজ্জার প্রতিশোধ প্রেমেই নেওয়া হবে। কিন্তু তাকে না পেয়ে জগৎ বিষণ্ণ নির্বাসনের মতো মনে হচ্ছে, নির্জনে কাঁদছেন (লেওপার্দির সঙ্গে এখানেই যোগ), চারিদিকে ফুলের শোভা, কবির হৃদয়ে কম্পমান আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে। সূর্যকে মনে হচ্ছে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী; কারণ লরাকে সে আবদ্ধ করেছে, লরার স্বামীর প্রতি ঈর্ষাবোধ জাগছে; কিন্তু লরার প্রতি এই যে প্রেম, তা কোথা থেকে এসেছে; লরার কাছ থেকেই এই প্রেম এসেছে এবং এই প্রেম তার মধ্য দিয়ে উন্নত জগতে চলে যাচ্ছে (এখানেই তিনি দান্তের প্রেম-ভাবনার কাছে ঋণী, দান্তে যে-প্রেম ভাবনা কাভালকান্তির কবিতা থেকে পেয়েছেন, 'দোন্না মি প্রেগি' কবিতায় কাভালকান্তি বলেছেন যে স্মৃতিলোকে অস্পষ্টতার ওপর প্রেম হচ্ছে আলো। এই আলো দূর মঙ্গলগ্রহ থেকে আসছে। এই প্রেম চিত্তের এষণা অথচ স্বভাব-জাত)। পশুরা রাত্রে শোয়, মানুষ ঘরে ফেরে সন্ধ্যায়। কিন্তু কবি দিন

রাত্রি জেগে আছেন প্রেমের বেদনায়। দিনে তিনি রাত্রের কথা ভাবেন, রাত্রে দিনের জন্তে অনুতাপ করেন। (শেলির অনন্ত আকাঙ্ক্ষা উঁকি দিচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের গান ভাসছে; 'পরান আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না।') আকাশের তারাকে নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে তাঁর। সকলের শান্তি আছে, কিন্তু কবি শৃঙ্খলে বদ্ধ। হয়তো মৃত্যুতেই এর শেষ হবে।

লরা এই সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন, এই অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে পেত্রার্কা অনেক কবিতা লিখেছেন, যে-কবিতায় লরার মৃত্যুর চিন্তা আছে, কিন্তু কবি তার প্রতি তাঁর হৃদয়ের আর্তি ও নিষ্ঠা উন্মুখ করে রেখেছেন। এক একটি কবিতার মধ্যে পেত্রার্কা দান্তের প্রেমভাবনাকে যুগের বিরুদ্ধে রেনেসাঁসের নারীমহিমা স্তবে উচ্চকিত করে তুলেছেন।[১১] লরার চোখের আলোই তাঁকে স্বর্গের পথ দেখিয়েছে; সর্বত্র তার প্রেমের আলো, সৎকার্যে তাঁকে প্রণোদিত করছে, গৌরবের সিংহাসনে নিয়ে যাচ্ছে, তুচ্ছতা থেকে মুক্ত করছে, শীতে বসন্তে ঋতুচক্রে এই প্রেম আভাসিত। ওপরে অনন্ত নক্ষত্র-খচিত আকাশে ঈশ্বরের গৌরব, যেখানে কবি যেতে পারছেন না, কিন্তু মর্ত্যে দ্বন্দ্বের মধ্যেই প্রেমের জন্তে সব কিছুকে আশীর্বাদপূত মনে করেছেন তিনি; জানেন, এই প্রেমই তাঁকে উন্নত জগতে নিয়ে যাবে। উন্নত চিন্তা ও মধুর স্মৃতিতে কবির হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। আবার প্রেমের জন্তে কথনো মনে হয়েছে অন্ত সব আশা ও চিন্তা চলে যায়, শুধু প্রেম থাকে (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'তুমি যে তুমিই ওগো তাই তব ঋণ, / আমি শুধু প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন') তবু পাপ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছেন, সৎকার্যে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন, তিনি অলস আনন্দকে ঘৃণা করতে পারছেন, লরার চোখের মধুর কাঁপনের মধ্যেই এই বিশ্বাস ও পুরস্কার আছে। কিন্তু বৃথা এই স্তব, তারপরই লরার বর্ণহীন ও সম্ভ্রমপূর্ণ মুখ মনে পড়ে, নিজের দুঃখ ও বেদনা জাগে নির্বাসিত ও অসুখী মনে হয় নিজেকে, পরিত্যক্ত মনে হয় পৃথিবীতে। দেশ ও নারী এক হয়ে যায়। বিদ্যাপতির মতো অনুতাপে হৃদয় ভরে যায়, বৃথাই দিন কাটাচ্ছেন জীবনে প্রেমের ভাবনায়, তবু বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। ধর্মবোধ এই প্রথম উঁকি দিচ্ছে। তখন এই সবুজ শষ্পাচ্ছন্ন পৃথিবীর সৌন্দর্যের ভেতর সাপের অস্তিত্ব অনুভব করছেন। পাপের বোধ জেগে উঠেছে হৃদয়ে।

এখান থেকেই কবিচিত্তের দ্বন্দ্বক্ষত রূপ তীব্র হয়ে উঠেছে। শীতের

সমুদ্রে মধ্য রাত্রে তাঁর হৃদয়ের ছোট্ট জাহাজ প্রচণ্ড ঢেউ-এ আন্দোলিত হচ্ছে, হালে বসে আছে; তাঁর প্রেম, তাঁর প্রভু ও শত্রু। প্রত্যেক দাঁড়ে বসে আছে দুই বলিষ্ঠ চিন্তা, যা মৃত্যু জাহাজডুবি ঝড়কে উপহাস করছে। দীর্ঘশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও আশায় ভেজা ঠাণ্ডা অশ্রান্ত বাতাস জাহাজকে আঘাত করছে। তার আলো অন্ধকারে ডুবে গেছে। এখানে কৌশল ও জ্ঞান বৃথা, বন্দরে পৌছবার আশা হারিয়ে গেছে আবার। এতে বন্ধন, এতে জ্বালা আছে, তবু মধুর ব্যথা। নিঃসাড় পত্র প্রেমের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছেন। লরার স্মৃতি আনন্দ দেয় এবং ভীত করে, কান্নাই তীব্র মধুর সংগীত জাগিয়ে তোলে, (শেলি কথা বলছেন এখানে) প্রেম ক্ষত সারিয়ে তোলে ও হত্যা করে।

এই যন্ত্রণা থেকে আবার আশা জাগছে ক্ষণিকের জন্যে, কিন্তু মুহূর্তেই জেনেছেন সমান ঘৃণায় তিনি জীবন ও মৃত্যু ধরে আছেন, রমণীর এই প্রেমের মধ্য দিয়েই পাপ জেগে উঠছে শেষে। এখানে খৃস্টীয় আদি পাপবোধ কাজ করছে ধীরে ধীরে। লরার শরীর ভেঙে পড়ছে, সৌন্দর্য তেমন নেই, অতীত সৌন্দর্যের কথা মনে করছেন কবি, সৌন্দর্য হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু কি ধনুকের ছিলা শিথিল হলে ক্ষত সারে, সৌন্দর্যকে ছাড়িয়েই তাঁর প্রেমবাসনা সর্বদা কাজ করছে। প্রেম তাঁর নিয়তি, যা ধ্বংস নিয়ে আসছে (বোদলেয়ারের সৌন্দর্য স্মরণীয়) ধূসর ভয়, অন্ধকার সন্দেহ জাগছে হৃদয়ে। তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছে ভয় ও অন্ধকার বিষাদ।

১৩৪৮ সালের প্লেগে লরার মৃত্যু হয়েছে। লরার মৃত্যুতে তিনি নিজেও মৃত্যু কামনা করছেন, তিনি এই মলিন পৃথিবী, স্বর্গ, আত্মা ও মৃত্যুকে ঈর্ষা করছেন, কারণ সকলেই লরাকে পেয়েছে, তিনি হারিয়েছেন। মৃত্যুই তাঁর জীবন নষ্ট করে দিয়েছে নিষ্ঠুরতায়; তবু মৃত্যু তাঁকে আহ্বান করছে না। তাই মৃত্যুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে চাইছেন। আবার মৃত্যুকেও তিনি প্রশংসা করছেন, এই মৃত্যু তাঁকে বেঁধেছে, আবার মুক্তি দিয়েছে। লরার মৃত্যুতে শোকের পর সুখ-আনন্দ দিয়েছে সে।[১৩] কিন্তু লরাহারা জীবনে পেত্রাকা প্রত্তরীভূত, অন্ধকারে পরিপূর্ণ। মৃত্যুর কিছু আগে লরার শারীর উপস্থিতি তাঁর প্রেমকে উজ্জীবিত করেছিল, তাই পেয়ে-হারানোর প্রেমের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। স্বপ্নে লরা এসে ধরা দেন, শুধু হৃদয়ের বোঝা-নামানো নয়, কবিতার শিল্পে তাঁকে মূর্তিমতী করে তোলার খ্যাতি তাঁকে আনন্দ দেয়। কিন্তু এখন তিনি লরার দেহের পাশে যেতে চান। দান্তের

প্রভাবে লরার জীবনের ছবি আঁকেন তিনি দিব্য আলোর তুলিতে। তাঁর কাব্য সংগীতকে বাতাসে ভাসিয়ে দেন। লরাকে জানবার জন্যে তিনি জীবনে ক্লান্ত। জীবনের এই ক্ষুব্ধ সমুদ্রে তিনি নিয়ত আলোড়িত হচ্ছেন।[১৪] (জীবনানন্দের পঙক্তি মনে আসে: 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন') অতীতের স্মৃতি মনে করে হৃদয়কে সান্ত্বনা দেন। লরা যে তাঁর প্রতি বিরূপ ব্যবহার করেছেন, তা তাঁর মঙ্গলের জন্যই। কল্পনায় মনে করেন স্বর্গে লরার পাশে তিনি আছেন; মর্ত্যে যে তাঁকে ভালোবেসেছেন তাঁর কথা বলছেন।

বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের তীব্রতা হারিয়ে গেছে, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন পেত্রার্কা, আত্মজীবনীতে বলেছেন: 'যৌবন আমাকে প্রতারণা করেছে, মনুষ্যত্ব আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু বৃদ্ধ বয়স আমাকে শুধরেছে, অভিজ্ঞতা আমাকে এই সত্য শিক্ষা দিয়েছে যে যৌবন ও সুখ মিথ্যে, এই সত্যই আমি বহুকাল পড়াশোনা করেছি।' শুধু প্রেমের খ্যাতি একটা ছলনা এখানে। তাই কুমারী ম্যারির কাছে মাটিতে গড়া তুচ্ছ মানব প্রার্থনা জানিয়েছেন মুক্তির জন্যে, তাঁর পাপ ক্ষালনের জন্যে, স্বীকারোক্তি করেছেন তাঁর প্রেমের। তবু কি তিনি মুক্তি পেয়েছেন লরার প্রেমের কাছ থেকে? 'ত্রিয়োন্‌ফি'র কাব্যে দান্তের 'কম্মেদিয়ার' আদর্শে তেরজা রিমায় প্রেমকে তিনি জ্যোতির্ময় করে তুলতে চেয়েছেন।

পেত্রার্কা দান্তের দিব্য প্রেম ও বোক্কাচ্চিওর যৌন তীব্র শারীর প্রেমের মাঝখানে ক্ষতবিক্ষত। দুয়েরই আকর্ষণ তাঁর কাব্যে তীব্র; তাই বিরোধ প্রচণ্ড ও আধুনিক। এই বিরোধের মধ্য দিয়েই তাঁর কাব্যের নাটকীয়তা অপূর্ব শিল্পরূপ পেয়েছে; এ শুধু অষ্টক-ষট্‌কে দ্বিধা বিভক্ত নয়, প্রতি পঙক্তির মধ্যে এর বিরোধের অস্তিত্ব আছে। তিনি শুধু সনেট রচনা করেননি, বাল্লাতে কান্‌ৎসোনে, মাদ্রিগাল ও হোরাসের আদর্শে ওডও রচনা করেছেন, এগুলির মূল্যবিচার দরকার। মধ্যযুগে পেত্রার্কার মতো কবিতায় বিশুদ্ধ শিল্পের রচয়িতা আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না, বিশুদ্ধ কবিতা পেত্রার্ক থেকেই শুরু। দান্তের কবিতায় জীবন, দর্শন, খৃস্টীয় তত্ত্ব, রাজনীতি, দেশপ্রেম ভার্জিলের ইনিদের মতোই সামগ্রিক রূপ নিয়ে এসেছে, পেত্রার্কা শুধু নিজের হৃদয়ের কথা বলেছেন কবিতায়। পেত্রার্কার কবিতা অলংকারে পূর্ণ, এই কথা পাউণ্ডের যথার্থ নয়; ছবি ও বেদনায় স্পষ্ট। এই হৃদয় বাইরের জগৎ সম্বন্ধে প্রেম সম্পর্কে

সন্দেহ সংশয় অনুমান করে কখনো উল্লসিত হচ্ছে, কখনো বিষাদগ্রস্ত হচ্ছে, কখনো বিষাদ-উল্লাসে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে, কখনোই বহির্জগৎ জানছে না, প্রকাশ করছে না, শুধু আত্মচৈতন্যে সমৃদ্ধতর হচ্ছে ; সবার কোনো হৃদয় আমরা জানিনা, সবাই তাঁর বহির্জগৎ, অর্থাৎ রিয়্যালিটি। কবিতায় নিজেই বলেছেন যে ভালোবাসা সমান স্নিগ্ধ করুণা শোক কান্নার ইন্দ্রিয়ময়তা থেকেই তাঁর অপূর্ব মধুর সংগীত সৃষ্টি হয়েছে।[১৫]

১. Pace non trovo, e non ho da tar far guerra
২. Vergine bella, che di sol vestita
৩. Tanto gentile e tanto onesto parela donna mia
৪, I' mi son pargoletta bella e nova, che son venuta
৫. Chiare, fresche e dolci acque
৬. Tal paura ho di ritrovarmi sole
৭. E veggiola passar si dolce e ria
che l'alma trema per levarsi a volo ;
৮. Tu se´mes au hasard la joie et les de´sastres
Et tu gouvernes tout et ne re´ponds de rien.
৯. Qual paura ho quando mi torna a mente
১০. এই বোধই কি আমরা পরবর্তীকালে অন্তর্মুখীন অস্তিত্ববাদী দর্শনে পাইনা ?
১১. Gentil mia donna, i veggio
১২. Passa la nave mia colma d'oblio
১৩. Occhi miei, oscurato e 'l nostro sole
১৪. Ite, rime dolenti, al duro sasso
১৫. I'vidi in terra argelici costumi

বোক্কাচ্চিওর সাহিত্যভাবনা

বোক্কাচ্চিওর লেখায় আমরা গল্পের আধুনিক মনস্কতা লক্ষ্য করি। দান্তে পেত্রার্কা ও বোক্কাচ্চিও এঁরা সকলে লাতিনে সাহিত্য রচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু মাতৃভাষায় সাহিত্যরচনা করবার কৃতিত্ব এই তিনজনেরই। তিনজনেই ফ্লোরেন্সের প্রাদেশিক ভাষাকে গ্রহণ করে সাহিত্যকে চিরায়তিক মূল্য দিয়ে গেছেন। যদিও ইতালি ভাষা লাতিনসম্ভূত, কিন্তু ইতালি তখন বিভিন্ন উপ-ভাষায় বিভক্ত, বিভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন রাজার দ্বারা শাসিত এবং স্বতন্ত্র, ফলে ইতালির ভেতরে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কোনো ঐক্য ছিল না, দান্তে ফ্লোরেন্সের অশালীন ভাষাকে ভিত্তি করে ইতালির একটি সর্বজনীন ভাষা তৈরি করতে চেয়েছেন। সুতরাং দান্তের ভাষার মধ্যে বাস্তবতা ও মার্জনা একই সঙ্গে লক্ষণীয়, পেত্রার্কাও এই রীতি গ্রহণ করেছেন। বোক্কাচ্চিও মূলত ফ্লোরেন্সের বাস্তব ভাষার সতেজ সজীবতাকে চরিত্রের মধ্যে ও ঘটনায় প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। ইতালিতে ফ্লোরেন্সই ছিল তখন প্রজাতান্ত্রিক, সুতরাং প্রজা বা সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কথা প্রকাশের সুযোগ ফ্লোরেন্সই ছিল। ফ্লোরেন্সকে ঘিরে ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, সেখানে সম্মানিত ছিল লাতিন, বলা হতো, ভাবপ্রকাশের ভাষা লাতিন ছাড়া হতে পারে না। অশালীন ভাষা উন্নত ভাবপ্রকাশ করতে পারে না, জনসাধারণের ভাষা কলুষিত, জন-সাধারণ থেকে দূরে থাকতে হবে। এই কারণেই দান্তের আলোচ্য বিষয় De Vulgari Eloquentia (অশালীন ভাষাপ্রসঙ্গে)। এই অশালীন ভাষার মধ্যে দান্তে কবিতায় বহু অর্থ ব্যঞ্জিত করতে চাইলেন, সেই সঙ্গে ভাষা হয়ে উঠলো মৌল, মাজিত, উজ্জ্বল ও শিষ্ট। এই গুণেই সাধারণ্যে প্রচারিত হলো এবং উজ্জ্বল মাতৃভাষায় যে বিষয় বলবে, সেগুলি হলো Salus, Venus, Virtus (রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, প্রেম ও নৈতিক উৎকর্ষ)। এই বিষয়গুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হবে আনন্দ ও শিক্ষা। খৃস্টীয় ধর্ম বা নীতিই হলো শিক্ষা, আর শব্দের আভরণে আনন্দ, ভালো থাকবার মধ্যেই আনন্দ। নীতি ও আনন্দের পরিণামে

দান্তে হোমারকেই স্বীকার করেছেন, দান্তে প্রাচীন ধারা ও ঐতিহ্য স্বীকার করেছেন এখানে। কিন্তু এই ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এলেন গীতিকবিতার কানৎসোনে রূপকল্প আত্তীকরণে, কবির ব্যক্তিহৃদয়ের প্রকাশই প্রধান হয়ে উঠলো, এখানে দান্তে আধুনিক। ব্যক্তিহৃদয় ও মাতৃভাষায় মিলনগাথার মধ্যেই দান্তের আধুনিকতা।

বোক্কাচ্চিও এই মাতৃভাষাকেই গ্রহণ করলেন, কিন্তু দান্তের থেকে অনেক দূরে এগিয়ে এলেন আমাদের কাছে। সেই যুগে কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে তিনি বর্জন করলেন। মানুষকে শুধু মানবতার দিক থেকে দেখলেন ; খৃস্টীয় নীতিশিক্ষা নয়, মানুষের মানবিক অনুভূতিই প্রকাশ করলেন তাঁর গল্পে, সেখানে দেশের শ্রেণীর ও ধর্মের বিভেদ নেই (৪/১)।

রেনেসাঁসের যুগে কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে কতকগুলি বোধ গড়ে উঠেছিল, যুগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা যখন মাথা চাড়িয়ে ওঠে, সাহিত্যে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তখন দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক ভূতের মতো ছাড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। কবিদের জীবনে, তা থেকে মুক্ত হবার জন্যে কাব্যসাহিত্যে জীবনের বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়। এই বিচ্ছিন্নতা থেকেই রেনেসাঁসের কাব্য ও সাহিত্যের আদর্শ গড়ে উঠেছিল তখন।

এই চেতনা থেকেই ক্লাসিকাল রূপগঠনের জন্য গ্রীক ও লাতিন আদর্শ এসেছিল সে সময় ; ভাষায় ও সংস্কৃতিতে স্বদেশপ্রেম ; সেই সঙ্গে জেগে উঠেছিল অভিজাত স্বাতন্ত্র্যবোধ, এই স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকেই জনগণের ভাষা থেকে কাব্য সাহিত্যকে দূরে সরিয়ে রেখে লাতিনে সাহিত্যরচনার প্রবণতা এসেছিল, কেননা সাধারণ লোকের বিশৃঙ্খলা ব্যভিচার ও মূঢ়তা ও যুগের সাহিত্য-রচয়িতাদের বিতৃষ্ণা জুগিয়েছে ; যেহেতু সাধারণ লোক ছন্দ ও মিল ভালো-বাসে, তাই ছন্দ থেকে মিলকে বর্জন করতে চেয়েছেন এঁরা। এই মিলহীন কবিতাকে রহস্যের গোপনতায় দুর্বোধ্য করে তুলতে চেয়েছেন রূপক ও সংকেত ব্যবহার করে ; বস্তুর চেয়েও সাহিত্যানুকরণ প্রবল, রূপের অনুকরণে এই প্রবৃত্তির প্রকাশ প্রকট। এই রূপ শেষ পর্যন্ত একটা সৌজন্যের মতো বাইরে ভদ্র মার্জিত, এই ভদ্র ও সৌজন্যের প্রকাশ পায় রাজা-রাজড়ার কাহিনীতে। এই সামাজিক রীতি-অনুসারেই সাহিত্যের শ্রেণী ও রূপকল্প তৈরি হয়েছে। ট্রাজেডি এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ ট্রাজেডিতে রাজা ও রাজকুমারদের কাহিনী বর্ণিত। এদের জীবনের ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই ট্রাজেডির প্লট বয়ন করা হয়, তাই

মঞ্চ ও পোশাক এমনি রাজকীয়। কমেডি মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের নিয়ে রচিত। এদের পোশাক, আচারব্যবহার, রীতিনীতি সবই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র করে, তাই তাদের কাজ ও ব্যবহারের জন্য আইনের দ্বারস্থ হয়, এই আইন রাজার ও রাষ্ট্রের। বুর্জোয়া ও ব্যক্তিগত জীবন থেকে গ্রহণ করা হয় এর প্লট, এদের ভাষায় প্রতিদিনের, নিম্ন ও উচ্চবিত্তের মাঝামাঝি। আর প্রহসন হলো একান্তই নিম্ন শ্রেণীর, এদের ভাষাও অশালীন। তাই ট্রাজেডির মধ্যে ভাষার উচ্চতা ও গাম্ভীর্য, ব্যক্তির আভিজাত্য, বাক্যের পূর্ণতা ও স্বাচ্ছন্দ্য অনস্বীকার্য। সেইহেতু ট্রাজি-কমেডিও সেযুগে ঘৃণ্য মনে হতো, কেননা দুই শ্রেণী কখনো একত্র মিশতে পারে না। এমনিভাবে নাটকের সঙ্গে কাব্যের রূপকল্পও তৈরি হয়েছে ; মহাকাব্যের মধ্যে প্রকৃত রাজকুমারই নায়ক, তারই অভিযান বর্ণিত হয় ছন্দে ; এই অভিযানে সে তার পূর্বসূরিদের খুঁজে পায়। মহাকাব্যের মধ্যে বহুশ্রেণীর লোক থাকলেও রাজকীয় পরিবেশের জন্য মহান হয়ে ওঠে এর পটভূমিকা, সেই সঙ্গে থাকবে সৌজন্য। পরে জাতীয়তাবোধের সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি প্রেম ও দেশের নায়কের প্রতি শ্রদ্ধা এসেছে ইতিহাসের মধ্যে। এই কারণেই রোমান্স পরিত্যক্ত হয়তো, এতে অভিজাত বোধ নেই।

ট্রাজেডি যেহেতু রাজারাজড়াকে নিয়ে রচিত, সেইহেতু শাসকদের শিক্ষা দেবার জন্যেই ট্রাজেডির সৃষ্টি। ট্রাজেডির ভয়ঙ্কর ঘটনার ভেতরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজারা যাতে শিখতে পারে কেমন করে তাদের পতন ঘটে, এই শিক্ষা যেন তারা পায় এবং প্রজারাও যাতে বুঝতে পারে যদি আইন না মেনে উচ্ছৃঙ্খলতায় জীবন কাটায়, তাহলে কি অত্যাচার নেমে আসতে পারে। কমেডি শিক্ষা দেয় সাধারণ লোককে মূর্খতা এড়াবার জন্যে, ব্যক্তিগত জীবনে সুখী থাকবার জন্যে, বিশৃঙ্খলা পরিহার করতে। আর মহাকাব্য শিক্ষা দেয় যুদ্ধজীবীদের মহান আদর্শ প্রতিফলিত করতে এবং লিরিক কবিতার সৃষ্টি হয়েছে কবির পৃষ্ঠপোষককে প্রশংসা করবার জন্যে। এ সব মতের বিরুদ্ধে কাস্তেলভেত্রো অনেক নূতন কথা বলেছেন সেযুগে ; কবিতা শিক্ষা দেয় না, শুধু আনন্দ দেয়, অন্য কোনো গুণ এর নেই ; নাটকের তিন ঐক্যের জন্মও দিয়েছেন তিনি। তবু মোটামুটি এই সব নীতিই অনুসৃত হয়েছে মধ্যযুগ থেকে রেনেসাঁসের যুগে।

মধ্যযুগে ধর্মের আওতায় কবি ও কবিতার স্থান খুব উঁচুতে ছিল না, তারা মনে করতো কবিরা ভাঁড়ামি করে নতুবা আমোদ ও স্ফূর্তি জোগায়। বোদ্লেয়ারের 'পণ্য কবিতা'র মতো এঁদের কবিতা পাষাণময়, আকাশের নীল

নেই, কবিতায় পুষ্টির জন্যে দাসীর মতো মন্দিরে কাঁসরঘন্টা বাজাতে যায়, আর উপবাসী হয়ে বিদূষকের পোশাক পরে, বিচিত্র রঙের প্রহসনে ইতর-জনগণকে আমোদ জোগায়।

কবিতার এই হীন কলঙ্ক থেকে রেনেসাঁসের সমালোচকেরা কবিতাকে মুক্তি দিতে চাইলেন, বিশেষ করে বোকাচ্চিও; কবিতা বাইবেলে উল্লিখিত আছে, দৈবী অনুপ্রেরণায় এর সৃষ্টি। এই অনুপ্রেরণা যার মধ্যে আছে, সে কবি; তাকে পবিত্র মহাপুরুষ বলা যায়। প্রফেটের ধারণা এখান থেকেই শুরু, ভগবানের মতো কবিও প্রজাপতি, এবং প্লেটোর অনুপ্রেরণার আদর্শ তখন থেকেই গৃহীত। পার্থিব সম্মানও জোটে তখন, রাজারাজড়ারা তাদের পৃষ্ঠ-পোষকতা করে। রাজা ও নোবলদের সঙ্গে সহবাসে কবিদের কবিতাও মহান হয়ে ওঠে। তখন থেকেই রাজপ্রাসাদে এই কথা প্রচারিত হয় যে কবিতাকে শিকার যুদ্ধ বা অন্য অলস ক্রীড়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। মহান ব্যক্তিরা আবার কবিতাকে ছাপিয়ে প্রকাশ করতে চাইতো না, পাছে এই সামান্য কাজের জন্যে তাদের লজ্জা প্রকাশ পায়। যারা উচ্চ বংশজাত, অথচ কবিতা রচনা করে, তারা আবার ঘোষণা করলো নীচ জাতীয় লোকদের জন্যে কবিতা-চর্চা নয়। রাজপ্রাসাদই তার উপযুক্ত স্থান, স্পেন্সার একথা জোরের সঙ্গে বলেছেন, কবিতাকে সাধারণ লোকদের হাত থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে, নোব্‌লদের হাতে সমর্পণ করতে হবে। তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং আক্ষেপ করেছেন যে কবিতা এখন রাজকুমার ও পুরোহিতরা রক্ষা করে না, অতি নীচ অশালীন হয়েছে বলে কলুষিত হয়েছে, অপরিচ্ছন্ন হাত কবিতার নিভৃত রহস্যকে দূষিত করতে সাহস পায়, তার পবিত্র বস্তুকে পায়ের নীচে মাড়িয়ে যায়, যা ছিল সিজার ও রাজার যত্নের বিষয়। এই কারণেই শিক্ষা ও অভিজাত বংশ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। সভা-কবিদের প্রতি ঘৃণা তখন থেকেই জন্মে। ক্লাসিক সাহিত্যের প্রতি বিশ্বাস আসে। এই বোধ আসে, কবিরা শিক্ষাদাতা, তাদের সব জানতে হবে। কবিতার ব্যাপারে কোনো শিক্ষাই বাহুল্য নয়, তাদের শিল্পিসত্তার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের যোগ থাকবে। কবিতায় আনন্দময় শিক্ষা থাকবে। কবিতা যে প্লেটোর দ্বারা নিন্দিত হয়েছে, এইসব সমালোচক তাকে পরিহার করেছেন, জীবনে বেঁচে থাকতে হলে তিনটি জিনিস দরকার: ইতিহাস যা শাসকদের শিক্ষা দেয়, কবিতা যা লোকদের শিক্ষা দেয়, এবং বাগ্মিতা ব্যবহারজীবীদের শিক্ষা দেয়। রাষ্ট্রে বেঁচে থাকতে

হলে কবিতার প্রয়োজন, কারণ কবিতায় বিপজ্জনক অনুভবের স্খলন ঘটে।

মধ্যযুগের কবিতাবিষয়ক চিন্তা থেকে কবিতাকে মুক্ত করবার জন্যে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাতে তাদের মিলনসেতু ভেঙে গেছে এবং যুগে যুগে এই বিভ্রমই ঘটেছে। কবিতার নামে একদল পশু আমোদের ও ফুর্তির লাইসেন্স পায় বিভিন্ন ব্যাবসায়িক পৃষ্ঠপোষকতায়, আর একদল পাণ্ডিত্যের নামে পাষাণমূর্তি তৈরি করে বিদগ্ধের কোঠায় বন্ধ রাখতে চায়। মধ্যযুগেও এইসব বোধই প্রচলিত ছিল, তা থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করলেন দান্তে, পেত্রার্কা ও বোক্কাচ্চিও। তাঁদের রচনায় ও সাহিত্য-আলোচনায় সাহিত্যের শ্রেণীর বিভেদ মুছে গেল, মানুষের মতো রূপের বিচিত্রতা এলো সর্বত্র, সব মানুষই তাদের সাহিত্য পড়ে আনন্দ পায়, ভাষার পার্থক্যও ঘুচে গেল; হৃদয় ও পাণ্ডিত্য এখানে জলের উপাদানের মতো, আদর্শ অনুসরণ করেও নূতনরূপ তাঁরা দিলেন সাহিত্যে; তা হলো জীবনের।

কবিতা সম্পর্কে বোক্কাচ্চিওর ধারণা সে যুগে একান্ত আধুনিক। দান্তের মধ্যে কবিতার রূপ প্রাচীন পন্থায় এসেছে, আধুনিকতা এসেছে পরোক্ষভাবে, কিছুটা রাজনৈতিক কারণে। মধ্যযুগে কবিতা বিপরীত কোটিতে ঘৃণ্য ছিল। শিশুরা মাতৃকোলে বসে কবিতার শিক্ষা লাভ করে, আর এই শিক্ষা পূর্ণ করে দর্শন, কেননা দর্শনের মধ্যে বুদ্ধির উৎকর্ষ। কবিতা হচ্ছে রঙিন খেলনা। এই কারণে রূপকের আড়ালে, ধর্মের আবরণে, বুদ্ধির ষড়যন্ত্রে কবিতাকে হৃদয়ের উৎসার না ভেবে একটা কৃত্রিম পণ্য করেছিল তারা। দান্তের শ্রেষ্ঠ কাব্যে এই রূপক ও ধর্মতত্ত্ব বর্জিত হয়নি। বোক্কাচ্চিও এসে এই রূপকের আড়াল ভেঙে দিলেন, ধর্মের নীতিকথাকে বিদায় দিলেন জীবনের মূল্যে। যদিও প্রেমই তাঁর বিষয়বস্তু, কিন্তু প্রেমকে ত্রুবাদুরদের মতো কৃত্রিম ও গোপন করে আড়াল করে প্রকাশ করলেন না; প্রেম ইন্দ্রিয়ময় যৌনমিলনে সার্থকতা পায়, অপ্রাপ্য ও দৈবী নয়। মনস্তত্ত্ব ও বাস্তবতাই তাঁর লক্ষ্য।

বোক্কাচ্চিও দান্তের জীবনী আলোচনায় বলেন কবিতাকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে, দান্তে সেখানে শুধু নিজের কাব্যে রচনার কথা বলেছেন ভাষার ক্ষেত্রে। বোক্কাচ্চিও কবিতায় ধর্মকে বাদ দেন নি, কিন্তু ধর্মনীতিকে পরিহার করেছেন। বাইবেল যদি কবিতা হয়, তাহলে তা দৈব প্রেরণায় লেখা হয়েছে, এবং গোপন সত্য ব্যক্ত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে, পবিত্র আত্মা এবং কবির

কোনো ভেদ নেই। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বাইবেলের সঙ্গে বর্তমান কাব্যের কোন প্রভেদ দেখা যায় না। এবং মিথ্‌গুলির মধ্যেই কাব্য রয়েছে, এবং এই মিথের মধ্যেই জীবন, আর এই মিথের মধ্যেই ধর্ম ও চিরকালীন সত্য নিহিত। যেমন স্যাটার্ন শুধু দেবতা নয়, সে সময়ও; সময় জন্ম দেয় ও ধ্বংস করে, তাই স্যাটার্ন সব সন্তানের মধ্যে চারটিকে রেখে আর সব মেরে ফেলে।

বোক্কাচ্চিও দেখিয়েছেন কবিতার শত্রু বহু। কামুক ব্যক্তিরা বলে কবিতা পড়ে সময় নষ্ট না করে প্রেম করে মদ খেয়ে ঘুমিয়ে সময় কাটিয়ে দিতে পারো। দর্শনে যাদের জ্ঞান খুব ভাসা-ভাসা তারা চোখ উল্টে বলে কবিরা হচ্ছে আমুদে ও ফুর্তিবাজ। আইনজীবী, যারা প্রকৃতই অশিক্ষিত, অর্থলাভের জন্যেই যাদের শিক্ষা, তারাও কবিতাকে ঘৃণা করে; কারণ কবিতাচর্চা অর্থোপায়ে বাধা দেয়। তার বলে, এটা সত্যি হাস্যকর যে কবি হয়ে ছেঁড়া জামাকাপড়ে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে আইনজীবী হয়ে অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভে কোনো বাধা নেই। এরা চায় হৈ-চৈ শব্দ চিৎকার সন্তুষ্টি; আর কবি চায় অবসর শান্তি নীরবতা ও খ্যাতি। ধর্মবেত্তারা হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক; তারা বলে কবিতা মিথ্যা, দুর্বোধ্য, কামুকতায় ভরা, অখৃস্টান দেবতার অসম্ভব ও বাজে কাহিনীতে ভর্তি। কবিরা মানুষদের ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায় প্রলোভন দেখিয়ে, অপরাধের প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে, প্রাচীন কবিদের লেখা পড়া পাপ। এরা উদাহরণ দেয় প্লেটোর। বোক্কাচ্চিও বলেন, কবিতা মূর্খের কাছে দুর্বোধ্য, কিন্তু কবিতা মহান, এবং মহৎ ব্যক্তিরা চিরকালই কবিতাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। কবিতা মিথ্যা এ কথা যারা বলে তারা কবিতার প্রকৃতি ও রহস্য উপলব্ধি করতে পারে না। ওভিদের 'প্রেমের শিল্প' এই জাতীয় বই হলেও হোমার ভার্জিল হোরাস কখনও এই জাতীয় গ্রন্থ লেখেননি, ওভিদের মতো কবিকেই প্লেটো নির্বাসিত করতে চেয়েছেন। অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা এই দুইয়ের মিলনই হলো কবিতা। বোক্কাচ্চিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যকে অখৃস্টান করে তুলেছেন। বোক্কাচ্চিও এর উত্তরে বলেছেন খৃস্টান ধর্মের বীজ এতো গভীরে যে তাঁর লেখায় এর দ্বারা কোনো বিপদ হবে না। আর তিনি নিজেও খৃস্টান, যাঁরা প্রকৃতই খৃস্টান ও শিক্ষিত, তাঁরা তাঁর লেখায় ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। বাইবেল যদি কোনো শিক্ষা দিয়ে থাকে, তাহলে তাঁর লেখার মধ্যেও সেই শিক্ষা আছে।

ধর্মের সঙ্গে কবিতা বা সাহিত্যের যোগ আছে ঠিকই, কিন্তু বিষয়বস্তু

নির্বাচনে কবিদের স্বাধীনতা থাকা দরকার। এই স্বাধীনতাতেই কবির সার্থকতা, এখানেই তিনি প্রাচীনকে মেনে নিয়েও আধুনিক। এই স্বাধীনতা তাঁর গল্পে।

এই আধুনিকতার প্রকাশ তাঁর কবিতায় যতোখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁর গদ্য গল্পগ্রন্থ 'দেকামেরোনে'। চতুর্থ দিনের গল্পের ভূমিকায় যে যে কথা বলেছেন তাতে তিনি ধর্মকেও অস্বীকার করেছেন স্পষ্টভাবে। বোক্কা-চ্চিওর সমালোচকেরা বলেছিলেন 'পার্নাস্সসের' কাব্যদেবীর সঙ্গে থাকা উচিত তাঁর এই বয়সে। এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, দেবীর সঙ্গে বেশিদিন থাকা যায় না, যতোটা দেবীরা আমাদের সঙ্গে বাস করেন। দেবীর কাছ থেকে সরে এসে তাঁদের মতো রূপ পৃথিবীতে দেখে মানুষ বাস করতে পারে, এর জন্য তাকে নিন্দা করবার কোনো মানে হয় না। আর দেবীরাই নারী, যদিও নারীরা দেবীদের মতো উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রথম দৃষ্টিতে তারা তাঁদের মতোই দেখতে, এই কারণেই তিনি রমণীদের প্রতি অনুরক্ত। এবং তাঁর জীবনে নারীরা সহস্র পঙক্তি কবিতা লিখিয়ে নিয়েছে, সেখানে দেবীরা তাঁকে দিয়ে একটি লাইনও লিখিয়ে নিতে পারেন নি। তারা তাঁকে সাহায্য করেছে, পথ দেখিয়েছে কেমন করে লিখতে হয়। এই গল্প লেখার সময় এই রমণীরাই তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ফেলেছে। তিনি এই কথাও বলেছেন, নারী হচ্ছে প্রকৃতি, এদের বিরুদ্ধে গেলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবে। এ যেন রবীন্দ্রনাথেরই কথা। নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন: 'ভগবান আমাকে শরীর দিয়েছেন যা দিয়ে তোমাদের আমি ভালোবাসতে পারি, যেখানে আমার আত্মা তোমাদের কাছে শপথবদ্ধ শৈশব থেকে, কারণ তোমাদের চোখে আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তোমাদের অধর থেকে মধুর মতো ধ্বনি বেরিয়ে আসে, তোমাদের স্নিগ্ধ প্রেমের দীর্ঘশ্বাসে অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে।' সুতরাং নারী ও প্রকৃতি এখানে এক। এবং গদ্য ও রোমান্স কাহিনীর সঙ্গে পাঠক হিসাবে নারীর সংযোগ এখান থেকেই। তাঁর বয়সের সম্বন্ধে উত্তর দিয়ে বলেছেন, প্রাচীন বয়সে কাভালকান্তি দান্তে ও চিনো যদি প্রেমের কবিতা লিখতে পারেন, তাহলে তাঁর দোষ কোথায়?

এই একশটি গল্প পড়লে মনে হয় না বোক্কাচ্চিও ধর্মের কোন তাত্ত্বিক রূপ জানতেন বা বিশ্বাস করতেন, যে ধর্মতত্ত্বের কথা দান্তের মধ্যে ও কিছুটা পেত্রার্কার কবিতায় পাওয়া যায়। এই গল্পগুলি হয়তো আধুনিক ছোট গল্পের মতো নয়, টেল্ জাতীয়, কিন্তু কাহিনীকাব্যের সার্থকতা এর সর্বত্র। গল্প বলার জাদু

ছড়িয়ে আছে, পড়তে বসলে শেষ না করে ওঠা যায় না। তখনকার ইতালির সমস্ত শ্রেণীর চরিত্র এতে ফুটে উঠেছে, রাজা সুলতান থেকে সামান্য তুচ্ছতম ভিখিরিও চিত্রিত। ভৃত্যের সঙ্গে রাজকুমারীর ব্যর্থ প্রেম, কুসীদ-জীবী পুত্রের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজকুমারীর বিবাহ সমস্ত বাঁধ ভেঙেছে। দেশ বিস্তৃত হয়েছে ইতালি থেকে স্পেন আলেকজান্দ্রিয়া ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স জার্মান এথেন্স। এবং এই সব দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানুষের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে।

ইতালির মেয়েদের যৌনসঙ্গমের আনন্দের মধ্যে ধর্মীয় নীতি আদর্শ কোন প্রখর নয়, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজকুমারী দেহদান করবার আগে বিবাহের পূর্বে খৃস্টের কাছে সততার শপথ করিয়ে নিয়েছে ভাবী স্বামীকে দিয়ে। বোক্কাচ্চিও প্রেমে নরনারীর নিবিড় যৌনমিলনকে কখনো ঘৃণা করেননি। আদর্শের দিক থেকে এই শারীর প্রেমকে উচ্ছ্বসিত করেছেন। সমস্ত গল্পের মধ্যে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যৌনসঙ্গম আনন্দময় ক্রিয়া, এর মধ্যে পাপ শাস্তি অপরাধ কিছু নেই। এই ইন্দ্রিয়ময় তীক্ষ্ণতা তাঁর গল্পে সর্বত্র। মধ্য-যুগের নারীবিদ্বেষের পটভূমিকায় এই মনোভাব অনেকটা তীব্রতা এনেছে। কিন্তু তীব্রতা আনলেও যে কৌতুক ও আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর অশ্লীলতম গল্প বলেছেন তার তুলনা নেই। মধ্যযুগে নারী নরকের দ্বার, পুরুষের কামনা শয়তান, এই শয়তানই তৃপ্ত হচ্ছে নারীর দেহে, এবং নারীর নরকই পূর্ণ আনন্দে শয়তানকে তৃপ্ত করে সার্থক হচ্ছে যৌনমিলনে। আলিবেশ ও রাস্টিকের গল্পে পুরোহিততন্ত্রের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদকেই জীবনের ছবিতে রূপায়িত করেছেন তিনি। এই গল্প বলার ভঙ্গি ও কৌতুকময় হাসি একটা রঙিন হাওয়া এনে দেয়। বরং এদিক থেকে রূঢ় অশ্লীলতা ফুটে উঠেছে পুরোহিত গিয়ান্নির মাদি ঘোড়ার তৈরি করবার কাহিনী মধ্যে। বোক্কাচ্চিও নারী সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলতে চান, পুরুষ নারীর কাছে যৌনসঙ্গমে কামনার তৃপ্তি ও আনন্দ চায়, পুরুষ এই মিলনে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে হেরে যায়, কিন্তু নারী অনিঃশেষিত উৎস। নারীর হৃদয়ের ইন্দ্রিয়ময় আকর্ষণে নরনারীর সামাজিক অবৈধ যৌনমিলনকে তিনি তেমন নিন্দা করতে চান না, কিন্তু অর্থের জন্যে নারী যদি দেহদান করে অন্য পুরুষকে স্বামীর অজান্তে, সেই নারীকে তিনি জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছেন। চতুর্দশ শতকের নরনারীর এই মিলনের ছবিকে নিবিড় পরিবেশে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখায়।

তাঁর ঘৃণা ফুটে উঠেছে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে; পুরোহিত, চার্চ, পাদ্রিদের যে ভণ্ডামি ব্যভিচার যৌনতা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর নিষ্ঠুরতাই ফুটে উঠেছে। প্রবাদের মতো বলেছেন পুরোহিতের কোনো কথা বিশ্বাস করবে না। অথচ অন্য যে কোনো শ্রেণীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও সমবেদনা ব্যক্তি মানুষের মতো, হয়তো বা কৌতুক মিশেছে সঙ্গে। দান্তের কাব্য দৈবী, পেত্রার্কার কবিতায় ব্যক্তিগত বিষাদ, বোক্কাচ্চিওর গল্প মানুষী, এর জন্য তাঁর গ্রন্থের নাম 'হিউম্যান কমেডি'। সব মিলে সেই যুগের বাস্তব মহাকাব্য, অনেকে ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখে বোক্কাচ্চিওকে ভলতেয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর লক্ষ্য স্বর্গ বা নরক নয়, একান্ত বাস্তব জীবন।

ঠিকই, অধিকাংশ গল্পে বোক্কাচ্চিও নরনারীর যৌন আকাঙ্ক্ষার তৃষ্ণাকে তৃপ্তি ঘটিয়েছেন। কাস্তেল গুইগ্লিয়েমোর প্রাসাদে দস্যুর দ্বারা সর্বস্বান্ত হয়ে শীতের রাত্রে ব্যাবসায়ী যে ভাবে বিধবার আতিথ্য ও আপ্যায়ন পেয়েছে ও পরে তারা সারা রাত্রি দেহের নিরন্তর আনন্দ পেয়েছে, তা যৌনতা ছাড়া কিছু নয়; অথবা ভুল করে স্বামীর বিছানায় না গিয়ে এক রাত্রির অতিথির কাছ থেকে আনন্দ আস্বাদ পেয়েছে যে নারী, সেই নারীকে দেহগত কামনার রূপ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না; কিন্তু স্বামীর প্রেমে ও তার প্রতি নিষ্ঠাও যে নারী দেখাতে পারে বহু কষ্টের মধ্যে, তাঁরও জলন্ত ছবি বের্নাগের স্ত্রীর কাহিনীতে (২/৯) ও মাদোন্না বেরিতোলার চরিত্রে (২/৬) চমৎকার ফুটে উঠেছে। তখনকার যুগে শাদা ও কালোর রাজনৈতিক আন্দোলনে মাদোন্নার স্বামী বন্দী হয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় একটি পুত্র রেখে, সে তখন গর্ভবতী, লিপারিতে দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়, নাপ্‌ল্‌সে আসতে চেষ্টা করে জাহাজে, প্রতিকূল বায়ুর জন্যে জাহাজ ছাড়তে পারেনা, সমুদ্রতীরে থাকে; তার নিত্য কাজ ছিল স্বামীর জন্যে বিলাপ, সমুদ্রতীরে বিলাপ সেরে হৃদয়ের ভার মুক্ত করে যখন সে এলো, একদিন দেখলো তার দুই পুত্র ও ধাত্রী কোথায় উধাও। স্বামী ও পুত্র হারিয়ে বালির ওপরে সে মূর্ছিত হয়ে পড়লো। চেতনা পেয়ে দেখে কোথাও যাবার জায়গা তার নেই, ঘাস খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করলো। এই সময় একটি হরিণীকে দেখতে পেল, কাছের গুহা থেকে বেরিয়ে আবার বনে ছুটে গেল সে। মাদোন্না হরিণীর গুহায় ঢুকলো, দেখতে পেল সদ্যোজাত দুটি হরিণশাবক, কয়েক ঘণ্টা আগেই জন্মেছে, হরিণশাবকদের দেখে এতোই মুগ্ধ হলো যে তাদের কোলে তুলে নিয়ে বুকের দুধ দিলো, হরিণশাবকেরাও আপত্তি করলো না, যেন তাদের মায়ের দুধ

পাচ্ছে, এমনি দুধ খেতে লাগলো ; সেই থেকে এরা তাদের মা ও এই মানবীকে পৃথক করে দেখেনি। ঘাস ও জল খেয়ে, স্বামী পুত্রদের জন্য বিলাপ করে, নিঃসঙ্গ সমুদ্রউপকূলে হরিণশাবকদের মধ্যেই সঙ্গী পেয়ে দিনপাত করে। পরে যখন কুর্‌রাদো রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলো তাকে, তখন হরিণী ও হরিণশাবককে ছাড়তে পারেনি, নিঃসঙ্গ থাকা সত্বেও অন্য পুরুষকে গ্রহণ করেনি একদিনের জন্যে। এই সতীত্ব ও মাতৃত্বের জন্যেই হয়তো বোকাচ্চিও এর নাম দিয়েছেন মাদোন্না।

ষোড়শ শতকের কমেডি নাটকের বিচিত্র প্লটের জটিলতা দেকামেরোনের দ্বিতীয় দিনের গল্পগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। এমনভাবে কাহিনী সাজিয়েছেন তাতে যেমন বিচিত্র ঘটনার অস্বাভাবিকতা ও জটিলতা দেখা দিয়েছে, তেমনি এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চরিত্র জলন্তভাবে স্পষ্ট কথা বলে উঠেছে। ওদের কথা ভঙ্গি ও দেহের বিভিন্ন ভঙ্গিমা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পণ্ডিতেরা বলেন বোকাচ্চিওর লেখায় ভাষার কথা ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য, পদ্যছন্দের ধ্বনি ও গদ্যের স্পন্দন বিষয়বস্তু অনুসারে বিচিত্রভাবে ধরা পড়েছে। চরিত্র পরিবেশ ঘটনার বিভিন্নতা অনুযায়ী ভাষাও স্বতন্ত্র হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর গুরুদেব দান্তে। দান্তে ভাষায় চেয়েছিলেন 'grandiosa vocabula'। ভাষায় গাম্ভীর্য আনতে গেলে শিষ্ট বা বিন্যস্ত (pexa) ও অমসৃণ (hirsuta) দুই শব্দেরই দরকার। মধ্যযুগে ধারণা ছিল কাব্যে শুধু বিন্যস্ত বা মসৃণ শব্দই ব্যবহৃত হবে। দান্তেও এই ধারণা পেয়েছিলেন আর্নোর কাছ থেকে। মধ্যযুগে ত্রুবাদুর কবিতায় দুর্বোধ্য (trobar clus) ও বোধ্য (trobar leu) এই দুই শ্রেণীর মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ ছিল। দুর্বোধ্যপন্থীরা কবিতাকে গুহ্য ও অস্পষ্ট করতে পক্ষপাতী ; এই জটিলতায় কবিতার গভীরতা বাড়ে ; আর স্পষ্ট পন্থীরা বলতেন কবিতা বোধ্য না হলে ওর কোনো মূল্যই নেই। দান্তে দুয়ের মধ্য পথ নিয়েছেন ; বলেছেন, উন্নত বিষয়বস্তু অনুসারে ট্রাজিক স্টাইল তৈরি করতে হলে শব্দের উৎকর্ষের সঙ্গে গঠনের উন্নত রূপ দরকার ; এজন্যে তিনি একটি তৃতীয় শ্রেণীর উদ্‌ভাবন করেছেন, যার মধ্যে দুয়ের গুণই আছে, তার নাম হলো trobar ric. ভাষায় এই সংমিশ্রণ বোকাচ্চিও মেনে নিয়েছেন কাব্যে ও গদ্যে। এই দ্বন্দ্বই আমরা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজের মধ্যে দেখি, যার পরিণত রূপ একালে এলিঅটে।

তাঁর গল্পগুলি বিচ্ছিন্ন, কিন্তু গল্পবলিয়েদের ভূমিকার জন্যে একটা যোগসূত্র ও

সজীবতা এসেছে। আইডিয়া বা বিষয়বস্তুও মোটামুটিভাবে যথাক্রমে এই দশ রকম: ভগবানের অমেয় করুণা, এই কারণেই পাপ করেও পুরোহিতেরা স্বর্গে যায়; পবিত্র বস্তুর প্রতি পরিহাস ঘটলে বিপদ ঘটতে পারে; মন শুদ্ধ না হলে ধর্মে যৌন ব্যভিচার আসে; ভাগ্য ও ধনীনির্ধন নির্বিশেষে নরনারীর প্রেম; প্রেমের শুভ ও নিয়ন্ত্রণী শক্তি; বুদ্ধির চাতুর্য; বোকা স্বামীর জীবনে স্ত্রীর লাম্পট্য; অর্থের বিনিময়ে নারীর দেহদান; প্রেমের জন্মেই অপ্রেম থেকে বাঁচবার জন্মে বুদ্ধির বিচিত্র শক্তি; ও উদারতা। সমস্ত গল্পেই ইতালির নরনারীর ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বর্তমান। দান্তে য়ুরোপের প্রেমের গোপন বিশুদ্ধ আদর্শকে মূর্তিময় করেছেন বিরহের আগুনে; আর বোক্কাচ্চিও মিলনকে মানবমূল্যে বাস্তব পূর্ণতা দিলেন।

তাঁর গল্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন; গল্প শেষ হলে উপসংহারে তারই উত্তর দিয়েছেন একে একে। অভিযোগ, নীতিপরায়ণ ও সতী নারীরা এই কাহিনী পড়বে না; তিনি বলেছেন একথা ঠিক নয়, যদি শিষ্ট ভাষায় গল্প বলা যায়, তাহলে কোনো গল্পই অশিষ্ট নয়। ২. কোনো গল্পে যদি অসংযম দেখা দিয়ে থাকে তাহলে তার জন্ম দায়ী গল্পের নিজস্ব প্রকৃতি। ৩. ভাষার তুচ্ছতাও এসেছে নরনারীর প্রাত্যহিক জীবনে ভাষার ব্যবহারের জন্মে, আর ব্যবহার না করেও উপায় নেই। চিত্রী যদি খৃস্টকে পুরুষ ও ইভকে নারী করে ক্রুশবিদ্ধ করবার যথেচ্ছ অধিকার পায়, তাহলে গল্প লেখক পাবে না কেন? ৪. আর নীতিপরায়ণতা দাবিও করা যায় না, এ গল্পগুলি গির্জায় বা দার্শনিকদের স্কুলে বলা হয় নি, বলা হয়েছে উদ্যানে যেখানে আনন্দই মুখ্য; এই গল্পগুলি বলেছে ও শুনেছে তারা যারা তরুণ ও তরুণী, পরিণত বয়স্ক, এদের বিভ্রান্ত হবার বিপদ নেই। জীবন বাঁচাতে গেলে পাজামাও অনেক সময় মাথায় পরতে হয় বিসদৃশ হলেও। ৫. গল্প ক্ষতিকারক না শুভ নির্ভর করে শ্রোতার মানসিক প্রবৃত্তির ওপর। মদ স্বাস্থ্যকারী, কিন্তু যে জ্বরে ভুগছে, তার কাছে বিপজ্জনক। যার মন দূষিত, ভালো ভাষায় বললেও তা তার কাছে ক্ষতিকারক হবে। শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে কি দূষণীয় কিছু নেই। ৬. প্রত্যেক বস্তুরই তার নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, যখন তাকে ভ্রান্তভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন উল্টো ফল ফলে। এই গল্প পড়ে যারা ভালো কিছু লাভ করতে চায় করতে পারে, ইচ্ছানুযায়ী মন্দও টেনে বার করতে পারে। ৭. গল্পগুলি যেমনভাবে বলা হয়েছে, তেমনি লেখা হয়েছে; সুতরাং যারা

বলেছে তাদের বলার মধ্যেই ভালোমন্দ নিহিত। আর কোন্ সৃষ্টির মধ্যে ক্রটি নেই। ৮. বিচিত্র বলেই বিভিন্নতা এসেছে গুণে ও চরিত্রে। ৯. সংক্ষিপ্ততার গুণ আহরণ করা ছাত্রদের কর্তব্য সময়কে ব্যবহার করবার জন্যে, রমণীদের নয়। ১০. অনেকে মনে করেন হাসিঠাট্টা ও পরিহাস এর মধ্যে অত্যধিক, রমণীরা পছন্দ করেন বলেই এটা করা হয়েছে, হাসির হাওয়ায় তাদের দুঃখ উড়ে যাবে। ১১. পুরোহিতদের সম্বন্ধে ভাষা দূষিত ও বিষাক্ত হয়েছে। এ সম্বন্ধে তিনি বেপরোয়া। ১২. সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর ভাষারও পরিবর্তন ঘটেছে।

একশটি গল্পের তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে সংশয় জাগতে পারে, কিন্তু ভূমিকায় গল্পের পরিবেশ বিষয়ে বলতে গিয়ে ১৩৪৮ সালের কালো মৃত্যুর মহামারী সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তখনকার ফ্লোরেন্সের, তাতে বোক্কাচ্চিওর পর্যবেক্ষণশীলতার সঙ্গে জীবনবোধ ও গল্প বলার দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে, এবং এই গল্পের বাস্তবতা ও সত্য চিত্র কামুর La Peste উপন্যাসকেও হার মানায়। চসার প্রেত্রার্কার সঙ্গে ১৩৭২ সালে পাদুয়ায় সাক্ষাৎ করেছিলেন, দান্তে সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু বোক্কাচ্চিওর গল্প বলার রীতি ও কাহিনী শিখে এসেছিলেন ইতালি থেকে। Teseide-এর কাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে নাইটের কাহিনী হয়েছে; Il Filostrato থেকে Troylus and Criseyde কাহিনী রচনা করেছেন বিস্তৃতভাবে। অনেকেই মনে করেন চসার বোক্কাচ্চিওর 'দেকামেরোন' পড়েননি, 'ক্যান্টারবেরি টেলসের' মঙ্কের প্রতি গৃহকর্তার খুশির কথা গল্পে, পুরোহিতের গল্পে, শমনতলবকারের কাহিনীতে, ব্যাবসায়ীর গল্পে 'দেকামেরোনে'র বহু গল্পের ছায়া আছে, বোক্কাচ্চিও ও চসার দুজনেই পুরোহিততন্ত্রের ওপর ক্ষুব্ধ। শেক্সপিয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে (১০/১)-এর মঞ্জুষা কাহিনী, 'অল্'স্ ওয়েল' নাটকে (৩/৯)-এর জিলেত্তের প্রেমের কাহিনী, 'সিম্বারলিন' নাটকে (২/৯)-এর বেনার্বোর বাজিধরার গল্প, ট্রয়লাস ও ক্রেসিডায় Il Filostratoর প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে দুদেশের কবিপ্রতিভা পৃথক, বোক্কাচ্চিওর যৌন মিলন ও ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণতা লণ্ডনের পরিবেশে স্নিগ্ধ ও গভীর প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যে, ঘটনা চরিত্র-বিশ্লেষণে রূপ নিয়েছে, প্রেমে ও জীবনে gentilesse এসেছে, আপাত আনন্দদায়ী গল্পের পরিবর্তে এসেছে বাস্তব জীবনের সমগ্র শ্রেণীর মানুষের সজীব চিত্র যা উপন্যাসের মহাকাব্যিকতা নিয়ে আসে।

উন্‌গারেত্তির কবিতা

শুনেছে উন্‌গারেত্তির কবিতা সত্যি অস্বস্তিকর ; অ্যারিস্টটল নাটকের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, নাটকের আকার এমন ছোট হবে না যাতে বুঝতে কষ্ট হয়, আবার এমন বড়ো হবে না, যাতে ধারণা করা যায় না। স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নীতি ও আদর্শ উন্‌গারেত্তির কবিতায় নেই। তাঁর কবিতা যেন আমাদের দেশের উৎকীর্ণ লিপির মতো; এতো সংক্ষিপ্ত সংহতি অভাবনীয়, অথচ বেদনায় নিবিড়, নিবিড় বলেই অনুভূতি গানের ধ্বনির রেশের মতো নিয়ত প্রসারিত হচ্ছে ; প্রসারিত হতে হতে দূর দিগন্তে মিলিয়ে যাবার সময় সহসা আমাদের ধূপের গন্ধের মতো অদৃশ্যভাবে আচ্ছাদিত করে দেয় ; এই আচ্ছাদনে আমরা নীরবতার গন্ধে পূর্ণ হতে থাকি। নীরবতা শুধু ধোয় নয়, শব্দের ধ্বনি ও ছন্দ ও পর্বযতির মধ্যে বেদনার নীরবতা গোপনে এসে আমাদের আরো সুদূর নীরবতায় নিয়ে যায়। ইতালির আধুনিক কবিতায় বিশেষ করে লেওপার্দির কবিতা থেকে, নীরবতা একটি প্রধান বিষয় ; কিন্তু এই নীরবতা এখানে পূর্ণ মহিমায় গভীরতম রহস্যের অতলান্ত নীরবতায় নিয়ে যায়, যে নীরবতায় পূর্ণ জীবন আলোকিত হয়ে ওঠে। 'উৎসব-সন্ধ্যা' কবিতায়, লেওপার্দি এক জায়গায় বলেছেন : 'সব শান্তি ও নীরবতা, সব কিছু শেষ হয়ে গেছে এই জগতে, তাদের আর কোনো কথা নয়।'(১) অর্থাৎ উৎসবের আলো মরে গেলে অন্ধকার নীরবতার মধ্যেই জীবনের পরিণতি। এখানে নৈরাশ্যের ব্যথার বেদনার সংগীত বাজছে। কিন্তু 'অসীম' কবিতায় যে নীরবতার কথা বলেছেন লেওপার্দি তা উন্‌গারেত্তির চেতনাকে দীপিত করে। পাহাড়ের ওপর বসে কবি ঝোপঝাড়ের বেড়া পেরিয়ে মহাদেশ দেখছেন, মানবজগতের নীরবতা ও প্রগাঢ় প্রশান্তির চেয়ে আরো কিছু নীরবতা দেখেছেন কবি।(২) এবং এই নীরবতা শূন্যতা আনছে না আগের কবিতার মতো, বরং এই জীবনের পূর্ণতাকে আরো ব্যাপ্ত করছে, এবং পাস্কালের অসীম মহাদেশের নীরবতার ভয়ও(৩) এখানে জাগছে না। তবু কবির হৃদয় ভয়ে পরিপূর্ণ। মহাদেশের নীরবতায় মিলিয়ে যাবার ও হারিয়ে যাবার ভয়। কিন্তু উন্‌গারেত্তির কবিতায় যে নীরবতার আলোর স্রোত আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেখানে কোনো ভয় নেই, দ্বন্দ্ব নেই, সংঘাত নেই, বাইরের নীরবতা, যার অন্য নাম আলো, হৃদয়ের গভীর প্রদেশকে আলোকিত করে দেয়, এবং এই আলো ও নীরবতা যখন ওঠে তখনই

সৌন্দর্যের রমণীয় পবিত্র ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে কবি লাভ করেন। 'ঊষা' কবিতায় উন্গারেত্তি বলেছেন : M'illumino/d'immenso. এই দুটি পঙক্তির চারটি শব্দের একটি পূর্ণ কবিতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিরোনাম। শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় ঊষা কবির হৃদয়কে আলোর স্রোতে ভাসিয়ে অসীমে নিয়ে গেছে। এই অসীম দেশ ও কালে। বাইরের ঊষা ও হৃদয়ের ঊষা এক হয়ে গেছে আনন্দের বেদনায়। এবং আনন্দ বেদনার প্রকাশ বলেই, হর্ষবিস্ময়ের ধ্বনিময় গাঢ় উচ্চারণ, যে উচ্চারণ জাদুময়, এবং জাদুময় হবার জন্যেই ধ্বনির সঙ্গে বস্তুর সমতা রক্ষিত হচ্ছে, শব্দের অর্থ নয়, ধ্বনির সংগীতেই প্রসারিত করে দিচ্ছে আমাদের অনুভূতিকে। সংগীতের ব্যঞ্জনার মধ্যে যেমন একদিকে অনুপ্রাস আছে, তেমনি ধ্বনিহীন নীরবতা কাজ করছে, এখানেও শাদা জায়গা চমকে উঠছে, 'উ' এবং 'ও' ধ্বনি দীর্ঘ কোমল প্রসারিত, তার সঙ্গে মিশছে 'ন্' ধ্বনির গন্ধ মেশানো কোমল তরঙ্গ, 'স্'-এর কর্কশতা তাদের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে, প্রথম 'ম্'-এর যতি এবং 'দ্'-এর যতি থামতে বাধ্য করে, এখানেও শব্দের ধ্বনির মধ্যে নীরবতা, 'মিনো' (mino) ও 'মেন্সো'র মিল একাত্ম নয়, সাদৃশ্যের ইঙ্গিতে সুদূরপ্রসারী। উচ্চকিত ধ্বনি নেই, প্রথমে মনে হয় কানের ভেতরে গুঞ্জরণ, এই গুঞ্জরণ প্রসারিত হতে হতে এমন ব্যাপ্ত হয়ে যায়, যেখানে আলোকিত নীরবতা গোপনে আমাদের আচ্ছন্ন করে, তখন মালার্মের নীরবতার সংগীত আমাদের স্পষ্ট করে তোলে আমাদের চৈতন্য, যেহেতু এটি চৈতন্যের ফসল, সেইহেতু এই সংগীত শুধু প্রকৃতির নির্বোধ অস্তিত্বের উল্লাস প্রকাশ করে না, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নাড়িয়ে দেয়, এই সংগীতের মধ্যে চৈতন্য ও বুদ্ধি একই সঙ্গে যুক্ত, এবং আমাদের সংবেদনায় চৈতন্যের মধ্যে অতি-ইন্দ্রিয়ের পরাজগৎ এসে ব্যাপ্ত করে দেয় ত্রাণকর্তা ছাড়াই, তখন ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের রহস্যময় গূঢ় ও অজ্ঞাত প্রতীক দুলতে থাকে, যার অর্থ আমরা কখনোই বুঝতে পারি না, এই দুর্বোধ্য রহস্যের মধ্যেই আমাদের বেঁচে থাকবার আনন্দের সার্থকতা, বুদ্ধি সেখানে হার মানে, স্বজ্ঞার আলো প্রেরণা হয়ে জ্বলে। উন্গারেত্তির কবিতা এই বিশুদ্ধ জগতের, তাই তার ভাষা ধ্বনি ছন্দ যতি বিশুদ্ধ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে, চিত্রকল্পের অর্থ ধ্বনির সুরে প্রকাশ, কাহিনীর যুক্তিবিন্যাস নেই। এ যেন নারকোলের ভেতরে জলের গভীরে ছোট্ট শাঁসের বিশুদ্ধ শুভ্রতার আকাঙ্ক্ষা শব্দের ধ্বনির মধ্যে। নারকোলের কঠিন খয়েরি ছালের নীচে খোসা, খোসার পর শক্ত আবরণ শিরা-উপ-

শিরায় আবৃত, তার নীচে নারকোলের শাদা আদিইতা, এর পরে স্নিগ্ধ শান্ত মিষ্টি জল, জল পেরিয়ে তার গভীরে অস্তিত্বের শাঁস। উন্‌গারেত্তি সমস্ত আবরণ খোড়ে ফেলে জলের ভেতরে গভীর শাঁসের অস্তিত্বকে শব্দের প্রতীকে ফুলিয়ে দিতে চেয়েছেন কবিতার জাদুময় একটি উচ্চারণে। আদর্শ ভালেরির কাছ থেকেই পেয়েছেন, কিন্তু বহু দূরে নিয়ে গেছেন এই আদর্শকে। আমার মনে হয় প্রতীকী কবিতার শেষ পরিণতি উন্‌গারেত্তির কবিতায়, এর পরে এই রীতির নতুন আবিষ্কার একরকম অসম্ভব মনে হয়। 'পা' (৪) কবিতায় ভালেরি বলেছেন, আমার নীরবতার শিশু, ধীরে ও পবিত্রতায় মাটিতে পা রেখেছে, তোর পা দুটি আমার সচেতন শয্যায় যেতে যেতে বরফ ও শুদ্ধ হয়ে গেল, এই পা দুটি যখন বরফের মতো স্থির শাদা হয়ে গেল, তখনই একে কবি ঐশী ছায়া ও বিশুদ্ধ সত্তা ভাবতে পারলেন, পরমের সঙ্গে তার একাত্মতা ঘটল; তাই একবার ঈশ্বর বলে তিনি চিৎকার করে উঠেছেন বিস্ময়ে। সুতরাং এই পরম নীরবতার শিশুর পা হয়েই কবির কাছে প্রেরণা হয়ে নেমে এসেছে কবিতার ধ্যানের জগতে। কল্পনাই ঐশী ভাবনা। কিন্তু ভালেরি শান্ত হতে চান না পরমের চুম্বনের পুষ্টি পেয়ে, অধীর প্রতীক্ষায় তাঁর কাব্য এবং তাঁর হৃদয় পরমেরই পদযুগল, তার পদধ্বনি নিয়ত বাজছে, আসছে, লীলা জাগিয়ে তুলছে, শুদ্ধ করছে না। এই বিরোধ, প্রতীক্ষার আনন্দ ও বেদনা, সংঘাত ভালেরির কবিতাকে তীব্র করে তুলেছে। কিন্তু উন্‌গারেত্তির কবিতার এই সংঘাত নেই, পরম এসে যেন তাকে ব্যাপ্ত মহিমায় আলোকিত করে দিয়ে গেল মুহূর্তে, এই তারই সংগীতের ধ্বনিতে দিগদিগন্ত কোমল গন্ধের বাতাসের মতো স্পন্দিত। মালার্মেও এই নীরবতারই স্বর পেতে চেয়েছেন, কিন্তু বরফের মধ্যে রাজহাঁসের শুভ্রতার মতো নীরবতা প্রাণহীন ও শুষ্ক হয়ে গেছে। উন্‌গারেত্তির কবিতা সেখানে প্রাণময়।

যখন এই কবিতা পড়ি, তখন অমাদের ভেতরের জগৎ আপনা হতেই খুলে যায় ফুলের পাপড়ির মতো, যে বেদনায় আমরা অসাড় ছিলাম, কবির শব্দের, ধ্বনির, সুরের ও ছবির ঘায়ে আমরা সজাগ হয়ে উঠি; জগতের রহস্য, জীবনের রূঢ়তা পাশাপাশি জেগে ওঠে এবং পূর্ণ বিশ্বের বোধ হৃদয়ে আলোয় ভরে ওঠে, ব্যাপ্ত হয়। 'উপহৃত ও চয়িত এ দুটি ফুলের মধ্যে অব্যক্ত অসীম শূন্যতা' (Tra un fiore colto e l'altro donato l'inesprimibile nulla) দুটি ফুলের পার্থক্য বুদ্ধির ও হৃদয়ের কাছে; উপহার-পাওয়া ফুলের আনন্দের নীরবতা শূন্যতায় ব্যাপ্তির মতো প্রসারিত হতে থাকে। ফুল ছিঁড়ে নেওয়ার মধ্যে

অধিকারের বোধ, জীবন ও জগৎকে সংকীর্ণ করে, কিন্তু ভালোবাসার উপহারে ফুল শাদা রঙের সঙ্গে প্রসারিত হতে হতে নীরবতায় মিলিয়ে যায়, ফুলের অস্তিত্ব হারিয়ে গিয়ে বিমূর্ত শাদা রঙের নীরবতা আমাদের উদ্‌ভাসিত করে। যতক্ষণ উদ্‌ভাসিত না করছে, ততক্ষণ দুই জগতের বাস্তবতা অতিপ্রত্যক্ষ ও রূঢ়; তাই শূন্যতা (nulla) কবিতার শেষে এসেছে। প্রত্যক্ষ জগৎ চিত্রকল্পের ছবির মধ্যে স্পষ্ট, কিন্তু শেষে সুরে এই ছবি হারিয়ে যায়। সামান্য চিত্রকল্পের সাহায্যে জগতের বোধ গড়ে উঠেছে। এই সূক্ষ্ম উপলব্ধির উন্মোচনের মধ্যেই এই কবিতার চাবিকাঠি এবং কঠোর ফর্মের রহস্য। একে সম্প্রসারিত করলে এই বোধ ব্যাহত হয়ে যায়। দুটি ফুলের পার্থক্যের চিন্তার অনুভবের মধ্যেই ব্যাপ্ত চৈতন্যের অভিভব আমাদের পেয়ে বসে। এটা করেন চিত্রকল্পের সাহায্যে, পরে শব্দের ও ধ্বনির বিন্যাসে, তারপরে থেমে যতি ও শূন্যতায়, শেষে সুরের নীরবতায়। তিনি জগৎকে মেনে নিয়েই এই জগৎকে আলোর মতো হাল্‌কা ও ফুলের মতো গন্ধ-ভরা করে তোলেন। সুতরাং এই জগতের বেদনাকে তিনি অস্বীকার করেন না। তিনি যখন ঘুঘু সম্বন্ধে বলেন D'altri diluvi una colomba ascolto. তখন ঘুঘু, শোনা ও বন্যা এই তিনের বস্তু জগতের ধ্বনি ও বস্তুকে ছবি হিসাবে নিয়েই 'দ' 'আ' 'ল্' 'ই' 'উ' ধ্বনির অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে ও সমারোহে প্রসারিত করেন, এর সঙ্গে জটিল ধ্বনির মিশ্রণ করেন 'ক' 'ম্' 'ব্' 'স্' 'ত্' এনে, তা না হলে অনুপ্রাস একঘেয়ে হয়ে যেত। অনুপ্রাবনই মুখ্য; তাই প্রথমে; কিন্তু পাখির ডাক শোনার মধ্যে পাখির ডাকের ধ্বনির উদাস ব্যাপ্তি এবং উড়ে যাবার গতি এক সঙ্গে ফুটে উঠেছে; এই উড়ে যাবার গতিই জলের প্লাবনে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত হয়ে গেল দুই গতি মিলে গেল, জলের গতির মধ্যেই জীবনের স্পর্শ আসে বেশি এবং চলমান জগৎও তাতে বিধৃত। এই নীরব গতিময়তাকে দুটি ছবির মধ্যে সুরের ধ্বনিতে উদ্‌ভাসিত করেছেন ব্যক্তিগত শব্দের রহস্যে। এবং কবির ব্যক্তিগত শব্দের রহস্য পাঠকের হৃদয়কেও রহস্যে নাড়িয়ে দেয়; কেননা সংবেদনার মধ্যে এই বোধ কম বেশি সুপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্য, উনগারেত্তির কবিতায় এই অসীম নীরবতা থাকলেও রোমান্টিক কবিদের ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাস নেই। প্রতীকী কবিতার পরমের নীরবতার সুরের সঙ্গে উনগারেত্তি পাউণ্ডের মারফৎ জাপানের হাইকু কবিতার ফর্মের আদর্শ পেয়েছিলেন, আর ইতালির কবিতায় সুর ও ছবিতো ছিলই। কবি যখন

একটি কবিতার মুহূর্তের অনুভূতিকে শব্দের বিন্যাসে পঙক্তির সজ্জায় অন্ত্যমিলের ধ্বনিতে পঙক্তির পর্বে ও যতিতে আলাদা করেন, তখন তার মধ্যেই কবিতায় পুরো অনুভূতির তরঙ্গ, উত্থান ও পতন পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রথমে কিছু চিহ্ন দিয়ে হারিয়ে যাবার আক্ষেপের শূন্যতা ব্যক্ত করেছেন, তারপর প্রায় প্রতিশব্দে থামতে চাইছেন ; স্বর যেন রুদ্ধ ; থেমে থেমে ভাঙতে ভাঙতে সিঁড়ির পর সিঁড়ি ধরে নেমে মরুভূমির মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছেন, কবিতায় অর্থের ধ্বনি নয়, ধ্বনির অর্থ, এই ধ্বনি যতির মধ্যে ও থামার মধ্যে, কবিতার নাম 'গোদিমেন্তো' (godimento), বাংলায় এইরূপ : 'আজ রাত্রে আমায় অনুশোচনা পেতে হবে যেমন করে একটি নেকড়ে মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে যায়।' হারিয়ে যাবার শূন্যতাই এখানে লক্ষ্য। কিন্তু মরুভূমির এই শূন্যতা এসেছে নিজের পাপের থেকে, এখানেই দান্তের নরক উন্‌গারেত্তির কবিতায় অনুশোচনা রূপে দেখা দিয়েছে, এবং পাপ ফুটে উঠেছে নেকড়ের মতো ভীষণ হয়ে, কিন্তু ভীষণ নেকড়ের জ্বলন্ত শক্তিও নরকের মতো মরুভূমিতে ও অনুশোচনায় হারিয়ে যায়। এই পতিত মানুষের নরকের শূন্যতা প্রথমে বিন্দুর শূন্যতায়, পরে শেষে মরুভূমির ছবিতে। রাত্রি, নেকড়ে, মরুভূমি স্পষ্ট ছবি, এর সঙ্গে বিমূর্ত বিশেষ্য 'অনুশোচনা' যোগস্থাপন করছে, রাত্রির সঙ্গে অন্ধকার ও শূন্যতা শেষ পর্যন্ত মরুভূমিতে প্রসারিত হয়েছে।

···Stanotte
avro
un rimorso
come un latrato
perso
in un
deserte.

মারিনেত্তি যখন ফিউচারিস্ট কবিতায় যান্ত্রিকতা ও তার বিপর্যয় এনে বাইরের জগৎকে নূতন করে দেখতে চাইলেন, উন্‌গারেত্তি হৃদয়ের গভীরে বিশুদ্ধ হৃদয়ের রহস্যকে উন্মোচন করতে চাইলেন এবং জগতের ভিতরে অনন্ত রহস্য খুঁজতে চাইলেন তিনি। মারিনেত্তি চেয়েছিলেন যন্ত্রের ধ্বনিকে তুলতে, উন্‌গারেত্তি শব্দের বিশুদ্ধতাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে ধ্বনির গুঞ্জরণের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত নৈঃশব্দ্যে বা নীরবতায় প্রবেশ করতে চাইলেন, শব্দের মধ্য

দিয়েই শব্দের নীরবতা চাইলেন কবিতায়, যে নীরবতার মধ্যে বিস্ময় ও যন্ত্রণা পাশাপাশি শুয়ে আছে, এবং এই নীরবতার মধ্যে দিয়েই তিনি এক আধ্যাত্মিক জগতে যেতে চাইছেন, সর্বব্যাপী ধর্মীয় বোধে মিলতে চাইছেন মানুষ ও পৃথিবীর সঙ্গে। দান্তের নরক ও মুক্তি একই পঙক্তির বিভিন্ন চিত্রকল্পে চকিতে ভেসে ওঠে। Vita d'un uomo কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতায় বলছেন, (৫) উদ্‌ভাসিত মহাদেশের ঝাপসা না-দেখা অত্যুজ্জ্বল আলোকের মধ্য থেকেই জন্ম নিচ্ছে লিরিক সুরের অদেখা নরম আলো, এই আলোক জীবন ও তারকা, তারকার জীবনের গভীর প্রদেশে আছে নির্জনতা: আর বাইরে প্রচণ্ড জীবন। উন্‌গারেত্তি জীবনের দুই প্রান্তকেই ধরে আছেন, সেই নিষ্পাপ নির্জনতা চাইছেন, সঙ্গে আছে স্মৃতি, হয়তো এই স্মৃতি বা অতীতের মধ্য দিয়েই জীবনের কবিরূপে হয়ে উঠতে চাইছেন উন্‌গারেত্তি। সুতরাং শুধুমাত্র গভীর হৃদয়ের রহস্য নয়, আর হৃদয়ের রহস্য জগৎকে বর্জন করে উদ্‌ভাসিত হতে পারে না। 'মনোবেদনা' নামক কবিতায় বলেছেন, 'মরীচিকাপ্রান্তে তৃষ্ণার্ত স্কাইলার্কের মতো মিলিয়ে যাওয়া। অথবা সমুদ্র পার হয়ে কোয়েলের মতো প্রথম জঙ্গলে। কারণ আবার উড়ে যেতে সে ইচ্ছা করে না। কিন্তু অন্ধ সোনালী পাখির মতো অনুশোচনায় বাঁচতে চায় না।' এখানে মরীচিকা ও মরীচিকা থেকে পালিয়ে যাওয়া, এই দুয়ের দ্বন্দ্ব সমুদ্র পার হয়ে জঙ্গলে যেতে চাইছে. পাখির জীবনের দুর্ভাগ্য তাকে আবার মরীচিকা ও সমুদ্রের মধ্যে উড়ে আসতে হয় তার ইচ্ছা না থাকলেও। এই দ্বন্দ্বই মনের বেদনার কাছে চরম। কিন্তু এই মনোবেদনা অনুশোচনা আনে না, এই মনোবেদনার মধ্যেই হয়তো আনন্দ। এই নিয়েই বেঁচে থাকা, এই মনো-বেদনাই কবিকে বাঁচিয়ে রাখে সৃষ্টিকাজে। স্কাইলার্কের সঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার ক্ষীণ মিল আছে, তবে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা শুধু বর্ণনাময়, একটি নির্দেশ ছুঁড়ে দেয়, আর এখানে উন্‌গারেত্তি কয়েকটি ছবিকে সুরে উড়িয়ে দিয়েছেন বাতাসে; এই ছবির মধ্য দিয়ে অনুভূতি আকাশ সমুদ্র ঝোপ জঙ্গল মরীচিকা কীটপতঙ্গ পাখি সকলকে একত্রে ধীরে ধীরে সকালের আকাশের মতো আলোময় করে তুলতে চেয়েছেন। 'নস্টালজিয়া' কবিতায় শুধু কয়েকটি নরম ছবি, এই ছবিগুলির পরম্পরাই কাহিনী ও অনুভূতির পরিণতি প্রকাশ করছে, রাত্রি শেষ হয়ে যাচ্ছে, রাস্তা নির্জন, প্যারিসে কান্নার ঝাপসা রঙ জমে আছে, ব্রিজের কোণে একটি ক্ষীণাঙ্গী মেয়ের অসীম নীরবতায় সন্দেহ করছেন

কবি, মেয়েটির রুগ্নতা এবং কবির রুগ্নতা পাশাপাশি যাচ্ছে এবং তারা দুজনেই আছেন, তবু যেন ভেসে যাচ্ছেন। এই কবিতা! কিন্তু রাত্রি ও রাস্তার নির্জনতা, বেদনার অস্পষ্ট রঙ, মেয়েটির ক্ষীণ দেহের অসীম নীরবতার মধ্যে রুগ্নতা ও কবির মনের রুগ্নতা যখন মিলে গেল তখন তাদের পাশাপাশি অস্তিত্বের মধ্য দিয়েই বহুদূরে ভেসে যাচ্ছি, পূর্বরাগ থেকে মিলনের অপূর্ব কাহিনী কয়েকটি ছবির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে, এবং মিলনের সুদূরতা মুহূর্তে আমাদের সংক্রামিত করে।

কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ও দুই জগতের পাশাপাশি থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রূঢ় আঘাত কবির ব্যক্তিগত জীবনে পড়েছিল, সেই আঘাতের রূপ স্পষ্ট, তবে শিল্পের নীরবতায় সুদূর রহস্যে পরিব্যাপ্ত। এখানে শুধু হৃদয় নয়, রূঢ় জগৎ কবির কাছে কেমন ভাবে প্রতীকের মাধ্যমে এসেছে, তা লক্ষণীয়। করুণা (La Pietá) কবিতার প্রথমেই বলেছেন: আমি আহত মানুষ। এই আহত মানুষের বেদনাকেই কয়েকটি ছবির মালায় প্রকাশ করেছেন এখানে। এবং এই আহত মানুষের সঙ্গে খৃস্টীয় করুণা মিশে গেছে। কবি নিঃসঙ্গ মানুষের কাছে আসতে চান, যেখানে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কবির অহংকার ও সদিচ্ছা আছে, সদিচ্ছা আছে বলেই মানুষের সঙ্গে তিনি, কিন্তু অহংকার তাঁকে বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত করে রেখেছে মানুষের কাছ থেকে। তবু মানুষের জন্যে তিনি পীড়ন অনুভব করেন। এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাই এই কবিতার উষ্ণ আমেজ। তাঁর এই প্রশ্নগুলির মধ্যেই এই পীড়ন ব্যক্ত, 'আমি কি আমার কাছে ফিরে আসবার আর সুযোগ পাবো না?' কেন এই প্রশ্ন, তার উত্তর দিচ্ছেন, 'নাম দিয়ে তিনি নীরবতাকে ভিড় করে তুলেছেন।' আবার প্রশ্ন, 'আমি কি শব্দের বন্ধনে বাঁধা পড়বার জন্যে হৃদয় ও মনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছি?' আবার উত্তর দিচ্ছেন, 'আমি প্রেতের ওপর শাসন করি।' এর পরে নিজের হৃদয়কে শুকনো পাতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এবং পরেই জগতের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন, সেখানে শুধু অবিস্মরণীয় পশুর কণ্ঠস্বর শুনেছেন, প্রথাগত ধর্মবিদ্‌দের সম্বন্ধে ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানিয়েছেন। নিজের ভেতরে পীড়ন এবং বাইরের জগতের এই পশুর কণ্ঠস্বর দুয়ের মধ্যে থেকে আবার প্রশ্ন করেছেন: 'জীবন থেকে তুমি আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছ। মৃত্যু থেকেও কি আমাকে ঠেলে দেবে?' এই ধর্ম বিশ্বাস জাগছে, তার পরেই বলছেন, হয়তো মানুষ আশা করতে উপযুক্ত নয়। আবার প্রশ্ন করেছেন,

'অনুশোচনার ঝর্না কি শুকিয়ে যায় কখনো ?' ক্যাথলিক ধর্মের কথা এসেছে এর পরে, ধর্মীয় বোধের কথায় পূর্ণ, কিন্তু যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে কবির হৃদয় ব্যথায় কাতরে উঠেছে, মানুষের ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় শেষ আশ্রয় খুঁজেছেন ভগবানের কাছে। এই মানুষ, একঘেয়ে বিশ্ব, এর থেকে মুক্তি নেই। মানুষের অহংকার, সে আশীর্বাদ আনছে নিজের ওপর। কিন্তু জয়ের বিষাদগ্রস্ত হাতে সে শুধু সীমাহীন সংকীর্ণতা নিয়ে আসছে এখানে, মাকড়শার জালের মতো শূন্যে নিজেকে বাঁধছে, সে ভয় করছে না, কিন্তু নিজের চিৎকার ছাড়া কাউকে সে বাধ্য করতে পারছে না। এই হচ্ছে বিজ্ঞানের অভিশাপ। একালে আমাদের ভাগ্য মাটির ঢিবির ছায়ার আশা। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রহস্যময় ঘা। এবং স্বরবিহীন নেকড়ের চিৎকার করতে করতে কবি ক্লান্ত। তাই ঈশ্বরের কাছে চরম আনন্দ চান, হত্যা ছাড়া আলোয় উদ্ভাসিত হতে চান। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পিত প্রাণ করে ভুলতে পারেন নি, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা আছে, কারণ তাঁর মনের ও বাইরের জগৎ দুই, পীড়ন ও অত্যাচারে কলুষিত ও শূন্য। 'আর বেশি চিৎকার করো না' (Non gridate piu´) কবিতায় উন্গারেত্তি যেন কবিতায় নিজের কবিধর্ম ভুলে গেছেন, সমাজবাদী কবির মতো উচ্চ চিৎকারে বলে উঠেছেন(৬) মৃতদেহ হত্যা করা থামাও, আর চিৎকার করো না, আর চিৎকার করো না যদি তাদের কথা শুনতে চাও, যদি তুমি শেষ না হতে চাও, তাদের গুঞ্জরণ শোনা যায় না। উদ্ভিদ ও ঘাসের চেয়ে তারা বেশি শব্দ করে না, সুখে যেখানে কোন মানুষ যায় না। এই জগতের নিষ্পেষণে তিনি তাঁর শৈশবকে হারিয়েছেন, চিৎকারের স্মৃতি ছাড়া জীবনটা আর কিছুই নয়। নৈরাশ্য শুধু উঠছে, জীবনটা গলায় আটকে আছে। চিৎকারের পাহাড় ছাড়া জীবনটা আর কিছুই নয়। স্মৃতিতে মনে পড়ে আমীর মহম্মদ স্যাবকে। এই সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়ে উন্গারেত্তি জীবনের রূঢ়তার কথাই ব্যক্ত করেছেন গভীরভাবে, যে রূঢ়তায় তাঁর মনের পীড়ন তীব্র হয়ে উঠেছে, এই পীড়নের মধ্যেই তাঁর সমাজ বাস্তবতা ব্যক্ত। কিন্তু এই পীড়ন ও অত্যাচার বাস্তব জগতে সত্য হলেও কবির হৃদয়ের গভীরে এক গোপন আকৃতি জগতের ছন্দের আকুলতার মতো কাজ করছে। যখন কোনো সঙ্গতি পান না, তখনি হৃদয়ে অত্যাচারের বোধ জেগে ওঠে, কোন অদৃশ্য হাত যখন তাঁকে কাজ করায় তখনই সুখ। এমনি করে জীবনের বয়সের মধ্য দিয়ে চলেছেন তিনি, জীবনে চলার পথে এই সুখ হচ্ছে নদী। এই কারণেই নদীর আকর্ষণ অনুভব করেন, এখন রাত্রি, কবির কাছে

মনে হচ্ছে তাঁর জীবন যেন ছায়ার ফুল। রাত্রির নির্জনতায় ছায়ার ফুলই কবিকে ও পাঠককে যেন ধীরে ধীরে রহস্যের নীরবতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গ্রীষ্মের সঙ্গে দোয়েল চলে যাচ্ছে, কবিও যাবেন, ক্ষীণ অন্ধকার প্রেম চান না, যে প্রেম কবির এই সৃষ্টিক্রিয়াই, নীরবতায় হৃদয়ে জ্বলে ওঠে।

তাঁকে সব সময় জ্বালা দিয়েছে, গ্রীষ্ম কোনো উন্মত্ততা আনে না, বসন্ত অশুভ কিছু নিয়ে আসে না, শরৎ তার নির্বোধ গৌরব নিয়ে চলে গেছে, নিরাবরণ ইচ্ছার জন্যে শীত কোমলতম ঋতুকে উন্মোচিত করছে, অর্থাৎ শীতের অন্ধকার কুহেলির ভেতরেই মৃদু, রহস্যময় কোমল হৃদয়, যা আমাদের অসীমের দিকে নিয়ে যায়।

'পো'র কবিতার পর আমরা ধরে নিয়েছি ক্ষুদ্র কবিতা ছাড়া কবিতা হয় না, এ সত্য উন্‌গারেত্তি স্বীকার করলেও বহু দীর্ঘ কবিতা তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু এই দীর্ঘ কবিতায় কাহিনী ঘটনাচারিত্র নেই, আছে ছবি, অর্থাৎ চিত্রকল্প ও সুর যা বাইরের পৃষ্ঠার শাদা জায়গার মধ্যে লাফিয়ে চলে, হয়তো এই রীতি উন্‌গারেত্তি পেয়েছেন লাফর্গের কাছে। ইতালির কবিতায় চার জনের প্রভাব অপরিসীম, ভার্জিল, দান্তে, পেত্রার্কা ও লেওপার্দি। বিস্তৃত জীবনের মধ্যে সৌন্দর্য যেমন ভার্জিলে আছে তেমনি মানুষের অসীম দুঃখ-বোধের যন্ত্রণায় ও ধর্মীয় বোধে পাপের অনুভূতি দান্তের কাব্যে আছে, পেত্রার্কা দিয়েছেন প্রেমের সেই হতাশা ও নির্বেদ, যার আরো গভীর রূপ লেওপার্দির কবিতায় পাই; তিনি বলেছেন তিক্ততা ও নির্বেদই জীবন, অন্য কিছু নয় (Amaro e noia la vita, altro mai nulla) এবং এই সব অনুভূতিই উন্‌গারেত্তির কবিতায়। কিন্তু ভার্জিলই বোধ হয় তাঁর জীবনের আদর্শ, এই আদর্শের ফলেই গীতিকাব্যের মর্মে কাহিনীকাব্যের শারীর রূপ দিতে চেয়েছেন, ফলে গীতিকাব্য ও কাহিনীকাব্যের মধ্যে একপ্রকার টেন্‌সন এসেছে। এই টেন্‌সন অনুভূতির মধ্যেও বিধৃত, কিন্তু তাকে লাফিয়ে চলার ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন, সময়ের স্বল্পতা চিৎকারে তীব্র হয়ে ওঠে, বাইরে অনুশোচনা কখন নীরবতাকে ছুঁয়ে যায়, আবার নীরবতা অনুশোচনার স্পর্শে দ্বন্দ্বময় হয়ে ওঠে। ভার্জিলের মতো উন্‌গারেত্তিও ইনিদের মধ্যে শাশ্বত সৌন্দর্য দেখেছেন, কিন্তু এই চিরন্তন সৌন্দর্য চলমান পৃথিবী ও ইতিহাসকে সঙ্গে করে স্থির রহস্য ও নীরবতার দিকে এগোয়। এবং এই চিরন্তন সৌন্দর্যকে পেতে গেলে চাই অকৃত্রিম সততা, সৌন্দর্য ও যৌবন। এগুলি ছিল বলেই ইনিস প্রতিশ্রুত

দেশ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন যাত্রার মধ্য দিয়ে। তাই দিনো বারংবার তাঁর কল্পনাকে নাড়া দিয়েছে। যৌবনের প্রচণ্ড আলো ও তেজ শেষ হবার আগে দিনো তাঁর রমণীর শারীর সৌন্দর্য দিয়ে ভালোবাসতে চেয়েছে, কিন্তু প্রকৃতি এসে সৌন্দর্যকে হরণ করে নিয়ে গেছে কোথায়। এই প্যাশন ও ও প্রকৃতির ভীষণতা কাব্যের মধ্যে ব্যক্ত। এখানে তিনি নাটক, লিরিক ও কাহিনীকে নূতন ধারায় মিশিয়ে দিয়েছেন। বাইরের জগতের মধ্যে যাত্রা করেছেন মহাকাব্যের নায়কের মতো, আবার তারপরই পেত্রার্কার কান্‌ত্‌সোনে ফর্ম অনুসরণ করে বাইরের জগৎ থেকে সরে এসে ভেতরের গোপন রহস্যে ডুব দিয়েছেন, কামনা-ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে নিরাভরণ সত্তাকে নীরবে জাগিয়ে তুলেছেন, যে সত্তা অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে উষার আলোর বন্যার নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে গোপন নীরবের গভীর স্পর্শে। এমনি করে দুই জগৎ মিলে গেল ধ্বনি ও শব্দের ধ্যানে।

'কবির রহস্য' কবিতায় এই নীরব রহস্য আরো গভীরতর : 'বন্ধুর মতোই আমার শুধু রাত আছে ; তাকে নিয়েই আমি চিরকাল পথ হাঁটতে পারি. মুহূর্তের চলা, সময় বৃথা নয়। সময়ের ভেতরে আমার নাড়ী স্পন্দিত হয়। যেমন ভাবে হওয়া উচিত, কিন্তু কখনো বিভ্রান্ত হয় না। এই ভাবে যখন আমি অনুভব করি, অসংলগ্ন ছায়া থেকে, শাশ্বত আশা আমার মধ্যে নতুন করে আগুন জ্বালায়। তোমার পার্থিব ভঙ্গি নীরবতায় ফিরে পায় এবং গভীর ভালোবাসায় এই পার্থিব ভঙ্গি অবিনাশী হয়ে ওঠে। আলো।' শেষ শব্দ শুধু আলো।

উন্‌গারেত্তির কবিতায় ধ্যান আছে, আছে সংগীত, সেই সঙ্গে নীরবের স্পর্শ। যে নীরবতায় প্রাণ ও অপ্রাণ অসীম প্রশান্তির মধ্যে মিলনে শুয়ে আছে, সামান্যতম শব্দের তরঙ্গে যে নীরবতা মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে, অথচ উন্‌গারেত্তি সেই নীরবতাকেই শব্দ ও ধ্বনি দিয়ে আরতি করে নীরবতার গভীরে আমাদের পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেন। তিনি যেন বলতে চান, নীরবতা থেকে সকলের উৎসার, আবার নীরবতার দিকেই সব কিছুর যাত্রা; এই ধ্বনির জগৎ নিয়ত তারই দিকে এগিয়ে চলেছে, উন্‌গারেত্তি শব্দ ও ধ্বনি দিয়ে এই নীরবতাকে রহস্যময় ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ করে তুলতে চাইছেন, যতক্ষণ কোলাহল ততক্ষণই অসংগতি, এই অসংগতি শেষ হয় নীরবতার সঙ্গে একাত্মতায়, আমরা হয়তো যেতে পারি না, কিন্তু আমাদের অনন্ত যাত্রা তারই দিকে, সেই রহস্যই

আমাদের টানছে। 'নদী' (I fiumi) কবিতায় বলেছেন, 'আমার পীড়ন হয় তখনই যখন সংগতির সঙ্গে আমাকে ভাবতে পারি না' (Ill mio supplizio e` quando non mi credo in armonia) এই সংগতি হচ্ছে বিশ্বপ্রাণের নীরবতার সঙ্গে একাত্ম হওয়া।(৭) ফরাশি ও ইতালি কবিতায় যে নীরবতার এত জয়গান, তার সার্থকতাই এখানে। আমাদের উপনিষদেও এই নীরবতার মিলনই ধ্বনিতে ব্যক্ত হয়েছে গভীর স্বরে। কান্‌ৎসোনে কবিতায় এরই কথা অদ্ভুত স্বরে বলেছেন উন্‌গারেত্তি।

উন্‌গারেত্তি তাঁর কবিতায় যে জগৎ তৈরি করেছেন, তার সঙ্গে বাইরের জগতের যোগ আছে, বাইরের জগৎ এখানে উপাদান হিসাবে কাজ করছে, তাঁর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, প্রেরণা ও স্বজ্ঞার কাছে গলে ও মিশে গেছে। তিনি নূতন চিত্রকল্পের জগৎ গড়ে তুলেছেন গভীর ধ্যানে ও পরিশ্রমে, যে জগৎ বাইরের জগৎকে নির্বাসন দিয়েছে ও নিঃশেষিত করেছে, নিঃশেষ করবার ফলেই তাঁর চিত্রকল্পের মধ্যে চৈতন্যের স্বাধীন রূপ স্পষ্ট হচ্ছে, কল্পনার স্বাধীন ক্রিয়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, এই কল্পনাধর্মী চৈতন্যের একটা বড়ো দিকই হলো বাইরের জগতের মধ্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় একাত্ম করে দেবার প্রবণতা; কিন্তু এই প্রবণতায় সে যা তৈরি করে তা বাস্তব জগতের দর্পণ নয়, বা দক্ষ নির্মাণ নয় অংশের যোগে, বরং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

হেগেল সৌন্দর্যকে বলেছেন পরমেরই ইন্দ্রিয়ময় প্রকাশ। তাঁর কাছে সুন্দর আর 'অ্যাব্‌সলিউট আইডিয়া' একই, কিন্তু এই অ্যাব্‌সলিউটের মধ্যেই প্রত্যক্ষ বস্তুর সামগ্রিকতা বিধৃত, এবং একে অন্য ভাষায় মৌল মুহূর্ত বলা যায়, এই প্রত্যক্ষ জগৎ নিজেকে প্রকাশ করছে ও বাস্তবায়িত করছে। এইভাবে শিল্পের বিশেষ ফর্ম তৈরি হচ্ছে। এই উপায়ে আইডিয়া নিজের বিশেষ শক্তির মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়ে উঠছে প্রত্যক্ষ আলোয় তার ফর্মের সামগ্রিকতা নিয়ে। ফর্মের সামগ্রিকতায় বিকশিত আইডিয়াই শিল্পের জগৎ। প্রতীকধর্মী ফর্মে আইডিয়া প্রকৃতি ও মানবজীবনের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে চায়, কিন্তু পারে না, বিমূর্ত অবস্থায় থাকে; ক্লাসিকধর্মী ফর্মে আইডিয়া বিমূর্ত জগৎ থেকে বস্তু জগতে পরিপূর্ণ মিলনে এক হয়ে যায়। কিন্তু মিলনের পরে তাকে আবার যাত্রা করতে হয় অন্য প্রান্তে। আইডিয়ার স্বাধীন ক্রিয়াই হলো আত্মা বা স্পিরিট। এই আত্মা নিজের দ্বারা নিজেই নির্ধারিত। এই স্বাধীন আত্মা ক্লাসিকধর্মী আর্টে নিজেকে তৃপ্ত ক'রে পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্যে, বিশুদ্ধ আত্মিক

জগতে ও নিজের অন্তরতম প্রকৃতির গভীরে নেমে যায় অসীমকে পাবে বলে। এমনিভাবে গড়ে ওঠে রোমান্টিক শিল্প। হেগেলের মতে এই রোমান্টিক শিল্প বস্তু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে। উন্‌গারেত্তির কবিতায় অ্যাব্‌সলিউট আইডিয়া নিজেকে ব্যক্ত করছে কিনা বস্তুর মধ্যে তার স্পষ্ট কথা বা ইঙ্গিত নেই; কিন্তু তাঁর কবিতার শব্দ ধ্বনি যে বস্তু জগৎ থেকে আত্মিক স্বরূপের মতোই নিজের পূর্ণ উপলব্ধির জন্যে জগৎ সীমা ছাড়িয়ে নিজের অন্তরতম প্রকৃতির গভীরে নেমে যায় অসীমের উদ্দেশে, যে অসীম নীরবতারই নামান্তর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই অর্থে উন্‌গারেত্তির কবিতায় হেগেলীয় আদর্শ মিশে গেছে, যার সূত্রপাত হয়তো মালার্মের কবিতার মধ্যে, এবং এই সূত্র ধরেই প্লেটোর আদর্শ হয়তো-বা প্রতীকী কবিতায় ইঙ্গিতবহ।

ফর্ম ও উপমার ধারক হিসাবেই উন্‌গারেত্তির নাম, এঁরা 'হার্মেটিক' কবিতার প্রবর্তক।(৮) উন্‌গারেত্তির এই কাব্যধারাটির সঙ্গে কোয়াসিমোদো ও মন্তালের যোগ গভীর। কোয়াসিমোদোর কবিতার মধ্যেও না-বলার কথার সংগীত ধ্বনিত, চিত্রকল্পের মধ্যে চৈতন্য ও কল্পনার স্বাধীন ক্রিয়া স্পষ্ট, যার সাহায্যে বস্তুজগতের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। এই সঙ্গে দৈববাণী নির্বাসন মিথ্‌, প্রার্থনা শৈশব যৌবন হত্যা বিষয়বস্তুরূপে এসেছে তাঁর কাব্যে। কিন্তু সব মিলে গেছে না-বলা কথার নীরবতায়। কাব্যাদর্শে কোয়াসিমোদো 'হার্‌মেটিক' গোষ্ঠীর হলেও তাঁর কবিতায় নারী ও প্রেম বারংবার এসেছে, যুদ্ধের বীভৎসতা ও ভীষণতা তাঁকে পীড়িত করেছে, যন্ত্রণাকাতর মানুষের মতোই চিৎকার করেছেন, এখানে উন্‌গারেত্তির সঙ্গে তাঁর মিল। কিন্তু ভীষণতার পরও কোয়াসিমোদো আশা করেন যুদ্ধের ভীষণতা মৃত যুবকের সবুজে শান্ত হয়ে যাবে, এবং বহু দূরের যে করুণা জাগবে তা আনন্দেরই নামান্তর। নীরবতার কথা কোয়াসিমোদোও বলেন, কিন্তু এই নীরবতা স্মৃতির গভীরে অথবা আমাদের অভিজ্ঞতার অভ্যন্তরে গোপন কেন্দ্রবিন্দু, এই নীরবতা তার আপন স্বভাবেই আলোকিত হয়, তখন আর বাইরের ভীষণতা তাকে আলোড়িত করতে পারে না, এবং ফেব্রুয়ারির চাঁদ পৃথিবীর ওপর দিয়ে উন্মুক্তভাবে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার স্মৃতিতে তোমার কাছে এ একটা রূপ নিচ্ছে, তার নিজের নীরবতায় আলোকিত হয়ে উঠছে।' (E passava a luna di febbraio aperta sulla tera, ma a te forma nella memoria ; accesa al suo silenzio) স্মৃতির মধ্যে যে রূপ তাতে বাইরের জগৎ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কিন্তু বাইরের জগৎ কর্মের মধ্য দিয়ে নীরবতায় রূপান্তরিত,

নীরবতার মধ্য দিয়েই আলো জলছে হৃদয়ে। অর্থাৎ কর্মের আত্মিক শক্তিই হচ্ছে এই নীরবতা। হয়তো খুঁজলে এমনি একটা আধ্যাত্মিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু কোয়াসিমেদোর কবিতার বাস্তবের বেদনার রঙ স্বচ্ছ ও কোমল; প্রেম সেখানে বাস্তব রমণীর জন্যে কান্নাকেই আলোড়িত করে, নারীর সৌন্দর্যের রহস্য আমাদের হৃদয়কে মুচড়ে দেয়, উন্গারেত্তির মতো এত বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত নন, এবং বুদ্ধিগত ধারণাও এতো তীব্র নয়, এর ফলে তিনি অনেকের কাছে হার্দ্য। মন্তালে এই দুজনের থেকে আরও বাস্তব, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ইউরোপে ধ্বংসের মধ্যে তাঁর হতাশা ও ব্যর্থতাকে প্রকাশ করেছেন, রাস্তা, দেউড়ি, দেয়াল, আয়না মৃতের নিঃসঙ্গ বরফের মতো বিরাটত্বে পেরেকবদ্ধ করে আমাদের কণ্ঠরুদ্ধ জীবন ওঠে আসছে আমাদের জন্যে। তারার ছাই নিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, শক্ত দেয়ালের ওপারে যে বাগান আছে, সেই দেওয়ালের মাথায় জীবনের ভাঙা কাচ রৌদ্রের আলোয় প্রকাশ পাচ্ছে নিয়ত। মানবের এই নিয়তি, এর থেকে মুক্তি নেই, কারণ রোমান্টিকতায় কোনো বিশ্বাস নেই মন্তালের, এর থেকে তিনি মুক্তি চান, কিন্তু পান না, জাদু আসে না, এই জড়তার পর্দা ভেদ করতে পারে শুধু সংগীতের ধ্বনি, যা জাদুর নামান্তর, কিন্তু এ জগতে তা অপ্রাপ্য, তাই স্মৃতিও এখানে মৃত, কে যায় কে আসে কবি তার কিছুই জানেন না, তবু নারীর দেহে ও সৌন্দর্যে মাঝে মাঝে বিশ্বের শক্তি চকিতে ঝলসে ওঠে। এমনিভাবে ধ্বংসের শূন্যতা মন্তালের কবিতায় বারবার উঠে এসেছে। জীবনের পরিবর্তমানতা, সময় স্ফূর্তি সব যেন জটিল উপায়ে তাঁর কাছে উপস্থিত। কিন্তু প্রতীকী কবিতার আদর্শেই শব্দ ও কবিতার ফর্ম গড়ে উঠেছে; প্রতিটি শব্দ অনুষঙ্গ, অর্থ, ব্যঞ্জনা ও সংকেত সংগীতের সুরে ব্যক্ত। এই ধ্বংসের সঙ্গে হার্মেটিক কবিতার আদর্শও মন্তালের কবিতায় অধিকতর প্রকাশিত। মন্তালের 'প্রতিযঙ্গ' কবিতায় বাষ্পের মরীচিকা বস্তুর চেয়ে নূতন কিছুকেই দ্যোতিত করছে। ব্যক্তের মধ্যেই গোপন জর প্রকাশময়। 'কাল্সেত্তো' কবিতায় হেগেলীয় আদর্শকেই যেন ব্যক্ত করেছেন মন্তালে: অব্যক্ত বস্তু পরিচ্ছন্নতার দিকে আসে; ছায়ার স্রোতে শরীরের রূপ পায়। সবই হয় সংগীতে। সমস্ত দৈবেরও দৈবের ব্যাপার হয়ে ওঠে যখন তারপর সে মিলিয়ে যায়।' এমনিভাবে পরিব্যাপ্ত দিগন্তে মন্তালে এগিয়ে যান। আধুনিক ইতালির কবিতায় ভিকো ও ক্রোচের স্বজ্ঞা ও চিত্রকল্পের প্রভাব অপরিমেয়; এর সঙ্গে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও অবচেতন স্বাধীন প্রেরণা জড়িত।

মালার্মে যদিও অ্যাব্‌সলিউটকেই বিশুদ্ধ বলতে চেয়েছেন, কিন্তু বিষয়বস্তুর পরিবর্তে শব্দই তাঁর ধ্যেয়, এবং শব্দের রহস্যময় মাধ্যমে ও সংবেদনায় অন্য এক জগতে পৌঁছতে চেয়েছেন, শব্দের স্বাধীন ক্রিয়ার ধ্বনির সংগীতের তরঙ্গ তুলে পরমের দিকে যেতে চাইছেন; শব্দ ও ধ্বনি যদি যথার্থ হয়, তাহলে পরমের অর্থ আপনা থেকেই আসবে, সুতরাং শব্দই একমাত্র লক্ষ্য। ভালেরি কবিতায় নির্যাস চাইলেও সংগীত ও আইডিয়ার মিলন চেয়েছেন, অর্থাৎ আইডিয়ার বাহনরূপে শব্দ ও ধ্বনি কিছুটা কাজ করে। উন্‌গারেত্তির কবিতায় ভালেরির এই আদর্শই অনুসৃত; নীরবতা বরফের মতোই শব্দের ধ্বনি ও সংগীতে বাঞ্ছিত, অর্থকে তিনি একেবারে বর্জন করেন না। এই সঙ্গে উন্‌গারেত্তির কবিতায় চিত্রকল্পবাদের স্পর্শ লেগেছে বলে মনে হয়, কঠোর ও করুণতর সংক্ষিপ্তরূপের সাহায্যে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্পষ্টতা, চিত্রকল্পবাদের প্রধান লক্ষ্য, দুর্বোধ্য রহস্য নয়। উন্‌গারেত্তির কবিতায় এই কঠিনতম সংক্ষিপ্তির সঙ্গে প্রতীকী কবিতার রহস্যময় দুর্বোধ্যতা মিলে গেছে। পাঁচ-সাত-পাঁচ এই সতের অক্ষর বা সিলেবলের তিন পঙক্তির হাইকু কবিতার অনুসরণের কথা এই প্রসঙ্গেই আসে প্রকৃতির চিত্রকল্প হিসাবে। তবে হাইকু কবিতার সিলেবল্‌ ও ইতালি-কবিতার শব্দের হ্রস্বদীর্ঘ মাত্রার সংগীত ঠিক এক নয়। আমি জানি, ফরাশি কবিতায় প্রতীকী কবিতার এই ধারা অ্যাপোলিনেয়ার এসে ভেঙে দিয়েছেন বস্তু বা ছবির আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাবের সঙ্গে খাপছাড়া অনুভূতির উত্থানপতনে; পরমকে অস্বীকার করে বস্তুর মধ্যেই অধরাকে দেখতে চেয়েছেন তিনি, অ্যাপোলিনেয়ারের কবিতা মাতিসের ছবির মতোই উজ্জ্বল রঙের চমকে উদ্‌ভাসিত, পিকাসোর ছবির মতো এলোমেলো, ভাঙা, বিকৃত, মাঝে মাঝে স্যুররিয়্যালিজমের মতো অবচেতনের গভীর যৌনতায় পরিপূর্ণ, আত্মধিক্কার ও করুণায়, শ্লেষে, বিদ্রূপে জ্বালাময়; কিন্তু তবু তিনি শেষ পর্যন্ত প্রতীকী কবিতারই সন্তান। এখানেই দুই কবির বন্ধুত্ব।

উন্‌গারেত্তি, কোয়াসিমোদো ও মন্তালে তিনজনে মিলে ফরাশি ধারাকে নিয়ে ইতালির কবিতায় নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করলেন। কার্দুচির পর থেকে অধ্যাপকীয় কবিতা চলছিল, তারপর আসে 'ক্রিপাসকিউলার' কবিতা, এই আন্দোলনের প্রবণতা হলো, নির্জনতায় খৃস্টান বিনয়ের মতো সুর, গোধূলির প্রকৃতিকে নূতন করে দেখবার ইচ্ছা, আলো ও ছায়ার মধ্য দিয়ে দার্শনিক স্বরূপকে প্রকাশ; শান্ত জীবন, ক্লান্তি, গদ্যের মতো কবিতা; এর পরেই জন্ম নিয়েছে

মারিনেত্তির ফিউচারিজম্। সাবা যদিও কোনো আন্দোলনে যুক্ত নন, তবু তাঁর কবিতায় মধ্যে অবক্ষয়ের ধারণা, ক্লান্তি, বিচ্ছিন্নতা কাজ করছিল। উন্‌গারেত্তি যেমন একদিকে ফরাশি প্রতীকী কবিতার আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি ফিউচারিজম বাদে অন্য ধারার সঙ্গে তাঁর যোগ খুব দুর্লক্ষ্য নয়। বিশেষ করে 'ক্রিপাসকিউলার' কবিতার ধারা তাঁর মধ্যে হয়তো নূতনবোধ নিয়ে এসেছে। এই বোধের সঙ্গে মিলেছে রূপকল্প, উপমা, সংগীত ও সুর। দার্শনিকতায় পেয়েছেন এঁরা গ্রীক ও রোমান দর্শনের শিক্ষা।(২) দর্শনের চেয়েও তাঁদের কবিতার জাদুময় মন্ত্রের মতো রূপকল্প ও সুর বস্তুর স্বভাব ও তার চরিত্রকে একই সঙ্গে সহসা আমাদের চোখের ওপর প্রত্যক্ষ করে তোলেন, এইখানেই বিশ্বের কবিতায় এই 'হার্মেটিক' কবিগোষ্ঠীর সার্থকতা। যেমন সমুদ্র সম্বন্ধে কবিতাটি ; সমুদ্র চোখের সামনে বিস্তার নিয়ে ভেসে ওঠে :

এখন সমুদ্র গোঙায় না মর্মর ধ্বনি করে না
সমুদ্র
স্বপ্নবিহীন প্রশস্ত ক্ষেত্র রঙহীন সমুদ্র
সমুদ্র
অত্যধিক করুণার্ত সমুদ্র
সমুদ্র
মেঘেদের ছায়া নেই, তারা চলছে সমুদ্র
বিষণ্ণ বাষ্পে তার শয্যা সমর্পিত সমুদ্র
মৃত হাঁ৷ ছ্যাখো সমুদ্র
সমুদ্র

---

১. Tutto e pace e silenzio, e tutt`o posa
Il mondo, e piu` di lor non si ragiona

La sera del di di festa.

২. Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di la` da quella e sovrumani
Selenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo ; ove per poco
Il cor non si spaura.

L'infinito

৩. le silence de ces espaces infinis m'effraie. Pascal

৪. Tes pas, enfants de mon silence
Saintment, lentement place's
Verse le lit de ma vigilance
Proce'dent muet et glace's. Les pas.

৫. Rilucere inveduto d'abbagliati
Spazi ove immemorabile
Vita passano gli astri
Dal peso pazzi della solitudine

৬. Cessate d'uccidere i morti
Non gridate piu', non gridate
So li volete ancora udire,
Se sperate di non perire.

৭. আমাদের দেশে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় উন্‌গারেত্তির প্রভাব স্পষ্ট; যেমন, কবিতার কর্মে, শব্দ ব্যবহারে, যতি ও ছেদের, পঙক্তির ব্যবহারের নীরবতার বোধে। 'নিঃশব্দের তর্জনী' তিনি উন্‌গোরেত্তির কাছ থেকেই পেয়েছেন, 'কিন্তু এমনও কথা কি নেই যাতে নীরবও গড়ে ওঠে'? এই বাক্য উন্‌গারেত্তির প্রায় প্রতিধ্বনি।

৮. হার্মেটিক Hermetica থেকে এসেছে। এই দর্শনের শিক্ষার সঙ্গে Hermes Trismegistus-এর নাম যুক্ত। মোসেসের সময় থেকে এই শিক্ষা চলে আসছে। দর্শনে তাঁরা নব্য প্লেটোবাদী। অর্থাৎ আইডিয়ার ইন্দ্রিয়ময় প্রকাশ হচ্ছে এই জগতে। এবং এই ধর্মীয় বোধের মূল কথা হলো, ত্রাণকর্তা ছাড়াই মুক্তি সম্ভব; প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়। দীক্ষা ও নির্দেশে এই জ্ঞান আসতে পারে। প্লেটোর Timaeus-এর মধ্যেই তাঁরা এই ধর্মের বীজ দেখেছেন, নিয়ন্তর ইন্দ্রিয় জগৎকে বশীভূত করছে জ্যোতির্বিজ্ঞান। (Everyman's Classical Dictionay) এই ধারণার সঙ্গে মন্তালের বোধের তেমন কোনো ফারাক নেই। মন্তালের প্রতিষঙ্গ কবিতায় বোদ্‌লেয়ারের 'প্রতিষঙ্গে'র প্রভাবপাত আছে। যদিও বোদ্‌লেয়ার ও র‍্যাবো দুজনেই অনু-প্রাণিত হয়েছিলেন সুইডেনবোর্গের মিস্টিকতার দ্বারা। বোদ্‌লেয়ার জড় ও চেতনায় দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর মধ্যে রহস্যময় ধ্বনি শুনেছিলেন, র‍্যাবো 'মিস্টিক'

কবিতায় দেখেছেন দেবদূতেরা নদীর তীরভূমিতে ইস্পাত ও পান্নার মতো শুল্মে পশমের পোশাক পাল্টাচ্ছে। দেবদূতের আবির্ভাবের ফলেই পর্বতশীর্ষ থেকে অগ্নিশিখা ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেন, দেখেন আকাশের ও তারার মধুর ফুল, তবু নদীর তীরে ফুলের ডালির মতো নেমে আসছে, আমাদের মুখে আসছে। গভীরকে পুষ্পময় ও নিম্নভূমিকে নীল করে তুলছে। এই রহস্যময় পরমের আবির্ভাবেই এটি ঘটেছে। নব্যপ্লেটোধর্মীদের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই র‍্যাঁবোর এই ধারণার সঙ্গে। কিন্তু এই ধরনের দেবদূতের আবির্ভাব উন্‌গারেত্তিতে তেমন নেই। এইখানেই তিনি আধুনিক। কিন্তু মন্তালে বলেন: Tendono alla chiarita' le cose oscure/si esauriscono i corpi in un fluire/di tinte : queste in musiche. Svanire/e' dunque ventura delle venture.

৯. মূল ইতালি ভাষায় কবিতা উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে পাণ্ডিত্যের জন্যে নয়, মূলের ধ্বনির আস্বাদনের জন্যে।

ইউজেনিও মন্তালে

আধুনিক ইতালীয় কবিতায় ফরাশি প্রতীকী কবিতা, ভিকো ও ক্রোচের স্বজ্ঞা ও চিত্রকল্প, ব্যক্তির কেন্দ্রে নিহিত অবচেতনে স্বাধীন প্রেরণা, হেগেলের পরম, দান্তের যন্ত্রণাকাতর ও অনুশোচনাময় জগৎ থেকে প্রেমের স্বর্গীয় আলো, লেওপার্দির বিষাদ ও নির্বেদ, ভার্জিলের ইনিসের অনন্ত যাত্রা, ইতালীয় ভাষার কোমল ধ্বনির নম্র সংগীত ও তীব্র ইন্দ্রিয়চেতনা—সব মিশে আছে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে।

উন্‌গারেত্তি কোয়াসিমোদো ও মন্তালে—এই তিনজনে একত্র মিলে হার্মেটিক কবিগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিলেন; এই তিনজনের মধ্যেই কম বেশি ওপরের গুণগুলি বর্তেছে। হার্মেটিক কবিতা ফরাশি প্রতীকী ও অবক্ষয়ধর্মী কবিতারই নূতনতর উজ্জ্বল রূপ। ১৯৩৬ সালে ফ্রান্‌চেস্‌কো ফ্লোরা La poesia ermatica বইয়ে এই কাব্যচেতনার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেখান যে বোদ্‌লেয়ার মালার্মে ও বিশেষ করে ভালেরি থেকেই এই কাব্যচেতনার সূত্রপাত এবং ইতালিতে উন্‌গারেত্তিই এর প্রধান প্রবক্তা। এবং ইতালিতে এই কবিতার পূর্বসূরি হচ্ছেন আর্তুরো ওনোফ্রি (১৮৮৫-১৯২৮)। ফরাশি বিশুদ্ধ কবিতাই ইতালিতে নিরাবরণ বা 'নগ্ন কবিতা' এবং নন্দন তাত্ত্বিক মিস্টিকতায় পর্যবসিত হয়। 'নগ্ন' এই কারণে যে শব্দের মধ্যে কোনো অলংকার ও যুক্তি থাকে না, ধ্বনিময় সংগীতের ব্যঞ্জনায় এর শব্দের অন্তর্নিহিত মিস্টিক রহস্য কেঁপে ওঠে। সংগীতই এর প্রাণ, আবার সংগীতই নীরবতাকে দ্যোতিত করে। স্তবকের বদলে কবিতায় থাকে পাশাপাশি উজ্জ্বল আলোর মুহূর্ত ও শাদা শূন্যতার মুহূর্ত। এই মুহূর্তগুলি স্বজ্ঞারই সন্তান। এবং সমস্ত কিছুই গড়ে ওঠে সংগীতে। এই কারণে হার্মেটিক কবিতাকে অনেকে বুদ্ধিজনিত সংগীতও বলতে চেয়েছেন, যার মধ্যে দুর্বোধ্যতা ও রহস্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও স্পন্দিত। এই ধ্বনি ও সংগীত ভালেরির পেণ্ডুলামের মতোই নিরন্তর দোলে, ইন্দ্রিয়ময় ও অতীন্দ্রিয় জগৎকে ইঙ্গিতবহ করে তোলে নিয়ত। 'হের্মেস্' (Hermes) কথাটির মধ্যেই এই তাৎপর্য লুকিয়ে আছে; জিউস ও মাইআর সন্তান হলো হের্মেস, সে দেবদূত, অন্ধকার পাতাল প্রদেশের সঙ্গে তার যোগ আছে। মৃতের পথচালক

এবং স্বপ্নের মধ্যে তার অস্তিত্ব জড়িত। পরবর্তীকালে হের্মেস-এর রূপ দেখি এক শ্মশ্রুবিহীন নগ্ন সুন্দর অপূর্ব ব্যায়ামশীল যুবকরূপে। এই পাতাল ও স্বর্গের সঙ্গে যোগ থাকবার ফলে, সমগ্র জগৎকেই হের্মেস ধরে আছে, হার্মেটিক গোষ্ঠীর 'নগ্ন কবিতার' নগ্নতা হের্মেসের নগ্ন রূপ থেকেই জন্মেছে বলে মনে হয়।

বোদ্‌লেয়ারের 'প্রতিবন্ধ' কবিতার সঙ্গে মন্তালের 'প্রতিবন্ধ' কবিতা মিলিয়ে পড়লে দুই কবির সাদৃশ্য ও পার্থক্য স্পষ্ট হবে: বোদ্‌লেয়ারের কাছে প্রকৃতি একটি মন্দির যেখানে জীবন্ত স্তম্ভগুলি কখনো অস্পষ্ট গুঞ্জরণ করে, মানুষেরা সঙ্কেত-অরণ্য দিয়ে যায়, এই সঙ্কেত মানুষদের পরিচিত দৃষ্টি নিয়ে দেখে। এই বিশ্বজগৎকে বর্জন না করে বরং মন্দিরের মতো পবিত্র দেখেছেন বোদ্‌লেয়ার। কিন্তু এই পবিত্র ও পূত প্রকৃতি জড় নয়, তার অন্তরে গভীর আনন্দ, প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু পরস্পরে কথা বলে তাই, কারণ এই জীবন্ত প্রকৃতি হলো প্রতীক, এই প্রতীক পরমের। এই প্রতীকরূপিণী প্রকৃতি পরমের সঙ্গেই কথা বলে, এমনি করেই ইন্দ্রিয় ও আত্মার গান বেজে ওঠে (qui chantent les transports de l'esprit et des sens)। আত্মাই ইন্দ্রিয়তে আসে কিনা একথা বোদ্‌লেয়ার বলেননি ; বিকাশধর্মী না বলে দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজেছেন এবং প্রতীক কথার ভেতরে জগতে পরমের সম্পর্ক আছে এই সত্যই ব্যক্ত। এখানে প্রকৃতি জড় বলে পরিত্যক্ত নয়।

মন্তালে 'প্রতিবন্ধ' (corrispondenze) কবিতায় প্রথমেই বলছেন : 'এখন দূরে বাষ্পের মরীচিকা দুলছে এবং ছড়িয়ে পড়েছে ; গাছের মধ্যে সবুজ কাঠঠোকরার শব্দে অন্য কিছু ঘোষণা (altro annunzia, tra gli alberi, la squilla del picchio verde) অর্থাৎ জগতের মধ্যেই অসীমের আভাস এবং এই জগতের বস্তুসত্তা বাষ্পীয় মরীচিকায় দুলছে। পরের স্তবকে আছে এই বস্তু পৃথিবীর স্বরূপ বর্ণনা, হাত এই জগতেরই প্রতিরূপ ; পৃথিবীর অভ্যন্তরে ও বিচ্ছিন্ন বিন্দুসহ হৃদয়ের জাল ভেদ করে ; এই হাত পুকুরের আয়নায় সোনার অশুভকে লালন করে, যখন সুরাদেবতা বাক্কুসের শব্দময় গাড়ি পাহাড়ের পোড়া জায়গা থেকে ভেড়ার উদ্দাম চিৎকার নিয়ে আসে। দুই বিপরীতধর্মী উপাদান এখানে সংশ্লিষ্ট, সুরাদেবতা ও ভেড়ার বন্য চিৎকার, সোনা ও অশুভ ; হৃদয়ের পুকুরের আয়নায় ও বহির্জগতে সর্বত্রই এই দুই বিরোধ একীভূত।

তারপরই মন্তালের কাছে পরম এসেছেন মেষপালিকার রূপে ; তাঁকে তিনি চেনেন, কিন্তু উড্ডান গতি ছাড়িয়ে কি সে পাঠ করে, তা জানেন না, অথচ এই উড়ানই গিরিপথ বুনছে। উন্মুক্ত প্রান্তরকে তিনিই বৃথাই জিজ্ঞেস করছেন যেখানে আলোর উজ্জ্বলতার মধ্যে কুজ্ঝটিকা স্থির হয়ে আছে, ছড়ানো ছাদে কুয়াশার গতি শুরু হয়, বাষ্পময় সমুদ্রউপকূলে সংবাদের গোপন জরের কথা জিজ্ঞেস করেন। এখানে 'সংবাদের গোপন জর' শব্দ লক্ষণীয়, জগৎ যখন বাষ্পময় হয়ে ওঠে, তখনই অন্ত জগতের সংবাদের গোপন জর আমরা অনুভব করি। মন্তালে এখানে রহস্যের যবনিকা ভেদ করতে পারেন নি, বরং জগতের কঠিন বস্তুকে বাষ্পময় করে তুলে অসীমতায় আত্মিক রূপকে পেতে চান, কিন্তু এই অসীম আত্মিক রূপের স্বরূপ জানেন না, ইঙ্গিতে শুধু বলেছেন সংবাদের গোপন জর। এমনিভাবে কঠিন বস্তুজগতের সঙ্গে অসীমের যোগ ঘটছে, নতুবা বলা চলে বস্তুজগৎই অসীমে নীত হচ্ছে, এবং অসীমই গোপন জরের অনুভবে প্রকাশ পাচ্ছে, এখানে এমনি করে দুয়ের ওঠা-নামা চলছে। একথা ও অনুভব শেলির ও রবীন্দ্রনাথেরও, হয়তো-বা পৃথিবীর রোমান্টিক কবিদের, কিন্তু তাঁদের বাণীর বিন্যাসের সঙ্গে মন্তালের কোনো মিল নেই, এতো ঘন, এতো নিবিড়, দ্যুতিময়, প্রতীকধর্মী, উপমার অদৃশ্য বন্ধনে জাদুময়, কিছুতেই তাকে গদ্যে প্রকাশ করা যায় না। মন্তালে যেন মালার্মেকে ছেঁকে নিয়েছেন তাঁর বস্তু অভিজ্ঞতাকে রূপ দেবার জন্যে। কিন্তু মন্তালের 'প্রতিষঙ্গ' কবিতা থেকে দুটি জিনিস পাচ্ছি, একটি হলো সীমা ও অসীমের মিল, অন্যটি হলো দুই বিরোধের একত্র সহাবস্থান, যা বোদলেয়ারের কাব্যে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

অনেকে এলিঅটের ইতালীয় সংস্করণরূপে মন্তালের কাব্যকে দেখেন, তাঁর দেশেরই একজন বিজ্ঞ অধ্যাপক বলেছেন যে মন্তালে এলিঅটের 'অবজেকটিভ কোরিলেটিভ' ইতালীয় কাব্যে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন, তাঁর মনে গোলক-ধাঁধার অস্তিত্বের শাশ্বতকালের মধ্যে জড়িয়ে আছে ভবিষ্যতের স্মৃতি ও অতীতের প্রাক্‌দৃষ্টি। আমি জানি না, ভবিষ্যতের স্মৃতি ও অতীতের প্রাক্‌দৃষ্টির ব্যাপার সম্ভব কি না, কিন্তু এই জাতীয় গোলমেলে ব্যাপার মন্তালের কবিতায় আছে। এলিঅট যেমন ভিন্ন দেশী শব্দ ব্যবহার করেন কবিতায়, মন্তালেও 'Eastbourne' কবিতায় 'ব্যাঙ্ক হলিডে' ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন। দুই বিরোধের সহাবস্থান দুজনের মধ্যেই প্রকট, মন্তালে যেমন বলেছেন, তুমি

এও জানতে অন্ধকারে-আলো (Anche tu lo sapevi, luce-in-tenebra) তেমনি এলিঅটও বলেন। এমনি কথার রীতিই এলিঅটের : mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. ভাঙা চিত্রকল্পের স্তূপ সাজাবার ভঙ্গি দুজনেরই, এবং দুজনেই কাহিনী বা ঘটনা না বলে মোটিফগুলি বিশেষ মর্জিতে একত্র করেন; তাঁদের প্রতীকই তাঁদের বক্তব্য; ধ্বনি চিত্রকল্প উপমা ও ছবির মধ্যেই ঘটনা কাহিনী ও চরিত্রের অর্থ পরিবর্তন হয়, এবং দুজনেই পড়ো জমির মতো জগৎ দেখেছেন প্রথমে। Dora Markus কবিতায় মন্তালে বলেছেন : 'তারপর আমরা দক্ষিণে শহরের পর্যঙ্কে পরিখা অনুসরণ করলুম, সমতল দৃশ্যে ঝুলে উজ্জ্বল হয়ে উঠলুম, যেখানে গতিহীন ঝর্না স্মৃতিবিহীন হয়ে মজে যাচ্ছে এবং যেখানে পুরনো জীবন নম্র প্রাচ্যের উদ্বিগ্নতায় বিচিত্রিত।' এই সমস্ত ধ্বনি ও ছবির অনুষঙ্গ পুরোপুরি পড়ো জমিকে স্মরণ করায়। কিন্তু দুয়ের সাদৃশ্য এসেছে এই কারণে যে এঁরা দুজনেই একই উৎস থেকে তৃষ্ণার জলধারা গ্রহণ করেছেন। ফরাশি প্রতীকী ও ইংরেজি মেটাফিজিক্যাল কবিতার প্রভাব দুজনের মধ্যেই আছে। এবং যদিও এলিঅটের প্রভাব মন্তালের ওপর একান্ত অনস্বীকার্য, তাহলেও মন্তালে এলিঅটকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছেন। মন্তালে ও এলিঅটের কবিতা পাশাপাশি পড়লে মন্তালের রচনার সংহতি, সংক্ষিপ্তি, চিত্রকল্প ও প্রতীকের নিটোল অথচ আত্যন্তিক স্পৃহা, দ্রুত লাফানো ভঙ্গি শেষ পর্যন্ত আমাদের বিভ্রান্ত করে বেশি। মন্তালের কবিতায় বাক্যের অর্থনির্দেশে অন্য ভাষার ব্যবহার প্রায় নেই, কিন্তু গোপনে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে সামান্য ইঙ্গিতে এমন এক জটিলতা সৃষ্টি করেন, যে জটিলতার দুর্বোধ্যতায় আমরা হতবাক, কিন্তু আকৃষ্ট। এই সংক্ষিপ্ততা উন্‌গারেত্তির কবিতাতেও বিদ্যমান, এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির তীক্ষ্ণ চেতনা আমাদের অন্য জগতে নিয়ে যায়, কিন্তু বাস্তবের গাঢ় আলিঙ্গন ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নিশ্চিতভাবে মন্তালের কাব্যে; এই সঙ্গে বের্গসঁর সময়ের প্রবহমানতা তাঁর কবিতাকে অন্যরূপ এনে দিয়েছে।

কোনো কবি সচেতন কিনা, এবং মহৎ কিনা, তা নির্ভর করে তাঁর কবিতায় তখনকার কালের চিহ্ন বহন করে তিনি শব্দের মধ্যে নীরবতা আনতে পেরেছেন কিনা, এই সামর্থ্যের বিচারে। উন্‌গারেত্তিও এই নীরবের কথা বলেন, তিনিও নিজের ব্যক্তিগত দুঃখকে জাতিগত দুঃখের বেদনার সঙ্গে মিশিয়ে বলেন, মৃতের নীরব চিৎকারে দেশ ভরে গেছে। ফ্যাসিস্ট ইতালির

যন্ত্রণা ও নিষ্ঠুরতার এ তিন কবিই সদা জাগ্রত : যদি নিঃশেষ হতে না চাও তাহলে মৃতদেহ হত্যা করা থামাও। কিন্তু শতাব্দীর মৃত্যুহীন ভঙ্গি নিয়ে সে (সম্ভবত মুসোলিনী) নেমে আসছে তার প্রাচীন লোককে ছায়ার গভীরে নিয়ে যাবার জন্যে। উন্‌গারেত্তির মতো সোচ্চার মন্তালে ততোটা নন, La primavera hitleriana কবিতায় তখনকার ইতালির দৃশ্য ও ছবি সংকেতে স্পষ্ট ; রোমের রাস্তা দিয়ে ফুরের হেঁটে গেছে তার অনুচরদের স্তাবকতার চিৎকারের মধ্য দিয়ে ; এই ফুরেরকে মন্তালে বর্ণনা করেছেন নারকীয় দূত হিসেবে, তাদের পতাকায় ক্রশ চিহ্ন লটকানো। যারা নিরীহ তাদেরও হত্যার নেশায় পাগল করেছে, সেই তীরভূমিকে দংশন করেছে এবং কেউই আর এখন নির্দোষ নয়। সূর্যমুখী পুড়ে গেছে, পরাগে সবুজ গাছ শোষিত, আগুনের মতো পরাগ হিসিয়ে শব্দ করছে, চলমান তুষারের তীক্ষ্ণতা এর মধ্যে। এই আহত বসন্তকাল, তবু কবির কাছে এখনও ছুটির আনন্দের দিন, যদি সে মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যুকে তুষারীভূত করতে পারে। আশা করছেন, এই সাইরেন, এই মৃত্যুর ঘণ্টা, ডাকিনীদের বিশ্রাম দিনের সন্ধ্যায় যে দানবদের অভ্যর্থনা করে, এইগুলিই হয়তো একদিন অন্য ধ্বনি নিয়ে আসবে, আগামীকালের সকালের নিশ্বাস নিয়ে আসবে, বিভীষিকার ডানা থাকবে না, দক্ষিণের রৌদ্র দগ্ধ তীরভূমিতে এই সকাল আসবে। এই কবিতার প্রথমে যে বর্ণনা আছে, তা যেমন একদিকে ছবি, তেমনি অন্যদিকে সংকেত : 'উন্মত্ত মথের শাদা মেঘের ভিড়, অস্পষ্ট আলোর ও প্রাচীরের চারদিকে ঘুরছি, পৃথিবীর ওপর চাদর ছড়িয়েছে, পায়ের নীচে চিনির মতো চড়্ চড়্ শব্দ করছে' বস্তুকে এইভাবে উন্নীত করেছেন সংকেতে, মথের অর্থ এখানে নানারকম, অথচ মথের মধ্যেই সমস্ত ছবির অনুষঙ্গ এসেছে।

মন্তালের কবিতার বৈশিষ্ট্য চমৎকার ফুটে উঠেছে দুটি কবিতায়, যদিও এ দুটি কবিতা প্রথম যুগের, তবুও এই কবিতা দুটির মধ্যে তাঁর কবিপ্রতিভার সমস্ত গুণ ব্যক্ত। Dora Markus ও Eastbourne কবিতা দুটি বিশ্লেষণ করলেই মন্তালের কবিতার রূপ বুঝতে পারবো আমরা।

১. 'পোর্তের কর্সিনি'-তে কাঠের জেটি মধ্য সমুদ্রে উঠে গেছে ; সমুদ্রে কাঠের জেটি উঠে যাওয়ার মধ্যে প্রাণ ও জড়ের বিরোধিতা স্পষ্ট হচ্ছে। ২. 'তোমার হাতের দোলায় অপর তীরে অদৃশ্য তোমাদের প্রকৃত স্বদেশের দিকে ইঙ্গিত করছে' ; এই 'তুমি' নারী ও কাঙ্ক্ষিত আদর্শ ও সৌন্দর্য, এই

'তুমির কোনো স্পষ্ট রূপ নেই, অথচ এই 'তুমি' মস্তানের কবিতায় বারংবার বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে আসছে। এপারে কাঠের জেটি বা স্থূল রুক্ষ বাস্তব, অন্য-পারে আকাঙ্ক্ষার ভবিষ্যৎ, অথবা ভবিষ্যতের স্মৃতি। ৩. এর পরেই এপারে সমুদ্রতীর থেকে শহরের রাস্তায় এসেছেন কবি: 'দক্ষিণে শহরের নর্দমার খাল অনুসরণ করছেন, ঝুলে উজ্জ্বল, গতিহীন ঝর্না মজে যাচ্ছে, স্মৃতি নেই।' এই নর্দমা, ঝুল, গতিহীন ঝর্নার মজে যাওয়া ও স্মৃতিহীনতা একালের নিঃসাড় মানুষের পোড়ো জমির ইতিহাস বিবৃত করে। কিন্তু ঢেউ-এর ওঠা-পড়ার মতো ছবিগুলি আসছে, এমনি ভাবে একটি স্তবক শেষ হয়। ৪. এই ছবিগুলির পরেই ছবির সাহায্যেই একালের জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন এবং 'এখানে যেখানে পুরনো জীবন নম্র প্রাচ্যের উদ্বিগ্নতায় বিচিত্রিত'। নম্র প্রাচ্যের উদ্বিগ্নতার অর্থ স্পষ্ট নয়, কিন্তু অনুষঙ্গে অনুভব করতে পারি। এবং এই উদ্বিগ্নতার সঙ্গেই আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন জাগছে এবার একই সঙ্গে: 'তোমার শব্দগুলি রামধনুর মতো ঝলকে ওঠে, মুমূর্ষু সমুদ্র মাছের ওপর আঁশের মতো'। মরছি তবু রামধনুর রঙ যায়নি শেষ হয়ে। ৫. এর পরের স্তবকে 'তুমি'র স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, এই 'তুমি'র চঞ্চলতা কবিকে পাখির কথা স্মরণ করায়, 'এই পাখি ঝড়ের সন্ধ্যায় আলোকস্তম্ভে আঘাত খাচ্ছে। এই মাধুর্যই ঝড়, অনবরত ঘুরছে, কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এর থামা বিরল।' এই 'তুমি' কবির ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অশান্ত হৃদয়, মাধুর্যের মধ্যেই ঝড় থাকে, পাখির গতি আলোর স্তম্ভে আঘাত খায়। কবি বলেছেন, 'আমি জানি না তুমি কিভাবে ঔদাস্যের হ্রদে প্রতিহত করো, এই ঔদাস্যের হ্রদই হচ্ছে তোমার হৃদয়'; একালের এই বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসাড়তা এই হৃদয়েই ব্যক্ত। তার পরেই বলেছেন, 'হয়তো কোনো আনন্দ তোমাকে রক্ষা করে, এই আনন্দ কি লিপস্টিকে, নখপালিশে পাউডারপাফে।' এই কবিতা পড়ে বোঝা যায় না, স্বপ্ন বড়ো না বাস্তব উচ্চকিত, জটিলতায় দুই-ই এক সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয় অংশের স্তবকগুলিতেও এই রীতি অনুসৃত। তবে ধ্বংস ও ক্ষয়ই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে: 'আর্দ্র পর্বতে সন্ধ্যা ছড়িয়ে পড়েছে, মোটরের স্পন্দনের সঙ্গে রাজহংসীর চিৎকার নিয়ে আসছে সন্ধ্যা'। রাজহংসীর চিৎকারের সঙ্গে সন্ধ্যা মিশে গিয়ে মোটরের সঙ্গে জড়িয়ে নারী বেশ্যাতে পরিণত হয়েছে, তার সৌন্দর্য ও প্রেম চিৎকার করছে। 'তুষার শুভ্র চীনে মাটির অভ্যন্তর কালিমালিপ্ত দর্পণের কথা বলে,' হৃদয় ও কালো দর্পণ এখানে এক। 'শীতল ভুলের কাহিনী এখানে,' অর্থাৎ

ভুলটা পরিকল্পিত, এবং এই জীবনকে কেউ কেউ শুষে নিতে পারে না। 'এখানে চির সবুজ সরেল রান্নাঘরের জন্য বেঁচে থাকে, কিন্তু এর কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয় না'। হিংস্র বিশ্বাস বিষ পরিস্রুত করছে। কবির কাছ থেকে কি চায় এই যুগ? কণ্ঠস্বর কিংবদন্তী অথবা নিয়তি আত্মসমর্পণ করে না। যদি করে তাহলে তার দেরি আছে অনেক।

Eastbourne কবিতার প্রথম বাক্যটিই একটি স্তবক। এবং এই বাক্যটি একসঙ্গে অনেক উপাদান ধরে আছে, আর এই উপাদানগুলি একটা থেকে অন্যটায় নিয়ত যাচ্ছে স্রোতের মতো। এখানে বের্গসঁর রীতি অনুসৃত হয়েছে সন্দেহ নেই, বস্তুর বিবর্তনধর্মী প্যাটার্ন কবি দেখেছেন ও তাকে প্রকাশ করছেন, বিবর্তনধর্মী হলেই তা ক্রমশ হয়ে ওঠে, এই হয়ে-ওঠার মধ্যেই সামগ্রিকতা প্রকাশ পায়, কেননা খণ্ড মানেই মৃত্যু, কিন্তু এই সামগ্রিকতা দেখে প্রজ্ঞা বা ইনটুইশন, বুদ্ধি নয়। নিয়ত হয়ে-ওঠার মধ্যে যে সামগ্রিকতা তা হলো সৃষ্টিশীল শক্তি। এখানে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ একসঙ্গে জড়িত, স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বর্তমান ইম্‌প্রেশন মিশে যায়, সময় বিন্দুর মতো বিচ্ছিন্ন নয়, স্রোতের মতো অবিচ্ছিন্ন এখানে, এবং এখানেই স্বাধীনতা। আমরা যখন আমাদের ভেতরের অবিচ্ছিন্ন স্রোতকে অনুভবে লাভ করতে পারি, তখনই স্বাধীনতা আসে। বের্গসঁর সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে প্রতীকী ও হার্মেটিক কবিগোষ্ঠীর সাদৃশ্য অন্য দিক থেকেও। বের্গসঁ বলেন শিল্প হচ্ছে ব্যক্তিক, শ্রেণী বা সাধারণের স্থান এর মধ্যে নেই; ব্যক্তিক মানেই তার চৈতন্য, যে-চৈতন্য অবিচ্ছিন্ন স্রোতে প্রবহমান, প্রবহমান বলেই বস্তুর প্রত্যক্ষরূপ ও স্থূলতাকে ভাবতে হয় অণু পরমাণুর মতো, যা স্রোতে রূপান্তরিত হয় এবং স্রোতে রূপান্তরিত হলেই বিশুদ্ধ স্বভাবকে আমরা পাবো। বিশেষ করে মন্তালে শব্দের মধ্যে এই রীতি গ্রহণ করেছেন; শব্দের মধ্যে বাস্তব জগৎ আছে তার স্থূলতা নিয়ে, শব্দকে তিনি ভাঙেন, এবং শব্দের ভেতরে বিশুদ্ধ ধ্বনি ও মৌল অর্থকে উদ্ধার করেন প্রতীকের সাহায্যে। ঐ ধ্বনি স্রোতবান হয়ে ওঠে, বাস্তব শব্দ এই ভাবে ভেঙে অথবা নিষ্কাশিত হতে হতে শেষে নির্বস্তুক ধ্বনির মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়। নির্বস্তুকতাই বের্গসঁর আদর্শ, এই আদর্শের মধ্যেই আমরা রিয়্যালিটির সংস্পর্শে আসি। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন, ক্রোচের ধারণা মন্তালে নিজের দেশেই পেয়েছিলেন, কবিতা ক্রোচের কাছে লিরিক্যাল বা বিশুদ্ধ ইনটুয়শন; বিশুদ্ধ এই কারণে যে বুদ্ধি বা বাস্তব জগতের প্রত্যক্ষণের অপৃথকীভূত ঐক্য ও সম্ভাবনার

সরল চিত্রকল্পের ঐক্য হলো ইনট্যুইশন। এখানে প্রত্যক্ষণ বা পারসেপশন বর্জিত নয়, পারসেপ্‌শনের নিয়ত ঐক্যের সঙ্গে সম্ভাবনাময় চিত্রকল্পও আছে, অর্থাৎ নিয়ত ক্রিয়াশীল, এবং নিয়ত হয়ে ওঠা, দূরে সরে যাওয়া। এই ইনট্যুই-শনের সঙ্গে বের্গসঁর ইনট্যুইশনের সাদৃশ্যও আছে, বৈসাদৃশ্যও বর্তমান। তবু আমার মনে হয়, বের্গসঁর ধারণাই এঁদের কাব্যকৃতির মধ্যে ছাপ ফেলেছে বেশি, সেই সঙ্গে ফ্রয়েডের তিনটি মনের সম্পৃক্তলীলাও স্বীকার্য।

'ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন' পিতলের বাদ্যযন্ত্রীরা এই স্বর বাজালো প্যাভিলিঅন থেকে, প্যাভিলিঅন তৈরি হয়েছে উঁচু স্তূপের ওপর, উঁচু স্তূপ সমুদ্রের দিকে পথ খুলে দিয়েছে, যখন এই সমুদ্র উপকূলের বালিতে ঘোড়ার ক্ষুরের আর্দ্রতার চিহ্ন নষ্ট করবার জন্য জাগে। এখানে পারসেপশনের অবিচ্ছিন্ন ঐক্যই সব মিলে সম্ভাবনার ছবি গড়ে তুলছে। পিতলের বাদ্যযন্ত্র, প্যাভিলিঅন, উঁচু স্তূপ, সমুদ্র, ঘোড়ার ক্ষুর—সব ধরে আছে 'ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন'। দৃশ্যের এই অবিচ্ছিন্ন স্রোতেই নির্বস্তুক আদর্শ গড়ে উঠছে। এর পরেই এই দৃশ্যের বর্ণনা বিস্তৃত করেছেন: কনকনে বাতাস কবিকে আক্রমণ করছে, উজ্জ্বল জানালাতে আলোকিত করে এবং অভ্রের শাদায় শীর্ষচূড়া উজ্জ্বল হয়। ব্যাঙ্কের ছুটির দিনে ধীরে বয়ে-যাওয়া জীবনের দোলা আসছে। চাকার চেয়ারে পঙ্গু জরাগ্রস্তরা যাচ্ছে, সঙ্গে লম্বা কানওয়ালা কুকুর শিশু ও অন্ধ বৃদ্ধ। আগামীকাল হয়তো স্বপ্নের মতো মনে হবে। আর শুনতে পাচ্ছেন বদ্ধ কণ্ঠস্বর, রক্তের হারানো স্বর কবির কাছে সন্ধ্যায় ফিরে এসেছে। পাতার ভেতর থেকে উজ্জ্বল আলো চমকে উঠছে। হোটেলের দরজা ঘুরছে, আলো বেরিয়ে আসছে, আলোর পরই অন্ধকার, চারদিকে শূন্যতা, যে শক্তি মৃত ও সজীব, পাহাড় ও বৃক্ষকে এক করে, সেই শক্তিও নেই। সব কিছুই চলছে। ছুটির দিন বড় নিষ্ঠুর, বাদ্যযন্ত্রীরা বাজনা থামিয়েছে, প্রথম সন্ধ্যায় শুভ উন্মোচিত হয়। অশুভেরই জয় হয়, এর চাকা থামে না। আলোয় অন্ধকার—একথাই সত্য। ব্যাঙ্কের ছুটির দিনে তিক্ত টর্চ পড়ে থাকে।

এই আলোয় অন্ধকার, আলো ও অন্ধকার সব মিলে স্রোত এবং স্রোতের ছবি—এই হলো কবিতা। এই তিক্ত টর্চের মধ্যেও মন্তালে জীবনে উজ্জ্বল অচঞ্চল আলো দেখেছেন, এর স্রোতকে গভীরভাবে গ্রহণ করেছেন। **L'anguilla** কবিতায় তিরিশ পঙ্‌ক্তিতে একটি বাক্য গঠিত, বাইন মাছের গতির মতো এর স্রোত নিত্য পরিবর্তমান। ছন্দে ধ্বনিতে এই পরিবর্তন

ইঙ্গিতবহ। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সময়ের স্রোতও মিশে আছে। বের্গসঁর অনুসরণে সময় চেতনা ইতালীয় কবিতায় একটি প্রধান লক্ষণ। যদিও মন্তালের কবিতায় আশাবাদ খুব কম, অন্তত প্রথম দিকে, তবু একে অস্বীকার করা যায় না। বিরোধের মধ্যে ক্ষয় ও সৃষ্টি একসঙ্গে গ্রথিত। নিরবিচ্ছিন্ন শুভ বা অশুভের ভাবনা আজ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত; ক্ষীণ কম্পনের মধ্যেও অতল শীর্ষ কর্কট মকর অবিচ্ছিন্নভাবে নিহিত এবং একই সঙ্গে যুদ্ধও জড়িত, ফলে এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই ঐক্য ও সামগ্রিকতা সৃষ্টি হয়। উজ্জ্বল আলোয় হেঁটে যেতে যেতে বিষণ্ণ বিস্ময় অনুভব করতে হয়, তাতেই ধরা পড়ে জীবন ও সংগ্রাম; যেমন ধরা পড়ে, বাগানের উঁচু দেওয়ালের ওপরে বোতলের ভাঙা টুকরো। কিন্তু এ সবের মধ্যে দুর্বোধ্য রহস্যকে বুঝতে চান, স্পষ্টরূপ ছায়ার স্রোতে ভেসে যায় সংগীতের মতো; চির রোমান্টিকের মতোই বলেন: আমাকে সেই উদ্ভিদ দাও যা নিয়ে যায় সেখানে যেখানে সৌর গভীরতা জেগে ওঠে এবং জীবন আত্মার মতো মিলিয়ে যায়; আলোয় পাগল সূর্যমুখী ফুল আমাকে এনে দাও—

> Portami tu la pianta che conduce
> dove sorgono bionde trasparenze
> e vapora la vita quale essenza,
> portami il girasole impazzito di luce

এ যেমন জীবনের ক্ষেত্রে আশা করেছেন মন্তালে তেমনি শব্দের মধ্যেও এই আকাঙ্ক্ষা e vapora la vita quale essenza এবং এই আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের মধ্য দিয়ে যখন পেয়েছেন শেষ জীবনে তখন অন্য উপায়ে বলেছেন: বিদ্যুৎকে ধরবার কোনো ভাবনা নেই; কিন্তু যে আলো দেখেছে তার কাছ থেকে এই আলো যেন চুরি করে নেওয়া না হয়। (Non c'e' pensiero che imprigioni il fulmine ma chi ha veduto la luce non se ne priva) এই জ্ঞান বা উইসডমই মন্তালে শেষ জীবনে লাভ করেছেন।

ভালো কবিতায় গদ্যের দৃঢ়তা থাকে, কিন্তু গদ্যে তাকে আবার রূপান্তরিত করা যায় না, কারণ নিশ্বাসের নিশ্বাস নিয়ে এ তৈরি। মন্তালে ও উনগারেত্তির কবিতা এই জাতীয়। মন্তালের কবিতায় চিত্রকল্পের জাদু এমনভাবে আমাদের মুগ্ধ করে যে আমরা সরতে পারি না, 'পাহাড়ের ন্যাড়া চুড়োয় পতঙ্গের কাঁপানো শব্দ', 'পাম গাছের মধ্যে বেহালার ভীরু কাঁপন', 'জলের গান যখন লোহার

শিটের কাঁপনে বজ্র গড়িয়ে পড়ে জলের ফিনকি শুরু হয়', 'ছেঁড়া কাপড়ের মতো অন্ধকার ছিন্নভিন্ন' 'তারার আলোর ছাই' 'জীবনের শিথিল পশম ধরা পড়েছে কিছু তারে এবং সময় ও বৎসরের ফাঁসে বাঁধা পড়েছে,' 'আজ কি ডলফিনরা যুগলে তাদের সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে সঙ্গম করছে?' 'তোমার চোখের জ্বর বিদ্যুৎ থেকে পালিয়ে যাবো।' এমনিভাবে জীবন থেকেই জীবনের রহস্যে ঢুকতে চান, এই রহস্যের মধ্যে ঢুকতে গেলে চাই আত্মপরীক্ষা। তাই বৃহৎ সেতু কাঙ্ক্ষিতের কাছে নিয়ে যায় না, প্রেমিকের আদেশ পেলে নর্দমার সাঁতার কেটেই তার কাছে পৌছানো যায়। কিন্তু সময়তো বয়ে গেছে।

মন্তালে মারিনেত্তির বিপরীত কাব্যসাধনায় এগিয়েছেন বলে যান্ত্রিক শব্দের উপস্থিতি তাঁর কাব্যে খুব কম, যা চিরাচরিত, অথচ চৈতন্যে গাঢ় প্রোথিত, সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে,—সেই সব শব্দই বেশি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ভাষার ব্যবহারে তাকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে যান তিনি। সমুদ্র মন্তালের কাছে অতি বাস্তব, আবার এক প্রতীক। সমুদ্রের স্বরে তিনি মাতাল, কবির হৃদয়ের ক্ষুব্ধতা সমুদ্রের ইমপাল্‌স থেকেই এসেছে, কবির সত্তার গভীরে সমুদ্রের বিপজ্জনক আইন নিহিত, তারই মতো বিশাল বিচিত্র ও সংগঠিত হতে চান; যেমনি সমুদ্র তীরের আবর্জনা ধুয়ে ফেলে, তেমনিভাবে কবি নিজের ময়লা দূর করতে চান। সমুদ্রের রক্তের মধ্যে নিজের রক্তধারা মিশিয়েই জীবনকে পরিপূর্ণরূপে বাঁধতে চান তিনি। যদিও তাঁর কাব্যে এই সামুদ্রিক বিশালতা নেই, তবু সমুদ্রের গভীর ধ্বনির গূঢ় আদিম প্রাণতা কবিতায় সঞ্চারিত করেছেন, সমুদ্র এবং সমুদ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত উপাদানই তাঁর রচনার অনুষঙ্গ তৈরি করেছে। প্যাসের্র সঙ্গে এখানেই মিল।

পৃথকভাবে প্রথম পর্বে প্রেমের প্রসঙ্গ ও অস্তিত্ব মন্তালের কবিতায় খুব কম। এবং এখানেও নারীকে দেখেছেন গতিরূপে, নারীর চোখের স্নিগ্ধ বাদাম থেকে আলোর কাঁপন আসে, যারা নারীকে শৃগালের সঙ্গে, মাংসাশী জন্তুর সঙ্গে, ঝোপের বিশ্বাসঘাতক প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করে, মন্তালে বলেন, তাঁরা অন্ধ, নারীর সুন্দর পাখা, উজ্জ্বল ললাট তারা দেখতে পায় না। রক্তে ক্রুশে পবিত্র তেলে, আতুর আনন্দে, দুর্ভাগ্যে ও ধ্বংস ও মুক্তির প্রার্থনায় নারীর প্রেমকে তিনি খোদিত করেছেন, যারা নারীকে বেজি বা রমণী ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না, তাদের সঙ্গে কবির যোগ নেই, নারী তাঁর কাছে আবিষ্কার, যে সোনা তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেন, সেই সোনাই তখন নারীর দেহে

প্রোথিত করতে চান, তাঁর মধ্যে জলন্ত কয়লা ফুসে ওঠে যখন সিঁড়ি থেকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় নারী। এই 'তুমি' প্রেরণা ও প্রেমিকাই মাছের প্রতীক হয়ে গেছে Per album (অ্যালবামের জন্ম) কবিতায়। দিন হবার আগে থেকে তাকে ধরবার জন্তে বর্শি ফেলেছেন কর্দমাক্ত কুয়োয়, কিন্তু পাহাড় থেকে কোনো বাতাস তার চিহ্ন নিয়ে আসছে না ; তার ল্যাজের উজ্জল চমক দেখা যায় না। (বুদ্ধদেব বসু এই চিত্রকল্পটি হুবহু অনুসরণ করেছেন 'স্বাগত বিদায়' কাব্যগ্রন্থে 'মাছধরা' কবিতায়) কিন্তু আশা আছে কোনদিন তার দেখা মিলবেই। চেরি গাছের নীচে বসে আছেন, তাকে কী জীবন্ত ধরতে পারবেন তিনি। Arsenio কবিতায় প্রকৃতির অদ্ভুতরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, কুয়াশার ও সংগীতের মতো সামনে জমাট ছায়া আকাশ ও সমুদ্র ধরে রাখে, ছড়ানো ছিটানো নৌকো থেকে গ্যাসীয় আলো বেরয়, জলপায়ী মাটি থেকে ধোঁয়া উঠছে, তোমার কাছের সব কিছু মাটিতে গড়াগড়ি যায়, শিথিল চাঁদোয়া কাঁপছে, গাঢ় মর্মর ধ্বনি আস্তে বুলিয়ে যায় পৃথিবীর ওপর দিয়ে, চিঁ চিঁ শব্দ করে উঠছে, রাস্তায় কাগজের লণ্ঠন।' এ শুধু ছবির মালা, কোনো বক্তব্য বা কথা নেই, ছবির সঙ্গেই হৃদয়ানুভূতি মিশে আছে ; কিন্তু এই ছবিগুলি বাস্তবকে সংগীতের মতো উন্নীত করতে চাইছে।

এইখানেই ফরাশি প্রতীকী কবিতার জনক বোদ্‌লেয়ারের প্রকৃতি ও নারী ভাবনার সঙ্গে ইতালীয় হার্মেটিক কবিগোষ্ঠীর পার্থক্য সূচিত হয়। বোদ্‌লেয়ার বলেন নারী ও প্রকৃতি স্বভাবজ, সুতরাং চেতনাহীন, তাই পরিত্যাজ্য। ভালোবাসাকেও পাপবোধের দ্বারা সচেতন করে তুলতে হয়, তা না হলে সেই ভালোবাসা নির্বোধ। কিন্তু মন্তালে প্রকৃতি ও নারীর মধ্যেই সমস্ত কিছু সারাৎসার ও সমন্বয় দেখতে পেয়েছেন। তিনি উদ্ভিদ প্রার্থনা করেছেন সৌর গভীরতা ও নির্যাসের জন্তে। সমুদ্রের রক্তের মধ্যে নিজের রক্ত ঢুকিয়েই জীবনকে তিনি বাঁধতে চান, প্রকৃতির অদৃশ্য অনন্ত সত্তার তাৎপর্যে মন্তালে অভিভূত। বোদ্‌লেয়ারের এই প্রকৃতিভাবনার সঙ্গে র‍্যাঁবোর কোনো যোগ নেই। 'ইলুমিনাশিওঁ' কাব্যগ্রন্থে এই পৃথিবীর জড় প্রকৃতি দেবদূতের আবির্ভাবে ও স্পর্শে জলে ওঠে, আকাশ নক্ষত্রের ও অন্য কিছুর পুষ্পিত নম্রতা অন্ত তীরে নেমে আসে ঝুরির মতো, আমাদের মুখের কাছে ঘন হয়ে ওঠে, গভীর পুষ্পিত হয় এবং স্নিগ্ধ নীল হয়ে ওঠে।' যখন আবির্ভাব ঘটে এই দেবদূতের তখন বর্জনের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। উন্‌গারেত্তি যখন চম্বিত ও উপদ্রুত ফুলের মধ্যে

অপ্রকাশ্য শূন্যতার কথা বলেন, তখন উপস্থিত ফুলের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ এবং এই আকর্ষণের দৈবী আবির্ভাবে পৃথিবীর পুষ্পিত আনন্দের অসীমই ব্যক্ত। স্বভাবজ বলে প্রকৃতিকে পরিহার করবার কোনো বাসনা নেই। কোয়াসিমোদোর প্রেমের কবিতায় এই বোধই প্রকাশ পেয়েছে। দেকার্তের চৈতন্য ও প্রকৃতির যে দ্বৈধতা বোদলেয়ার ও সার্ত্রকে ভাবায় ও মজায়, দান্তের প্রেমরূপিণী নারীপ্রকৃতি সেখানে আমাদের দেশের তন্ত্রের শক্তির মতো সমস্ত কিছুকে সমন্বিত করে সত্তায় উর্ধ্বান্বিত করে। দান্তের অধিকার এখানেই এঁদের মধ্যে, কেননা প্রেমই সূর্য তারা নক্ষত্রকে চালিত করে।

মন্তালে একটি কাল্পনিক সাক্ষাৎকারে তাঁর কবিতার রূপকৌশল সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : 'সাংগীতিক প্রকাশের প্রয়োজন আমি পালন করি। আমার জানা অন্য কবিদের চেয়ে আমার শব্দগুলোকে যথার্থ করে তুলতে চাই। উপযুক্ত কি? কাচের ঘণ্টার নীচে আমি বাস করি মনে হয়, এবং তবু আমি অনুভব করি কোনো মৌলের কাছাকাছি আছি। একটা হালকা পর্দা, সামান্য একটা সুতো, শেষ কিছু (quid) থেকে আমাকে আলাদা করেছে। পরম প্রকাশ মানেই হলো পর্দা ছিঁড়ে ফেলা, সুতো ছিঁড়ে ফেলা : একটি বিস্ফোরণ, উপস্থাপনা হিসাবে জগতের ভ্রান্তির শেষের অন্যকিছু। কিন্তু এ হচ্ছে অপ্রাপণীয় লক্ষ্য।' সাংগীতিক প্রকাশ ও জগতের পর্দা ছিঁড়ে নির্বস্তুক আত্মায় উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা রোমান্টিক ও হেগেলীয় ভাবনারই প্রতিফলন। প্রতীকী কবিতার মৌল ধর্ম।

সংযোজন : এলিঅট ও মন্তালে

মন্তালে 'এলিঅট এবং আমরা' প্রবন্ধে বলেছেন : ফরাশি প্রতীকী কবিতা, ইতালীয় প্রভাব, স্মৃতি ও উদ্ধৃতি, মেটাফিজিকাল কবিতায় ঐতিহ্য, কথ্য ছন্দে তার স্বতন্ত্র সংগীত, চিত্রকল্পবাদীদের ছন্দ ভাবনা এলিঅটের কবিতায় মিশে আছে, তাঁর লিরিক বস্তুধর্মী এবং কোয়ার্টেটের মধ্যে চেম্বার মিউজিক রয়েছে। এলিঅটের মধ্যে আছে অভ্যন্তরীণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, এই শক্তি সমস্ত কিছুকে মূল কেন্দ্রে নিয়ে আসে। ভালেরির মতো এলিঅটও উন্নত য়ুরোপীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ইতালিকে নূতনভাবে সংযোগ স্থাপন করলেন, এঁরা দুজনই ক্লাসিক্যাল স্পিরিটকে ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু তবু এঁরা কেউই ক্লাসিক্যাল নন।

যদিও এলিঅট ও ভালেরি বিভিন্ন, এমনকি বিপরীতেও বলা যেতে পারে, যদিও তাঁরা দুজনেই ব্যক্তির অহং-এর বিভীষিকা ও এর নিঃসঙ্গতা থেকে যাত্রা শুরু করেছেন। যাত্রা শুরু করেছেন ভিন্ন মন্তব্যে পৌঁছুবেন বলে। একজন হেরাক্লিটাসের গতির স্রোতের মধ্যে তাঁর আদি অনড়তাকে গলিয়ে দিয়েছেন: আর একজন অবতারের রহস্যের অভিজ্ঞতায় মধ্য দিয়ে এই বস্তু পৃথিবীর পদার্থের অন্তরালে অপরিবর্তনীয় উপস্থিতিকে লাভ করেছেন। এঁরা শিল্পী, হঠাৎ কবি হয়ে ওঠেন নি। প্রকৃত মৌলিকতা উদ্ভট নয়, ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত।

এই সমস্ত ঋণ কি মন্তালে তাঁর কবিতার মধ্যেও অনুপ্রবেশ করিয়েছেন? মারিও প্রাৎস 'এলিঅট ও মন্তালে' প্রবন্ধে মন্তালের ওপর এলিঅটের প্রভাবের বিভিন্ন দিক দেখিয়েছেন: ১. The Waste Land ও Ossi di seppia এই দুয়েরই বর্ণনীয় বিষয় বন্ধ্যা ও নৈরাশ্যপূর্ণ জগতের চারিদিকে দুঃসহ শুষ্কতা, একবিন্দু জলের জন্যে পাহাড়ের প্রতিটি গোপন কোণে অন্বেষণ, বন্ধ্যা দৃশ্য দুয়েরই প্রতীক দুজনের কাছে। মন্তালের জন্মভূমি 'লিঙ্গ তেরে', রিভিয়েরাই বন্ধ্যা পটভূমি জাগিয়েছে: 'দুপুরে বিশ্রাম করা, আগুনে-পোড়া বাগানের দেয়ালের ছায়ায় দুপুর, বিবর্ণ ও মগ্ন, কণ্টক ও লাঠির মধ্যে কালো পাখির গান ও সাপের খশখশ শোনা · উজ্জ্বল দিনে হেঁটে বিষণ্ণ বিস্ময়ে জীবনে ও তার সংগ্রাম কেমন তা অনুভব করা, দেয়াল ধরে হেঁটে যাওয়া যে দেওয়ালের ওপরে তীক্ষ্ণ বোতলের খোঁচা খাড়া হয়ে আছে।' (এই বাক্যগুলিতে কোনো সমাপিকা ক্রিয়া নেই, অসমাপিকা ক্রিয়ার অনন্ত যন্ত্রণা প্রকাশ, বিরোধের মধ্যেই এর সার্থকতা) এলিঅটের বিস্তারতা মন্তালে নেই, মন্তালের জগৎ সংকীর্ণ, কাচের স্ফীতোদর দর্পণে প্রতিবিম্বিত, তবু বোতলের খোঁচা-লাগা খাড়া দেওয়ালের ওপর হেঁটে যাওয়ার সঙ্গে এলিঅটের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দৃশ্যভূমিতে কষ্টের যাত্রা তুলনা জাগাতে বাধ্য, এই দৃশ্য দান্তের নরকের গাম্ভীর্য ও মহনীয়তা আনে। ২. যদিও মন্তালে যৌবনকাল থেকেই দান্তের কাব্যের আস্বাদন করেছেন, তবু এলিঅটের কবিতা পড়ে 'অবজেকটিভ কোরিলেটিভে'র আদর্শ মন্তালে গ্রহণ করেছেন। মন্তালের মৌলিকতা অনস্বীকার্য, কিন্তু মন্তালের রীতি এলিঅটকে স্মরণ করায়। ৩. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গোপন নির্দেশ পাঠকের কাছে বিভ্রান্ত হলেও একটা অন্তরঙ্গ পরিবেশ ছড়িয়ে দেয় কবিতায়, স্বপ্নের মতো চিত্রকল্পে পাঠক অংশ নিতে বাধ্য হয়। এই স্বপ্ন যেন পাঠকেরই অতীতকে মনে পড়িয়ে দেয়, তবু সে অতীত সত্য নয়। কেননা অভিজ্ঞতার লিরিক সুর

কাব্যে এর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। মূল কবিতার মধ্যে বিদেশী ভাষার উদ্ধৃতি আলোকবর্ষী হয়ে ওঠে, মূলের ওপর টীকা আলো ফেলে, যদিও বাধা করে না,—এলিঅটের টেকনিকের এইসব চিহ্ন মন্তালে তাঁর দ্বিতীয় কাব্য Le occasioni (1939)-তে আরম্ভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে Ballata in una clinica কবিতায়ও এই রীতি অনুসৃত। Sotto la pioggia কবিতায় সেণ্ট তেরেসার শব্দগুচ্ছ Por amor de la fiebre, গ্রামোফোন রেকর্ডের সুর Adios muchachs এলিঅটের কবিতায় প্রভাঁসাল কবিতা বা দান্তে থেকে অথবা অস্ট্রেলিয়ার ব্যালাড থেকে উদ্ধৃতিকে স্মরণ করাতে বাধ্য করে। Costa san Giorgio কবিতায় মন্তালে টীকা দিয়েছেন এইভাবে Riguardo alla leggenda evocata efr. Eduardo Posada El Dorado etc. এলিঅটের পোড়ো জমির Frazer ও Miss Weston-এর প্রসঙ্গ এই সঙ্গে আসে। ৪. কবিতায় নিজেকে প্রকাশ নয়, ইমোশনকে বস্তুর মধ্যে রূপায়িত করতে হবে, এই রীতি মন্তালে গ্রহণ করেছেন। 'আমি' দিয়ে বলেন না তিনি, এমনভাবে পরোক্ষ উপায়ে নিজের অনুভূতির কথা বলেন, অনেক পাঠকের কাছে মনে হয় মন্তালের কোনো অনুভূতিই নেই। দৃশ্যের বর্ণনার প্রতীকে তাঁর হৃদয় ব্যক্ত হয়, মুহূর্তের চিরন্তনতার মধ্যে স্থির হয়ে যায়। ৫. এলিঅটের মতোই মন্তালের কবিতা কাব্য থেকে মুক্তি লাভ করতে চায়, তাই মন্তালের কবিতায় স্বচ্ছন্দ কঠিন স্পষ্ট গদ্যের দৃঢ় রূপ এসেছে। ৬. সমুদ্রমাছের হাড় (ossi di seppia) এই নামটির মধ্যেই এলিঅটের অনুষঙ্গ আসছে, পরিচ্ছন্ন শুষ্ক উজ্জ্বল বস্তু, কিন্তু বিচ্ছিন্ন, ঝড়ে সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছেছে (অর্থাৎ নিরাশ্রয় ও মাংসহীন প্রাণহীন শুষ্ক মানুষের প্রতীক) ৭. সংগীতের অনুপস্থিতি নয়, কিন্তু এ থেকে নূতন অর্থ বেরিয়ে আসে, চিৎকার ও কোলাহল ধ্বনিও এ থেকে বর্জিত হয় না, সংগীত বিচ্ছিন্ন পঙক্তিতে নয় সমগ্র কবিতার মধ্যেই কাজ করে। এই রীতিও মন্তালে অনুসৃত। ৮. এর ফলেই দুই কবির মধ্যে এইসব সাদৃশ্য এসেছে: ক্ষীণ স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য স্নিগ্ধতা, শুষ্কতায় বহু লিরিক শক্তি থেকে, দুঃখের জ্বালা থেকে কঠোর পরিশ্রমে পরিস্রুত হয়ে এই গুণগুলি এঁরা দুজনে আয়ত্ত করেছেন। এঁদের কবিতায় স্বাদগন্ধ লেওপার্দির চিত্রকল্পের সাহায্যেই ব্যক্ত করা যায়: সুবাসিত ঝাঁটা, পরিত্যক্ত স্থানে তৃপ্ত।

মন্তালে এলিঅটের A Song for Simeon (Solaria 1929) La

Figlia che Piange (Ciroli 1933) কবিতা অনুবাদ করেছেন। মারিও প্রাৎস মন্তালের Arsenio কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে এলিঅটকে দেন। এলিঅট ১৯২৮ জুন The Criterion VII, 4 সংখ্যায় প্রকাশ করেন। মন্তালেকে এরিয়্যাল কবিতা পড়তে দেন প্রাৎস, এই কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েই ওপরের দুটি কবিতা অনুবাদ করেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এলিঅটের চেতনা থেকে কি মন্তালে স্বাধীন কবিপ্রতিভায় উন্নীত হতে পারেন নি? তাঁর L'angullia কবিতা তাঁর স্বাতন্ত্র্যকেই চিহ্নিত করে।

বাইন

বাইন, ঠাণ্ডা সমুদ্রের কুহকিনী,
বাল্টিক সমুদ্র ছেড়ে এলো
আমাদের সমুদ্রে, মোহনা ও নদীতে আসবে বলে
ওপরে উঠছে ও ডুবে যাচ্ছে বন্যার আঘাতে,
এক শাখা থেকে অপর শাখায়, শিরায় শিরায়, সঙ্কুচিত হচ্ছে,
আরও ভেতরে, পাহাড়ের আরও গভীরে,
কাদার ভেতর থেকে শুদ্ধ হয়ে উঠছে,
যতোক্ষণ না একটা বাদাম গাছের থেকে আলোর বিক্ষেপ
মরা জলের কুয়োয় ঝলমল করে ওঠে,
গর্তে আপেনাইন শীর্ষ থেকে রোমানায়
এই ধারা নেমে যায়,
বাইন, চাবুক, টর্চ, পৃথিবীতে প্রেমের তীর
যা আমাদের শুকনো বা ক্ষয়িত পিরেনিস খাঁড়ি
উর্বরতা-স্বর্গে নিয়ে যায় ;
সেখানে সবুজ আত্মা জীবন খোঁজে
যেখানে জ্বলন্ত খরা নিঃসঙ্গতা শুধুই দংশন করে,
উল্লাস, সমস্ত শুরুর কথা বলে, যখন সমস্ত কিছু কার্বনে মণ্ডিত,
নিমজ্জিত লাঠি, ক্ষুদ্র রামধনু, তোমার চোখের পাতা দুটি স্থির যমজ ভগিনী যেন,
তোমার কাদায় নিমজ্জিত মানুষের সন্তানের মধ্যে
জ্বলে উঠতে দাও তুমি, তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো না তাকে
তোমার ভগিনী বলে ?

এজরা পাউণ্ডের সাহিত্যচিন্তা

Artists are the antenae of the race'. 'only emotion endures'

'A nation which neglects the perceptions of its artists declines. After while it ceases to act, and merely survives'

মাঝে মাঝে কালো ধোঁয়ায় দম আটকে আসে, মন মুষড়ে পড়ে, অবসাদে ভেঙে পড়তে হয়, দলীয়তার সঙ্গে কলঙ্কের বুদ্বুদ গায়ে এসে লাগে, কিন্তু তখুনি সাহিত্যের রথীদের সর্বজনীন সত্য চৈতন্যকে জাগিয়ে দেয়, এই কারণেই হয়তো বেঁচে আছি। কেননা দেশে কোনো পাণ্ডিত্য নেই, লেখক আছে অনেক, কিন্তু সাহিত্যিক বা কবি তেমন চোখে পড়ে না। জনপ্রিয়তার গণতান্ত্রিকতা সুলভ অন্ধকারের আর্দ্রকে এমন জড়িয়ে ধরেছে মনন সেখানে পাগলামি, বুদ্ধি সেখানে হতাশা ও মূঢ়তা। আমাদের মতো নিরাশ ব্যক্তিদের চোখের সামনে ভবভূতি সান্ত্বনা দেন, রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দিয়ে কাছে টেনে স্নেহ বর্ষণ করেন নীরব বেদনার মতো, পাউণ্ড্ চৈতন্যকে স্থির প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করে বিষণ্ণতা উড়িয়ে দিতে চান, এলিঅট ব্যঙ্গে গণতান্ত্রিকতাকে নস্যাৎ করেন। পাউণ্ড্ জোরের সঙ্গে বলেন ; 'যে কবি প্রকৃতই সৎ যার কবিতা মনকে আকৃষ্ট করতে পারে, সেই কবির বই পাঁচ শ কপির বেশি বিক্রি হতে পারে না।' এলিঅট একেই আর একটু টেনে নিয়ে গিয়ে বলেন : 'যদি কোনো কবি অতি সত্বর অধিক জনতা পায়, তাহলে অবস্থাটা বেশ সন্দেহজন হয়ে ওঠে, কারণ এটা আমাদের ভয় করতে শেখায় যে এই কবি নূতন কিছু করছে না, লোকেরা যাতে অভ্যস্ত সেই বস্তুকেই সে দিচ্ছে অর্থাৎ পুরনো যুগের কবিদের কাছ থেকে যা পেয়েছে এই কবি সেই বস্তুই দিচ্ছে।'

পাউণ্ডের ভাষায় এই 'মানস আকর্ষণই' সাহিত্যের উল্লেখ্য বিষয়, ভাষাছন্দে চিত্রকল্পে বস্তু ও বাস্তবতার সংহতিতে, জগৎজোড়া সেই সেন্সিবিলিটির প্রসারে, সংগীতের ধ্বনিতে, বিষয় ও বিষয়ীর একাত্মতায় নানাবিধ জ্ঞানের সমাহারে আমাদের বুদ্ধি ও অনুভূতির কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে ওঠে মুহূর্তে, এই কমপ্লেক্স থেকে যে রূপ আসবে তাই সাহিত্য, সেটিই চিত্রকল্প। চিত্রকল্প ও সাহিত্য

পাউণ্ডের কাছে সমার্থক, এই কারণেই তিনি অতি সহজে বলতে পারেন বৃহদাকার গ্রন্থের চেয়ে সমগ্র জীবনে একটি চিত্রকল্প রচনা ঢের জরুরি। এবং চিত্রকল্পের সংজ্ঞায় রাসেলের আণবিক অদ্বৈতবাদের আভাস মেলে, আমরা বস্তু দেখি না শুধু, বস্তুর প্রতিক্রিয়া আমাদের মনের ওপর কি প্রকার সেটিও এক সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। এখানেই আইনস্টাইনের বস্তুর স্বতন্ত্র কনসেপ্টের সঙ্গে দর্শনের ও সাহিত্যের ধারণার পার্থক্য সূচিত। চিত্রকল্পের ব্যাপারে ক্রোচের ইনট্যুইশন আভাসিত হয়।

এবং এই কমপ্লেক্সের জন্যেই কবিতা চিত্রকল্পে শুধু বর্ণনাত্মক হয়ে ওঠে না, সংকেতধর্মীও বটে। এই সঙ্কেত গণিতের নয়, সাহিত্যের অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ, চিত্রের বর্ণনা যখন সঙ্কেতে স্নান করে বিশুদ্ধ শরীরের পবিত্র লাবণ্যরূপ গ্রহণ করে তখনি এক অর্থের তাৎপর্য বহুদূরে প্রসারিত হয়। আমাদের মনের মধ্যে দু জাতীয় জাগতিক অভিজ্ঞতার সমাহার রয়েছে, অভিজ্ঞতার একটা অংশ আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের প্রচলিত রূপকে, বিশ্বাস ও অনুভূতিকে, তারপরে চৈতন্যকে টেনে বার করে, অর্থাৎ এ সকলের মধ্যে অভিজ্ঞতা অঙ্গাঙ্গী জড়িত; এই সম্মিলিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্য কিছু অভিজ্ঞতা একই সঙ্গে জড়িত। হোয়াইটহেডের ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সম্মিলিত অভিজ্ঞতা হলো সংকেত এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিজ্ঞতা হলো সংকেতের অর্থ। এই সংকেত থেকে অর্থের এবং অগ্রসরমানতার মধ্যেই মনের বিশেষ প্রবণতা নিহিত। এমনিভাবেই বস্তু সংকেতধর্মী বস্তু এবং বস্তু থেকে অর্থের তাৎপর্য মিলে একটা অনুষঙ্গের নির্দেশ বস্তু বা চিত্রকে বহুদূরে টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং চিত্রকল্প শুধু চিত্র নয়, এর সঙ্গে কল্পনা সংযোজিত হয়ে এক অনুভূতির অনুষঙ্গ বহুদূরে সঞ্চারিত, সাংশ্লেষণিক প্রক্রিয়ায় এর রূপ। সুতরাং চিত্রকল্পে বিসদৃশ বস্তুর মিলন ঘটে না, বিশ্বের সামগ্রিক বস্তু মনের ভেতরে ঐক্যলাভ করে অদ্বৈতরূপ পরিগ্রহ করে; কিন্তু শব্দের সাহায্যে ছবিই প্রধান হয়ে ওঠে, তার পেছনে সবুজ পাতার মতো শব্দের ধ্বনি, সংগীতময় অর্থের ও বেদনার অনুষঙ্গ একে গাঢ়তর করে। পাউণ্ড এসব কথা খুব গাঢ়ভাবে বিশ্লেষণ করেন নি, ইঙ্গিতে উদ্ভাসিত করেছেন, কিন্তু তাঁর কবিতা যে যথার্থ অনুষঙ্গের ছবিতে ঋদ্ধ যে কোনো কবিতা বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে। এদিক থেকে তাঁর অনুবর্তীরা শুধু মাত্র ছবির রচয়িতা বলেই গণ্য। এই কারণেই চিত্রকল্প আন্দোলন স্থায়ী হতে পারলো না।

কিন্তু পাউণ্ড এবং এলিঅটের কাছে, চিত্রকল্প শুধু ছবি নয়, চিত্রকল্প একটি

স্বতন্ত্র জগৎ, যার কথা আমি আগেই বলেছি, যেহেতু চিত্রকল্প কবির কাছে একটি জগৎ এবং অভিজ্ঞতার সমাহার, সেই হেতু এই চিত্রকল্পের মধ্যেই কবিকে এবং তাঁর জগৎকে খুঁজে পাওয়া চাই, উপলব্ধি করা চাই কবির মূল্যবোধ, তাই সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নিজের ব্যক্তিত্বময় উপলব্ধির আভাস, সুতরাং ভাষা ও চিত্রকল্পের নিরিখেই কবির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবি যখন সমাজেরই ভাষা ব্যবহার করেন তখন তো সমাজই কথা বলে ওঠে তাঁর কবিতায়, কিন্তু কিভাবে তাকে নিয়ে নিজের কথা বলছেন সমালোচকের কাছে সেটিই বিচার্য, এবং এই কথা বলবার ঝোঁকই বোঝায় কতখানি তিনি সতেজ, উন্নত ও ঐতিহ্য রক্ষা করছেন, ভাষার উন্নতির মধ্য দিয়েই তিনি সমাজকেও নামাচ্ছেন বা ওঠাচ্ছেন। যেমন এই ভাষাই কবির ভাষাকে নামাচ্ছে ও ওঠাচ্ছে, তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে, সুতরাং ভাষার প্রশ্নেই সমাজের কাছে কবির দায়িত্ব রয়েছে যেহেতু ভাষা ও শব্দের মধ্যেই ছবিরও সংকেত থাকে, সেই হেতু ছবির মধ্য দিয়েই জগৎ উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। এই কারণেই পাউণ্ড্ ও এলিঅট কবিতায় সামাজিক দায়িত্ব মেনেছেন, ব্যক্তিত্বের আত্মকেন্দ্রিক শূন্যতার অন্ধকার এবং জনতার চিৎকারের শূন্যতা এই দুই অস্বীকার করে ভাষার ছবি।

ভাষা এবং ছবি বা চিত্রকল্প যখন যথার্থ হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতার স্বদৃষ্টির প্রেরণায় তখন সংগীতের টানে ও ছবির জাদুতে কবিতা মূর্খ ও সাধারণের কর্ষিত চিত্ত মানুষকে একই সঙ্গে আহ্বান করে, বুদ্ধি এবং অনুভূতির তারতম্যে কেউ ভেতরে চলে যান, কেউ বাইরে বসে ধ্বনির মদে পাগল হন। কিন্তু কবিকে সব সময়ই লক্ষ্য রাখতে হয়, সচেতন থাকতে হয়, বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের সচেতনতায় যে তিনি ভাষাকে তাঁর কালের স্থিত অবস্থা থেকে কতোদূর সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, যে কবি এই কার্য করতে অপারগ, তার কবিতা কালের বুদ্বুদ মাত্র।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি জরুরি প্রশ্ন ওঠে যা থেকে পাউণ্ড্ ও এলিঅট নিজেদের পৃথক করেছেন; উনবিংশ শতাব্দীর কবিতার মূল্যবোধের ভিন্নতা এখানেই, শেলি সমাজের প্রবক্তা হতে চেয়েছিলেন। এঁদের মতে কবিতা কোনো বক্তব্য বা আইডিয়া প্রকাশ করে না, কবিতা হয়ে ওঠে, প্রকৃতিতে গাছ যেমন হয়ে ওঠে মাটি থেকে শিকড়ে রস টেনে এবং সূর্য থেকে আলো পান করে, গাছের এই হয়ে ওঠার মধ্যেই জীবনের অর্থ ছড়িয়ে রয়েছে, ফল ও ফলের সম্ভার আকাশ ও মাটির মাঝখানে জীবনের পুষ্টি নিয়ে আসে। হয়ে ওঠার সঙ্গে

অর্থকে পাউণ্ড কখনো বাদ দেননি, মহৎ সাহিত্য যতোদূর সম্ভব অধিক পরিমাণে অর্থের দ্বারা বিদ্যুৎচালিত এবং পাউণ্ডই বলেন : 'শিল্প কাউকে কিছু করতে বলে না, অথবা কিছু ভাবতেও বলে না বা কিছু হতেও সে বলে না। গাছ যেমন হয়েছে শিল্পও তেমনি আছে, তুমি প্রশংসা করতে পারো, এর ছায়ায় বসতে পারো তুমি, তুমি কলা তুলে নিতে পারো জ্বালানি কাঠ কাটতে পারো, তেমনি যা ইচ্ছে তুমি তাই করতে পারো।' অর্থাৎ পাঠকের রুচি অনুযায়ী এমনি বিভিন্ন কর্ম আসতে পারে, কিন্তু কবির কাজ শিল্পকে গাছের মতো স্বনির্ভর ও প্রকৃতির বস্তু গড়ে তোলে।

এই কারণেই পাউণ্ড জোর দিয়েছেন কবির সৃষ্টিক্রিয়ার ওপর, জৈব রূপ-গঠনে। কিভাবে কবিতা হয়ে উঠছে সেই বিষয়ে তিনি বলেছেন : 'একটি মানুষের আন্তরিকতার পরীক্ষা হিসেবে টেকনিককে আমি বিশ্বাস করি।' তাই প্রত্যক্ষ ও যথার্থ বস্তুর যথাযথ ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন, সংগীতের ধ্বনিকে শব্দের সঙ্গে মিলিয়েছেন। ছন্দস্পন্দ অনুভূতির সঙ্গে যোগ রক্ষা করে, এই কারণেই ছন্দস্পন্দের মধ্যে অন্য কারো প্রভাব বা নকল নেই। সংগীতের সঙ্গে কবিতার যোগ বিচ্ছিন্ন হলে কাব্য মরে যায়। প্রতীক প্রাকৃতিক বস্তুর মতোই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে, তাহলে অর্থ ও কাব্যগুণ সাধারণ ব্যক্তির কাছেও সুস্পষ্ট হয়। এই টেকনিকই পারে ইম্‌পাল্‌সকে যথাযথ রূপ দিতে। তরল ও পাথরের মতো স্থির এই দুই বিষয়বস্তু। কোনো কবিতার ফর্ম গাছের রূপের মতো, কোনো কবিতার রূপ ফুলদানিতে ঢালা জলের মতো। অনেক বিষয় আছে যাকে যথাযথভাবে ফর্মের সংগতির মধ্যে রূপান্বিত করতে পারা যায়।

বিষয়বস্তু ও রূপকল্পনা একাত্ম এবং একাত্ম বলেই জীবনের প্রশ্ন ওঠে, কবিতা জীবনকেই প্রকাশ করে, বই থেকে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কবিতায় বেশি দিন টেকে না। কোনো ভালো কবিতা এইভাবে লেখা যায় না। কবিতায় জীবনের জন্যেই ইতিহাসের পথে যাত্রা করতে হয় সেই বস্তুর সন্ধানে, ইতিহাস থেকেই দীক্ষা ও শিক্ষা নিতে হয়, কবিতার ভালো যা হয়েছে তাকে আর নূতনভাবে করা যায় না, যা করণীয় সেই শিক্ষাই ইতিহাস দেয়। আধুনিক জীবনে যে বস্তুর অভাব আছে, ইতিহাসের পাতায় যদি তাকে দেখা যায়, তাহলে তাকে গ্রহণ করতে হবে। পাউণ্ড বলেন ডানিয়েল ও কাভালকান্তির শিল্পের যে সংঘাত ও যাথার্থ্য স্পষ্ট আছে ভিক্টোরীয় কবিদের রচনায় তা অনুপস্থিত।

উনবিংশ শতাব্দীর কবিতায় অনেক কিছু থাকলেও এদেরকে সেন্টিমেন্টাল আচাররীতিপরায়ণ ঝাপসা ও নোংরা মনে হয়। এই কারণেই বিশুদ্ধ শিল্পের প্রয়োজন।

এখানে এলিঅটকেই কাছে আনছেন পাউণ্ড্ তাঁর আলোচনায়, কাব্যের সঙ্গে ঐতিহ্যের যোগ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পাউণ্ড্ই বললেন, উনবিংশ শতাব্দীর কবিতার দোষের কথা, এলিঅটের পূর্বে স্পষ্টভাবে হিউমের ও পাউণ্ডের ঘোষণায় সোচ্চার। জীবন ও বিশুদ্ধ শিল্প পাউণ্ডের কাছে সমার্থক। এই কারণেই ইয়েট্সকে তিনি প্রশংসা করেছেন। জীবনের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, কবিতায় বুদ্ধি ও সমালোচনার চেয়ে অনুভূতিই চিরজীব।

পাউণ্ড্ই আধুনিক কবিতাকে বিশ্বের কবিতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন প্রথমে ; চসার সম্বন্ধে পাউণ্ডের আলোচনা বিপ্লবাত্মক : কারণ চসারের লেখায় সমগ্র য়ুরোপের সংস্কৃতি ধরা পড়েছে, এমন কি দান্তের চেয়েও বিপুল এদিক থেকে, শেক্সপিয়র য়ুরোপের সমগ্র সংস্কৃতিকে ইংলণ্ডের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করেছেন, শেক্সপিয়রের চেয়ে চসারের বাস্তবতাবোধও অতীব তীব্র, চসারের মধ্যেই নূতন জীবনবোধ ধরা পড়েছে ; ভিলোঁর মধ্যে মধ্যযুগীয় স্বপ্নের ও ঐতিহ্যের অবশেষ, আর্নট থেকে কাভালকান্তি পর্যন্ত জ্ঞানের সামগ্রিকতা সূক্ষ্মতা সুতীক্ষ্ণতা বহু শতাব্দী ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছিল, সেই প্রবাহ স্তব্ধ শেষ হয়ে গেল ভিলোঁর রচনায়। পাউণ্ড্ ইংরেজি সাহিত্যকে চার ভাগে এইভাবে ভাগ করেছেন, ইংল্যাণ্ড প্রথমে য়ুরোপের অংশ ছিল, চসার যখন কাব্য রচনা করেন। পরে ইংল্যাণ্ড শুধু ইংল্যাণ্ডেরই হয়ে ওঠে, সংকীর্ণ হয়ে ওঠে : পরে ইংল্যাণ্ড লেখকদের নির্বাসন দেয়, যেমন ল্যাণ্ডর ইতালিতে যেতে বাধ্য হন, জর্মানিতে বেড্ডোস, বায়রন কিট্স শেলি ইতালিতে নির্বাসিত, ব্রাউনিংও ইতালিতে যান। এই কারণেই পরে বাইরের চেতনা ইংরেজি সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য হয়। এই সূত্রেই বার্ন ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলি ইতালীয় কানৎসোন গ্রহণ করেন, সুইনবর্ন আনলেন গ্রীক সাহিত্য, ব্রাউনিং ইতালীয় বিষয়বস্তু, ফিটজারেল্ড পারস্য কাব্য সংগ্রহ করলেন, উইলিয়াম মরিস নর্থ সাগা, ফরাশি সাহিত্য। রসেটি ইতালীয় কবি মধ্যযুগীয় প্রির‍্যাফ্যালাইট গোষ্ঠী ও কিছু ফরাশি ফর্ম নিয়ে এলেন। কেল্টিক পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে প্রতীকী কবিতা মিশে একাকার হয়ে যায়। ঐ সব আলোচনা থেকে এই বোধ স্পষ্ট হয় যে পাউণ্ড্ আমেরিকা ও ইংরেজি সাহিত্যকে অখণ্ড য়ুরোপীয় সাহিত্য করে তুলতে

চেয়েছেন, অখণ্ড য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিই তাঁর কাম্য। আমার মনে হয় এদিক থেকে তিনি অনেক পরিমাণে সার্থক হয়েছেন, এলিঅটের পড়ো জমি সমগ্র য়ুরোপের বিপর্যয়কেই চিহ্নিত করেছে। এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ্‌রা এটি অখণ্ড য়ুরোপের চেহারাই দেখতে চান।

এই অখণ্ড সংস্কৃতি থেকে বিভিন্ন ভাষা স্বীকারের দাবি এসেছে পাউণ্ডের চিন্তায়, হিউমের অনুসরণে তিনিও জোর দিয়েছেন ক্লাসিক রচনারীতিতে, স্পষ্টতায়। এবং এই চিন্তাসূত্রেই তিনি বলেছেন গদ্যের মতো কবিতার ভাষা সাবলীল হবে, যেমন স্তাঁদাল ও ফ্লবেয়ারের গদ্য। ছন্দস্পন্দ ও মিলের একটা অর্থ রয়েছে কবিতায়, এতে কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে প্রত্যক্ষতা ও প্রকাশধর্মিতা; কারণ বিষয় ও প্রকাশ ক্রোচের মতোই এক, ফর্ম বা রূপকল্পনা অর্থেরই প্রকাশ। তবে এই প্রকাশকে চীনীয় ভাবলিপির সাহায্যে কবিতায় প্রকাশবাহী করে তুলতে হবে বলে পাউণ্ড্ নির্দেশ দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে চীনীয় ভাবলিপি পাউণ্ড্ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন, ফল অবশ্যই ভালো হয়নি, পাঠককে বিমূঢ় করা হয়েছে। কিন্তু ভাবলিপি উপমারই নামান্তর, যাতে অনুভূতিকে বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়, বিভিন্ন প্রত্যক্ষ বস্তু এই ভাবলিপির সাহায্যে ঐক্য লাভ করে, অভিজ্ঞতার বস্তুধর্মিতা দেখা দেয়। এলিঅটের 'অব্জেকটিভ কোরিলেটিভে'র উদ্‌ভাবনা এখান থেকেই। বিজ্ঞানের সঙ্গে এবং গণিতের সঙ্গে এই কারণেই পাউণ্ড্ আধুনিক কবিতায় সাযুজ্য খুঁজেছেন বেশি, কাব্যজীবনের প্রথমেই সংজ্ঞা দিয়েছেন: 'এক প্রকার অনুপ্রাণিত গণিতই হচ্ছে কবিতা, আমাদের সমীকরণ দেয়, বিমূর্ত রূপমূর্তি, ত্রিকোণ, বৃত্ত নয়; মানবিক অনুভূতির জন্যে সমীকরণ।'

এই অনুপ্রাণিত গণিত শব্দ মনে রাখলে আর একটি সমস্যাও আধুনিক কাব্যজগতে দূর হয়ে যায়। রোমান্টিক কবিবৃন্দ প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু কবিতার মর্মমূলে দিতে পারেন নি, কিন্তু আধুনিক কবিতা প্রত্যক্ষতা সুস্পষ্টতার যাথার্থ্যে গণিতের মতো, গণিতের বুদ্ধি ও পরিশ্রমকে অবশ্য স্বীকার্য বলে মনে করে, প্রেরণা রয়েছে, কিন্তু গৌণ; প্রেরণা ছাড়া কবিতা রচিত হতে পারেনা; কিন্তু প্রেরিত বেদনাকে মালার্মের মতো শব্দের ব্যায়ামে, গণিতের মতো বিশুদ্ধ করে তুলতে হবে। শুধুমাত্র প্রেরণার ওপর নির্ভরশীল হলে কবিতা বিনষ্ট হতে বাধ্য।

যদিও এই সমস্ত উক্তি হিউমের মধ্যে পাই; চিত্রকল্প প্রসঙ্গে তিনি বুদ্ধি ও

অনুভূতির কথা বলেছেন; বুদ্ধি বিশ্লেষণ করে, কিন্তু যখন সংশ্লেষণ হয় তখন দ্বন্দ্ব আলোড়িত হয়। কেন্দ্রীভূত বহু সংখ্যক বেদনার সমাহার বলেই কবিতা স্বজ্ঞাজাত, এবং চিত্রকল্প এই স্বজ্ঞাজাত ভাষারই সারাৎসার। আসলে রোমান্টিক ও ক্লাসিক এই দুই চেতনাকেই এক করে নিয়েছেন এঁরা, ঝোঁকটা পড়েছে ধ্রুপদী সাহিত্যের ওপর, যুগের বিপর্যয়ে।

ফ্লিন্ট্ ১৯০৯ সালে চিত্রকল্পবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল চলতি ইংরেজি কবিতাকে পরিহার, এই কারণে বিশুদ্ধ 'ভর্স লিবর' ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, এই ছন্দের সঙ্গেই জাপানি তঙ্কা হাইকু ছন্দ হিউমের 'শরৎ' কবিতার মতো। হিউমই ছিলেন এর নেতা, তিনি যথার্থ ও স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে পক্ষপাতী। 'আমরা ফরাশি প্রতীকী কবিতার দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত হয়েছিলুম।' তাই বোদ্‌লেয়ারের 'প্রতিষঙ্গ' কবিতার ইন্দ্রিয় রূপান্তর বস্তুর সাযুজ্যে এরা চিত্রকল্পে গ্রহণ করেছিলেন, নিয়েছিলেন মালার্মের শব্দের ব্যায়াম, লাফর্গের লাফানো উক্তি ও গদ্য ছন্দ, কথাভাষা, নির্দেশ, প্রাত্যহিকের আঘাত, আত্মপরিহাস ও বিকৃত ও তির্যক কৌতুক। করবিয়ের দীক্ষা দিয়েছিলেন রাস্তার লোকের অশিষ্ট সভ্যতা, বিদ্রূপ, আত্ম-করুণা ও বিদ্রূপের ভেতর আত্মবিলাপ, ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব নৈপুণ্য, সেই সঙ্গে হতাশ যুগের জ্বালায় ব্যক্তির একান্ত ব্যর্থতা। আর এসে মিশেছে নব্বুই-এর কবিগোষ্ঠীর ভাষার ও শব্দের নিবিড় ব্যঞ্জনা। অর্ধবিস্মৃত অর্ধজীবন্ত ভাষায় আদিম শব্দগুচ্ছের ভেতরে এই ব্যঞ্জনা, এই ব্যঞ্জনাকে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত করতে হবে। যখনই ভাষা এই আদিমতার স্পর্শ বহন করে, তখন স্বপ্ন ও সংগীতের সঙ্গে এর সংযোগ স্থাপিত হয়। হিউম্, পাউণ্ড ও এলিঅট তারই সঙ্গে মিলিত করেছেন রোমান্টিক কবিদের জীবনধর্মী বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্যাস। কিন্তু পাউণ্ড্ বিশেষ করে প্রভাবিত হয়েছেন রেমি দ্য গুর্মো-এর বিশ্ব ও সর্বজনীন বোধে।

পাঠকের তরফ থেকে পাউণ্ড্ যখন আলোচনা করেন তখন তাঁর সমালোচনার ধারার স্রোতমানতা বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত দেখতে পাই। কবিতায় যেমন পাউণ্ড্ আদর্শ গণতন্ত্র দেখতে চেয়েছেন, তেমনি আদর্শ পাঠকের মতোই তিনি সমালোচনা করতে চেয়েছেন। কবিতার আলোচনাই মুখ্য, কবির নয়; কবির আলোচনা শুরু করে নির্বোধ সমালোচক। চিত্রকল্পে যেমন বিভিন্ন বস্তুর সংযোগের ধারণা দ্রুত ধরা পড়ে তেমনি

সমালোচকও তাকে স্পষ্ট করে তোলেন। সমালোচক হিসেবে পাউণ্ডের আর একটি কৃতিত্ব শব্দকে সংগীত মন্ত্র ও অর্থে তিন শ্রেণীতে ভাগ করে এর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে চেয়েছেন। সমালোচক ও কবিকে বই পড়তেই হয়, বই পড়া মানে তার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা, সমস্ত বস্তুকে দ্রুত ধারণা করা, এই কারণেই বইই আশ্রয় ও মানসিক শয্যা। যে ব্যক্তি যে বিষয়ের ওপর সৃষ্টিশীল রচনা করেন নি, তার সে বিষয়ে কিছু বলা সমীচীন নয়। বাজে সমালোচকই প্রাচীনের মধ্যে নতুনকে স্থাপন করতে চায়, কিন্তু সৎ সমালোচক সাম্প্রতিক রচনার মধ্যে সামান্য অংশের উপযোগিতা উপলব্ধি করে খুশি হন, এবং সামান্য অংশের মধ্যে যদি চিহ্নিত করবার কোনো গুণ লক্ষ্য করেন, তাহলে অতীত রচনাকে নামিয়ে কি গুণে সাম্প্রতিক রচনা শ্রেষ্ঠ তার বিচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন সমালোচক। জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকলে মানুষ এইসব বস্তু বুঝতে পারে না। কোনো গভীর ও ভালো বই কোনো লোকই বুঝতে পারে না যদিনা সেই জীবনের অভিজ্ঞতা তার মধ্যে থাকে। কোনো কবিকে বুঝতে গেলে তার যুগের অনুভূতিও বুঝতে হবে। সামাজিক অবস্থার চেয়ে শিল্পী অনেক উর্ধ্বে থাকলেও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত তাকে জানতে হয়। জানতে হয় বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক আলোচনার সার্থকতা। হুইটম্যান সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা তীব্র ও বিসদৃশ। পাউণ্ড্ বলেছেন হুইট্ম্যানের ত্রুটি হলো তিনি কবিতায় কৃত্রিম, তবে তাঁর যুগের ইতিহাস যথেষ্টভাবে তাঁর মধ্যে রয়েছে ; এগুলি থাকা সত্বেও তাঁর কবিতা ভাষার জন্যেই অপাঙক্তেয়। কারণ, আইন ভাঙতে গিয়ে আকস্মিকভাবে তিনি আইন মেনেছেন, বিশৃংখলভাবে নিয়মিত মাত্রাবোধ এনেছেন, টুকরো টুকরো সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করেছেন, কথ্যভাষায় যেখানে আমরা বিশেষণ ব্যবহার করিনা সেখানে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। এগুলি থেকে মুক্ত হলেই তাঁর কবিতা যথার্থ হয়ে ওঠে, সমালোচকের কর্তব্য হচ্ছে ভালো রচনা থেকে খারাপ রচনা ও বাজে শব্দ বেছে নেওয়া, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা। পাউণ্ডের মতে ইংরেজি কবিতায় এই সব কবি বিপ্লব এনেছেন : চসার, ভিলোঁ, ডগ্লাস, গোল্ডিং, মার্লো, ওয়ালার, বাট্লার, ডোরসেট, রোস্টার, পোপ, ক্র্যাব, ল্যাণ্ডর, ব্রাউনিং ফিট্জারেল্ড, হুইটম্যান, গতিয়ের, করবিয়ের, র‍্যাঁবো ও লাফর্গ।

পাউণ্ডের আলোচনা রসাস্বাদন নয়, মন্তব্যে পূর্ণ এবং নিজের অভিজ্ঞতায় বিশিষ্ট ছন্দ-মিল-ধ্বনির আলোচনায় বিন্যস্ত। এলিঅটের চেয়ে পার্থক্য এইখানে

এলিঅট দান্তে ও বোদ্‌লেয়ারকে প্রধান কবি হিসেবে গণ্য করেছেন, কিন্তু পাউণ্ড্ করেন নি। পাউণ্ডের আলোচনার ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষকের মেজাজ পরিস্ফুট, কিন্তু এলিঅট শিল্পীর মতো তাঁর অনুভূত লব্ধ সত্যকে প্রকাশ করেছেন, যে সত্য তাঁর কবিতায় প্রকাশিত। হিউম্ ও পাউণ্ড বুদ্ধির পথ খুলে দিয়েছিলেন বলেই হৃদয়ের গভীরতায় এলিঅট তাকে স্বীকরণ করতে পেরেছিলেন। কেননা সমালোচনার বিষয়বস্তুতে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব কম। তিনি যে পাউণ্ড্‌কে শুধু টেকনিকের গুরু হিসেবে স্বীকার করছেন তা নয়, বরং সমগ্র সাহিত্যজীবনের গুরু, 'মবার্লি' ও 'কান্টোজ' না এলে কি 'পড়ো জমি' আসতো, তা বিচারের বিষয়।

পাউণ্ডের প্রবন্ধ সম্বন্ধে এলিঅটের মত হলো তাৎক্ষণিক মূল্যই পাউণ্ডের আলোচনার মূলকথা, কিন্তু কবিতা রচনা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা ভবিষ্যৎ আলোচনাকে সঞ্জীবিত করবে এবং বিশিষ্ট কোনো কবি নয় সমগ্র সাহিত্যই তাঁর আলোচিতব্য। কিন্তু তাৎক্ষণিক বক্তব্যের সঙ্গে চিরন্তনতা এসে মিলিত হয়েছে। খ্যাতির পুত্তলিকা ভেঙেছেন পাউণ্ড তাঁর সমালোচনায়।

পাউণ্ড্ সম্বন্ধে এলিঅট জোর দিয়ে বলেছেন যে শিক্ষকের দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন। নূতন প্রতিভাসম্পন্ন লেখককে খুঁজে বার করা তাঁর প্রতিভারই এক অবদান। তাঁর সাম্প্রতিক কালের লেখকদের ভালো লিখতে শিক্ষা দিয়েছেন। এই কারণেই পাউণ্ডের সমালোচনা শিল্পীদের উদ্দেশে নিবেদিত। বিশেষ করে যারা ইংরেজি ভাষায় লিখছে, এর মধ্যে অ্যামেরিকান শিল্পীদের প্রতিভার প্রতি বিশেষ ঝোঁক। সমস্ত সমালোচনাজাতীয় রচনার মধ্যে পাউণ্ডের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেটাই সব সাহিত্যকে সতেজ ও সঞ্জীবিত রাখতে হবে, আমাদের নিজেদের কালে প্রাচীন সাহিত্যকে নূতন করে গড়ে তুলতে হবে। এই সব গদ্য রচনা থেকে তাঁর নিজের কাব্যরচনাও প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। এলিঅট পাউণ্ডের ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন অনেকগুলি। প্রথমত, শুধু কবিতার শিল্পের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন, বিষয়ের ওপর নয়, কিন্তু তাতেও নাট্যকাব্য বাদ গেছে; তিনি যে সমস্ত কবিকে গ্রহণ করেছেন, আর যাঁদের বাদ দিয়েছেন, এঁদের মূল্যবোধ খুব প্রখর নয়।

১৯০৯-১০ সালে ইংরেজি সাহিত্যে পচনধরা জলের মতো স্থির হয়েছিল, হিউম ও পাউণ্ড্ তাকে বিশুদ্ধ পানীয়ে পরিণত করেন সমালোচনা ও রচনায়। পাউণ্ডের রচনায় হয়তো তাঁর কালের কিছু স্পর্শ লেগেছিল, ১৯১২—১৮ সালের

মধ্যে 'ঐতিহ্যবাদী' 'অতীয়' 'চিত্রকল্পবাদ' 'ভবিষ্যবাদ' 'ইম্প্রেশনধর্মিতা' এবং 'ভর্টিসিস্ট' কবিতা যে শুরু হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে নিশ্চিত কিছু যোগ ছিল। যে 'ভর্সলিবর্' নিয়ে চিত্রকল্পবাদের শুরু আঠারো সালেই পাউণ্ড তাকে নস্যাৎ করেন, এলিঅটকে সমর্থন করেন।

কবিতায় এলিঅটই অনেক উন্নত, জীবনের সমগ্র জটিলকে এক সঙ্গে ধরবার ও প্রকাশ করবার ক্ষমতা তাঁর অনেক বেশি। এদিক থেকে পাউণ্ডের কবিতা মুহূর্তের গীতিময় লিরিক মনে হয়, টেকনিকের নৈপুণ্যে বিশদ। আমার মনে হয় পাউণ্ডের কৃতিত্ব আলোচনায়, সমালোচনায় নানা জ্ঞানের সমাহারে, বিশ্বসংস্কৃতির ধারণায়, নতুন কবির পথকে উদ্ভাবিত করবার কাজে ; জীবনের যে অভিজ্ঞতা তিনি চেয়েছিলেন কাব্যে, তাঁর কাব্যে তা নেই, বই থেকেই নিয়েছেন, তবু 'কাণ্টোজ' মানবিক অভিজ্ঞতায়, নিসর্গপ্রীতিতে, বিচিত্র জটিল অনুষঙ্গে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির রূপায়নে অনেক সার্থক। আসলে তিনি যে ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশেছিলেন তার কারণ হয়তো তাঁর উগ্র নীতি ও আদর্শবাদের মধ্যে, তিনি সমগ্র য়ুরোপীয় সংস্কৃতিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে। এই শক্তি ব্যর্থ হয়েছে, তাই নিন্দিত, যেমন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু এই শক্তি যদি জয়ী হতো তবে এই আদর্শই চিরজীব হতো সন্দেহ নেই। আর বিশ্বের কোন শক্তি গোপনে আজ স্বৈরতান্ত্রিকতায় মুগ্ধ নয়, মুগ্ধ বলেই তো পাউণ্ডের মতো লোকেরা পাগল, কারণ আদর্শে বিভ্রান্ত। একালের শ্রেষ্ঠ কবি ইয়েট্সও স্বৈরতান্ত্রিক স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে অকুণ্ঠ স্তুতি জানিয়েছেন, আর এলিঅট তো 'রয়্যালিস্ট'। আমার নিজের বিশ্বাস পাউণ্ড্ নিজের দেশে থাকলেও বন্দী হতেন, কারণ তাঁর আদর্শ তাঁকে সত্য বলতে শিখেয়েছে, শিখিয়েছে বলেই সমগ্র জাতি ও মানুষের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। আমরা মুসোলিনি ও হিট্লারকে নিন্দা করতে গিয়ে অন্ধ বিপদে পড়েছি।

সমগ্র যুগটাতে হালকা অলো রচনায় ও মানসিকতায় পূর্ণ, এর থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন, তাঁর জীবন তাতেই সমর্পিত। জনপ্রিয় লেখার রহস্যও জানতেন।

বাংলা কাব্যে ও সাহিত্যে যদি তাঁর আদর্শ গ্রহণ করি তাহলে এই মুক্তি কিছুটা হয়তো-বা আসতে পারে। পাউণ্ড্ যেখানে কবি ও সমালোচক সেখানে বিশ্ব মানবিকতা তাঁর অন্তরে দীপ্তি এনে দিয়েছে, এই দীপ্তির আলোকে তাঁর

সাহিত্য উদ্ভাসিত। বাংলাদেশে তিরিশের কবিরা তখন পাউণ্ডের এই সব আদর্শ অনুসরণ করে বাংলা কবিতাকে বিশ্বের আধুনিকতার সঙ্গে একাসনে বসাবার চেষ্টা করেছিলেন ; তার পর থেকে এই ধারা বিচ্ছিন্ন, সংবাদপত্রের স্টান্টমূলক সাংবাদিকতার বিজ্ঞাপনী সাহিত্যের যুগ চলছে এখন। যতোদিন না সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, ততোদিন সেন্সেনাল সংবেদন সাহিত্য প্রভুত্ব করবেই। পাউণ্ডের 'মবার্লি' কবিতার একটি অংশ উদ্ধার করে এই আলোচনা শেষ করি :

১

তাঁর সমাধির নির্বাচনের জন্যে ই. পি. ওড.

তিনটি বছর সময়ের তাল অস্বীকার করে
কবিতার মৃত শিল্পকে সে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছিল,
প্রাচীনের অর্থে 'সমুন্নতি' চেতনা রাখতে চায় ধরে,
প্রথম থেকেই তার ভুল হয়েছিল।

না, এ ঠিক নয়, অর্ধ বর্বর একটি দেশে, দেখতে পেল,
সে জন্মেছে, সময়ের একান্ত বাইরে ;
দৃঢ়ভাবে ফল থেকে কোঁচকানো লিলির ওপর নত হয়েছিল,
ক্যাপেনিউস, মিথ্যে টোপ ফেলে চেয়েছিল রঙিন মাছকে সে ধরে

ইদ্‌মেন গার্ ত্তোয় পাস্থ্ এ'নি ত্রোইয়ে
সংবেদনশীল কানে ধরা পড়েছিল এই ধ্বনি নিরন্তর
পাহাড় দেখায় ক্ষুদ্র সুরক্ষিত পথে
বিচ্ছিন্ন সমুদ্র আটকে রেখেছিল তাকে এর জন্যে, সে বছর।
ফ্লবেয়ার ছিলেন প্রকৃত তার পেনেলোপে

চেয়ে চেয়ে দেখছিল কির্কের চুলের সুন্দর ঐশ্বর্য
মাছ ধরছিল সে নাছোড়বান্দা দ্বীপে
কেননা দেয় নি কোনো ইঙ্গিত সময়-সূর্য।
ঘটনা পরম্পরায় সে অবিচলিত,
মানুষের স্মৃতি থেকে নিজের আয়ুর তিরিশ বছরে
চলে গেছে, কিছুই করে না যুক্ত
কবিতা লক্ষ্মীর মুকুটে, সবই গেছে ঝরে।

পাউণ্ডের কবিতার বিচার

ইয়েট্‌স্ পাউণ্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত, ফর্মের ব্যর্থতা নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পাউণ্ডের রচনায় স্টাইল আছে, কিন্তু ফর্ম নেই। ফর্ম হবে সম্পূর্ণ একক, জ্যোতিষ্কের মতো উজ্জ্বল, এবং ফর্মের প্রসঙ্গেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। ফর্মে একটা গাণিতিক আকার থাকতে হবে, সিম্ফনি সম্পর্কযুক্ত হবে সুরে; যুক্তি ছাড়িয়ে একটা তাত্ত্বিক ধারণায় পৌঁছুতে হবে। বলা বহুল্য, ইয়েট্‌স্ এগুলির অভাব পাউণ্ডের রচনায় লক্ষ্য করেছেন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব; দেখেছেন সমস্ত রচনাই তাঁর কাছে বিমূর্ত, আরো দেখেছেন তাঁর রচনায় অর্থ দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। পাউণ্ডের রচনা একটা ইম্‌প্রেশন জাগায় মাত্র, এই ইম্‌প্রেশনে তাঁকে দুর্বোধ্য রচনার অনুবাদকরূপে প্রতিভাত করে, রচনায় উত্তাপের অভাব সূচনা করে কেবল।

ফর্মের ব্যাপারে মালার্মে থেকে ভালেরির ধারায় কবি হচ্ছেন ইয়েট্‌স্। সুতরাং আধুনিক যুগের কবিরা ইয়েট্‌স্ সম্বন্ধে কি ভাবেন আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার। পাউণ্ড্ আমেরিকাবাসী হলেও বিশ্বের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি।

পাউণ্ড্ও ইয়েট্‌সের পরবর্তী রচনা সম্বন্ধে নিজের মনে প্রশ্ন করেছেন, 'ইয়েট্‌স কি আরো বেশি কিছু করবেন, ইয়েট্‌স কি আন্দোলনে যুক্ত আছেন, এই জাতীয় লেখা তিনি কতোদিন চালিয়ে যাবেন?' কিন্তু তক্ষুনি পাউণ্ড্ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে ইয়েট্‌সের স্টাইল তাঁদের তত্ত্বের সঙ্গে মিলতে পারে না, কারণ মনের দিক থেকে তিনি ভিন্ন জাতীয়। তাই ইয়েট্‌সের প্রাণশক্তি নষ্ট হয়নি, তিনি কাব্যবীণায় নূতন সংগীত এনেছেন; করুণ শোকের গান ও তীব্র কান্না তাঁর লিরিকে সংগীত সৃষ্টি করেছে এবং কাঁচা আবেগকে তিনি দূর করেছেন; সুতরাং একই কবি দু'রকম হতে পারেন না। তবু আধুনিক কবিতায় নতুন সুরে বেজে ওঠে, এখানে তিনি সংকেতধর্মী হলেও ইমেজিস্ট গ্রুপের চিত্রকল্প গ্রহণ করেছেন, শব্দের ক্রমপরিবর্তন বা উল্টো-রীতিকে আবিষ্কার করেছেন, লিরিক লিখেছেন গদ্যের তীক্ষ্ণতায়। পরবর্তী-কালের লেখায় তাঁর রচনা কৃশতর হয়েছে, শক্ত দৃঢ় রেখা তৈরি হয়েছে, কিন্তু

তাই বলে তাঁর ভাষার চাতুর্য নষ্ট হয় নি। 'দ গ্রে রক' প্রভৃতি কবিতায় দুর্বোধ্যতা থাকলেও তাঁর রচনায় কৌতূহলজনক মহত্ত্বই তাঁর রচনার প্রাণ। পাউণ্ডের মতে শিল্পকর্মের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে চিত্র ও ধ্বনির মহান প্রাচুর্যে মনকে পূর্ণ করা। একই পরিবেশে ও মিলনে মনের জীবন দান করা। বলা বাহুল্য, এই দুটি ইয়েট্‌সের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কবিতায় রয়েছে।

এলিঅটও ইয়েট্‌সের পরবর্তীকালের লেখায় প্রাজ্ঞবিজ্ঞতা লক্ষ্য করেছেন। এই বিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে পূর্ব জীবনের তীব্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, বাণীই এই অভিজ্ঞতায় কাজ করেছে। নিপুণ রূপনির্মিতি এবং তীব্র অনুভূতিজনিত কবিত্বশক্তি দিয়েই তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি করে তুলেছে। প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সাধারণ সত্যে রূপান্তরিত করেছেন। সুতরাং এলিঅটের ভাষায় ইয়েট্‌সের লিরিক কবিতার মধ্যে শিল্পের এই নৈর্ব্যক্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য ছাড়া এলিঅট ও পাউণ্ডের বক্তব্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

সুতরাং এই সত্য প্রমাণিত হয়, ইয়েট্‌স ভিন্ন পথের পথিক বলেই পাউণ্ডের কর্মের নিন্দা করেছেন। কিন্তু পাউণ্ড. অন্য পথ অবলম্বন করলেও ইয়েট্‌সের প্রাপ্য মূল্য দিয়েছেন। পাউণ্ড্ সম্বন্ধে এলিঅটের সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল মন্তব্য ও আলোচনাই পাউণ্ডের রচনাকে বুঝবার সহায়তা করে।

এলিঅট পাউণ্ডের কবিতার বিশেষ ভক্ত এবং ব্যক্তিগতভাবে 'পড়ো জমি'র মার্জনার ব্যাপারে ঋণী। পাউণ্ডের গদ্যপদ্যের যথার্থ মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছেন, সেই সঙ্গে ব্যক্তি হিসাবে পাউণ্ড্ কিভাবে, কবিতার জন্যে নিজের জীবন সমর্পণ করেছিলেন, তরুণ কবিদের কাব্যরচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিলেন, কবিদের রচনা প্রকাশের সাহায্য করেছিলেন নিখুঁত বর্ণনা ১৯৪৬ সালে 'পয়েট্রি' পত্রিকায় 'এজরা পাউণ্ড্' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃত ও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এই প্রবন্ধেই বলেছেন কবিতাকে বুঝতে গেলে বিশেষ অবস্থা ও যুগকে বুঝতে হবে। মূলত এই সূত্র ধরলেই বোঝা যাবে ইয়েট্‌স কেন পাউণ্ডের কবিতার মধ্যে প্রচুর ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন। কারণ পাউণ্ডের কাল ও পরিবেশকে তিনি ধরেন নি, শুধু কবিতাকে গণ্য করেছেন এবং এই গণ্য করবার পেছনে শুধু নিজের সাহিত্যতত্ত্বই প্রয়োগ করেছেন, অন্যের কাব্যরচনার জন্যে নূতন বিচারপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন নি।

এই প্রবন্ধে পাউণ্ডের কৃতিত্ব আলোচনা করতে গিয়ে এলিঅট বলেছেন :

কবিতাকে শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর দৃঢ় প্রয়োগ গভীর অনুশীলনের বিষয় ছিল। কবিতার শিল্পরূপ প্রতিষ্ঠাতেই তাঁর মৌলিকত্ব নির্ভর করে, তাঁরই চেষ্টায় কবিতা যে উচ্চতম সচেতন শিল্প এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কবিকে শুধু তার নিজের ভাষা ও সাহিত্যই জানলে হবে না, অপর দেশের ভাষা ও সাহিত্য জানতে হবে, তা না হলে মনের দিক থেকে কবি দরিদ্র হয়ে পড়বেন। অপর ভাষার চেয়ে নিজের ভাষা সম্বন্ধে অধিক সচেতন হবেন, অনুভবে সজাগ থাকবেন, তার ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ ও ভাষার ইতিহাসে অধিক অবহিত হয়ে উঠবেন। কিন্তু তবু অপর দেশের ভাষা কবিকে জানতে হবে, অন্য দেশের ভাষার সাহায্যে ও সুযোগে নিজের দেশের ভাষাকে আরো ভালোভাবে জানা যায়। তৃতীয়ত, পাউণ্ডের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ও অবমূল্যায়ন করা হয়েছে, কারণ পণ্ডিতেরা কাব্য বোঝে না, কবিরা পাণ্ডিত্য খোঁজে। চতুর্থত, কবিদের কাছে তাঁর বিশেষ অবদান হচ্ছে তিনি জোর করে এই মত প্রচার করেছেন যে কবিদের সচেতন পরিশ্রমের পরিমাণের ও বিশালতার ওপর জোর দিতে হবে। কবিদের দীক্ষিত করতে হবে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের কবিতায়, শব্দমাত্রা-ছন্দ ও ভালো গদ্যের ফর্ম অনুশীলন করতে হবে। পঞ্চমত, পাউণ্ডের কবিতা আধুনিক যুগ থেকে ব্রাউনিঙ ও সুইনবর্নের মধ্যে ব্যবধানকে দূর করে যোগসূত্রে বেঁধেছে। কবিতাশিল্পের প্রতি পাউণ্ডের এই অসীম আকূতি ভালেরির সঙ্গে ও কিছু পরিমাণে ইয়েটসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

সুতরাং এলিঅটের মতে কবিতার শিল্পরূপ ধ্যানে পাউণ্ড ফর্মের প্রতি জোর দিয়েছেন এবং ফর্মই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তবু এলিঅট এই প্রবন্ধে পাউণ্ডের কবিতার কয়েকটি ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন। কাণ্টোজের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সঞ্চরমানতার অভাব রয়েছে, কিছু কিছু অংশে মারাত্মক অস্পষ্ট, ইয়াঙ্কি উপভাষার প্রয়োগ কিছু পঙক্তির মধ্যে বিরক্তিকর, কখনো কখনো বিশেষ শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখার প্রবণতা পাঠককে বিরক্ত করে। কিন্তু পাউণ্ডের রূপনির্মাণের ক্ষমতা প্রচণ্ড।

এর বহুদিন আগে পাউণ্ডের নির্বাচিত কবিতার ভূমিকায় ১৯২৮ সালে এলিঅট পাউণ্ডের কবিকৃতির সার্থক আলোচনা করেছেন, বলেছেন: যে ব্যক্তি কিছু বলতে চান, তাঁর কাছে কোনো কাব্যই মুক্ত নয়। লাফর্গের মুক্তছন্দ শেক্সপিয়র ওয়েবস্টার ও টুর্নিয়ের মতো মুক্তছন্দ। তিনি এলিজা-বেথীয় ও জ্যাকবীয় কবিতার মতো অমিতছন্দকে বিস্তৃত করেছেন, সঙ্কুচিত

করেছেন এবং বিকৃত করেছেন। পাউণ্ডের প্রথম যুগের কবিতায় ইয়েট্স ও ব্রাউনিঙের প্রভাব রয়েছে। ১৮৯০-এর কবিতার প্রভাব ও তারও পেছনে উইলিয়াম ও মরিসের প্রভাব বিগুমান। এই সমস্ত কবিদের কাছ থেকে কাব্যকে কথ্যভাষার মতো করতে শিখেছেন এবং প্রাচীনদের কাছ থেকে কাব্যকে সংগীতের মতো ব্যবহার করতে শিখেছেন। টেকনিকের বিচারে কবিদের সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, যাঁরা টেকনিককে উন্নতি ও বিকাশের ধারায় নিয়ে যান, দ্বিতীয়ত, যাঁরা টেকনিককে অনুকরণ করেন, তৃতীয়ত যাঁরা টেকনিক আবিষ্কার করেন। যে কবিতা একান্তভাবে মৌলিক, তা একান্তভাবে খারাপ, খারাপ মানে ব্যক্তিগত ব্যাপার, বহির্জগতের সঙ্গে কোনো যোগ নেই ; বহির্জগৎই প্রকৃত আবেদন জাগাতে পারে। প্রকৃত মৌলিকত্ব হচ্ছে বিকাশ, এই বিকাশ যদি প্রকৃত সত্য হয়, তাহলে মৌলিকত্বকে বর্জন করা যেতে পারে। পাউণ্ডের কবিত্বের মৌলিকত্ব প্রকৃত ও আন্তরিক, কারণ তাঁর কাব্যে পূর্বসূরি ইংরেজ কবিদের কাব্যের যুক্তিসিদ্ধ বিকাশ রয়েছে : গৌণ ও মৌলিক কবির পার্থক্যও ঠিক যথার্থ নয় এখানে এই কারণে যে গৌণ কবিরা সাহিত্যকেই একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করেন, আর মৌলিক কবিরা জীবন থেকে উপাদান গ্রহণ করেন। গৌণ কবিদের ত্রুটি হচ্ছে এঁরা সাহিত্যকে জীবন বলে গণ্য করেন। কেউ আধুনিক নতুন শব্দ ব্যবহার করেন না বলেই প্রাচীন, আর কেউ ফ্যাক্টরি বিস্কুট প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন বলেই আধুনিক, একথাও সত্য নয়। পাউণ্ডের মৌলিক কৃতিত্ব এই প্রভাঁস ও ইতালীয় কবিতাকে তিনি পুনরায় আধুনিক কাব্যে সঞ্জীবিত করেছেন। প্রভাঁসের মাধ্যমে তিনি ইতালিকে দেখেছেন। আধুনিক জীবনের চেয়ে ইতালি ও প্রভাঁসকে নিয়ে যখন তিনি কাব্য রচনা করেন তখন তিনি আধুনিক হয়ে ওঠেন। আর্নট দানিয়েল কাভালকান্তি তাঁর কাছে আধুনিক ও জীবন্ত। কোনো কবির রচনায় রূপপ্রকাশের সার্থকতা ঘটেছে কি না এটাই লক্ষ্য করতে হবে। প্রথমে তিনি ইংরেজ কবি ও পরে প্রভাঁস ও ইতালীয় কবিদের দ্বারা টেকনিক ও বিষয়বস্তু উভয়ত প্রভাবিত হয়েছেন। এই সঙ্গেই আছে এ্যাংলো স্যাক্সন 'সি ফেয়ারার' কবিতার প্রভাব, পরে এসেছে চীনা কবিতার প্রভাব। এই চীনা কবিতাই তাঁর স্বকীয় মৌলিক 'ক্যান্টোজ' রচনার পথ প্রস্তুত করেছে, এই ভাবেই কাব্যভাষার স্টাইলের সাংশ্লেষণিক গঠনে পৌঁছেছেন, এমনি করেই আদান-প্রদান ঘটেছে। পাউণ্ডের মধ্যে দুটো উপাদান লক্ষ্য করা যায়, প্রথমদিকে

ইংরেজি প্রভাঁসাল ইতালীয় চীনীয় অ্যাংলো স্যাক্সন, অপরদিকে ব্যক্তিগত নিবিড় অনুভূতি। তবে সব সময় দ্বিতীয়টি দেখা যায় না।

'ক্যাথায়' চীনা কবিতা বর্তমান যুগে পাউণ্ড্ আবিষ্কার করেছেন। অনুবাদের মাধ্যমে খুলে গেছেন। পাউণ্ডের অনুবাদ স্পষ্ট, এই অনুবাদে চীনা কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ নিবিড়তা আমাদের ঘটে। এগুলি অনুবাদ কর্মের চেয়েও বিংশ-শতাব্দীর কবিতার অত্যাশ্চর্য নমুনা হিসাবে গণ্য হবে। প্রত্যেক যুগই তার নিজের জন্যে অনুবাদকর্ম করবে। পাউণ্ড্ চীনা কবিতাকে আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক ইংরেজি কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন পাউণ্ড্। পাউণ্ডের অনুবাদ অন্য দিকেও উল্লেখযোগ্য, কারণ পাউণ্ডের মৌলিক কবিতার বিকাশে এর মূল্য রয়েছে। তাঁর অনূদিত সমস্ত কবিতাই তাঁকে প্রভাবিত করেছে। এই কারণেই তাঁর মৌলিক কবিতা ও অনুবাদকে পৃথক করতে পারা যায় না।

কবিরা সব সময় প্রেরণায় লিখতে পারে না, তখন অনুবাদ ও পদ্যকর্মে নিজেদের নিয়োজিত রাখা দরকার, এবং চেষ্টা চালাতে হয়, এই ভাবেই পাউণ্ডের অনুবাদ ও এপিগ্রাম রচিত হয়েছে। এখানেই রোমান্টিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, একদিকে পাউণ্ড্ টেকনিকের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, নিরন্তরভাবে তাঁর মাধ্যমকে বিকাশ করেছেন সচেতন ও অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টায়, যে মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছে তাঁর কিছু বলার আছে তিনি তখন নিজের মতো তাকে ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত, মানব অভিজ্ঞতার সাধারণ বিকাশ হলো অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ও আত্মসাৎ। অভিজ্ঞতাকে খুঁজতে হয় না, আমাদের কর্মের মধ্য দিয়েই অভিজ্ঞতা উপস্থিত হয়। অভিজ্ঞতা বলতে পড়াশোনা ও চিন্তার ফলও বোঝায়, সমস্ত প্রকারের বিচিত্র উপাদান, পরিচয়-সংযোগ এবং প্যাশন ও অভিমান এ সবই অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই দুয়ের মিলনেই শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভব। তবে পাউণ্ডের রচনার মধ্যে বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করা যায়। কোনো রচনায় বিষয়বস্তুর চেয়ে প্রকাশই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে, কোনো রচনায় প্রকাশের চেয়ে বিষয়বস্তু উল্লেখযোগ্য, কোনো রচনায় এই দুটো মিলিত হয়েছে। কবিতা শিল্পে অভ্যস্ত লোক সকল শ্রেণীর কবিতাই উপভোগ করেন।

ক্যান্টোজের মধ্যেই পাউণ্ডের কর্ম ও অনুভূতির যথার্থ একাত্মতা ঘটেছে। এলিঅটের মতে 'হিউ সেলউইন মবার্লি' শ্রেষ্ঠ কবিতা। একদিকে এর ছন্দ অন্য কবিতার চেয়ে সুস্পষ্টরূপ নিয়েছে এবং বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে। এর

আপাত কর্কশতা সরলতা মর্বার্দির অন্ত্যমিল অনিবার্যভাবে বহু দিনের কঠোর সাধনার ইঙ্গিত দেয়। আন্টাকোর্টের নিপুণতা বিশ্লেষণ করতে না পারলে মর্বার্লি প্রশংসা করা যায় না। এক দিকে এই কবিতায় রয়েছে কাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য ও জটিলতা, তাঁর সেন্সিবিলিটির প্রমাণ, নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ ব্যক্তির নিবিড়তা, সেই সঙ্গে যুগের দলিল, এর মধ্যে ট্রাজেডি ও কমেডির মিলন অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। আর্নল্ডের জরাজীর্ণ ভাষায় একে জীবন-সমালোচনা বলা যেতে পারে।

সি. এম্. বাওরা এলিঅটের ওপর পাউণ্ডের প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন: দান্তে যেমন আর্নটকে প্রশংসা করেছেন লিরিক কবিতার মাধুর্যের বিরুদ্ধে টেকনিকের দক্ষতার সঙ্গে নির্দেশাত্মক ও বায়ুরুদ্ধ কবিতা রচনার জন্যে, এলিঅটও পাউণ্ডকে প্রশংসা করেছেন পাউণ্ডের নতুন সংক্ষিপ্ত লাফানো ও কর্কশরীতির জন্যে। আমেরিকা ও ইংরেজি কবিতায় এঁর একটা অদ্ভুত স্থান রয়েছে। ইয়েট্স এডিথ সিট্ওয়েল এলিঅট পাউণ্ড্‌কে উচ্চ স্থান দিয়েছেন, মনে করেছেন আধুনিক কালের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ। কিন্তু সাধারণ পাঠক এই উৎসাহের অংশীদার হতে পারে না। পাউণ্ডের মধ্যে অনিবার্যভাবে কিছু বিতৃষ্ণাজনক ব্যাপার রয়েছে। বিরাট জ্ঞানপ্রসঙ্গে তাঁর যে দাবি তাঁর নিজের শিল্পপ্রকাশে তা সমর্থিত হয় না। তাঁর কবিতায় যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তা রুচিসম্মত নয়। তাঁর কাব্যের গতি শ্রুতিকটু বলে মনে হয়। তাঁর রচনায় দাম্ভিক সপ্রতিভতার ঘৃণ্য আবহাওয়া প্রকট। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ পৈশাচিক ও ক্রুদ্ধ, যার জন্যে বিশ্বাসঘাতক বলে তিনি অভিহিত হয়েছেন। তাঁর রচনায় যে গুণই থাকুক না কেন তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। তিনি হচ্ছেন ইংরেজি ভাষার প্রথম কবি যিনি নাগরিক ও মার্জিত মানুষের অনুভূতি ও চিন্তাকে আধুনিক ভাষার ইডিয়মে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচনারীতির সমর্থনে ও উদাহরণে প্রাচীন সাহিত্যকে টেনেছেন, প্রভাঁস ও চীনা কবিতার ওপর জোর দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন ভিক্টোরীয় আদর্শ সাহিত্যকে বিপথে নিয়ে গেছে, পুরোনো শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গি বিশুদ্ধ করবার জন্যে তিনি নূতন পথ দেখিয়েছেন। একদিকে পাউণ্ডের কবিতায় আধুনিক মানুষের চেতনা প্রকাশ পাচ্ছে, অন্যদিকে উন্নতির সাহায্যে, বিসদৃশ বর্তমানের সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টিতে প্রাচীনের প্রতিধ্বনি পরিচিত করিয়ে দিতে চাইছেন। এটিই এলিঅটকে সাড়া

জাগিয়েছিল। সাহিত্য, জীবন, প্রাচীন শ্রেষ্ঠ রচনা ও বর্তমান জীবনের অবস্থার বৈপরীত্য ফোটাতে চেয়েছেন। 'ওয়েস্টল্যাণ্ডের' আধুনিক জীবনের ব্যর্থতা ও অসারতা ফোটাতে পাউণ্ডের এই রীতিই তিনি চেয়েছিলেন।

এলিঅট কাল ও ইতিহাস-জ্ঞানের ব্যাপকতায়, জয়েস ও পাউণ্ড চেতনার যাত্রায়, ইয়েট্স ব্যক্তিগত অনুভূতির সাহায্যে যুগের বিচ্ছিন্ন চেতনা-প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের আধুনিক জীবনের তীক্ষ্ণ সংবেদনা রূপায়নে সাহায্য করেছেন। এই কারণেই এঁরা আমাদের অবশ্য পাঠ্য।

উপরোক্ত বিভিন্ন মন্তব্য পাউণ্ডকে বুঝবার সহায়তা করবে। ইয়েট্স এলিঅটকে কবির চেয়ে ব্যঙ্গকুশলী ভেবেছিলেন। এই বিশ্লেষণ সম্ভবত পাউণ্ড সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এলিঅট 'মবার্লি' কবিতাকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন এই কারণে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তি পাথরখোদা রূপনির্মিতি এর (intaglo method) মধ্যে দেখেছেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর লণ্ডনের সংস্কৃতি ও সাহিত্য জীবনের চরম লাঞ্ছনা অবক্ষয় হতাশা গর্ব দম্ভ প্রকাশিত। সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে লণ্ডনের জীবনকে লক্ষ্য করেছেন তিনি এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে প্রকাশ করেছেন এখানে। এই আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন এলিঅটের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বসত্তায় রূপান্তরিত হয় নি, ফ্লবেয়ারের মতো নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত করছেন, নিজের কথাই বলছেন পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশের জন্যে। জয়েসের রীতির সঙ্গে এখানেই তাঁর মিল। জয়েসের মতোই কাণ্টোজে চেতনার মহাকাব্যিক যাত্রা। দুয়ের মিল প্রচণ্ড। বলা বাহুল্য, পাউণ্ডের বিষয়বস্তু এখানে সংকীর্ণ জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, শিক্ষিত মানুষের মানসিকতার ওপর তীব্র কশাঘাতই ব্যক্ত, এদিক থেকে এলিঅটের 'পড়ো জমি'র বিষয়বস্তু ব্যাপকতর ও অনুভূতিসমৃদ্ধ। শিল্পরূপে এলিঅটের 'পড়ো জমি' 'মবার্লি' থেকে অনেক উন্নত, বিস্তৃত ও গভীর। একজন মার্কিনী যুদ্ধোত্তর লণ্ডন সমাজকে কি ভাবে দেখেছেন, তার প্রমাণ হিসাবে 'মবার্লি' নিশ্চয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, হয়তো এই কারণেই লণ্ডনবাসী অনেকেই পাউণ্ডকে দেখতে পারেন না। আর পাউণ্ডের কবিতার সঙ্গর্মানতার অভাব যে রয়েছে, তাও অস্বীকার করতে পারা যায় না। কিন্তু 'আঁভোয়া' অংশের সংগীতধর্মী লিরিকপ্রাণতা প্রাচীন প্রভাঁসসংগীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'কাণ্টোজে' পাউণ্ডের সমুদ্রযাত্রীর মধ্যে ইউলিসিসের সঙ্গে সমস্ত কবিদের

স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, পাউণ্ডের সমুদ্রযাত্রীর চেতনায় ভেঙে পড়েছে সমস্ত আবিষ্কার। এই কারণেই এটি মিথ্ ও মহাকাব্যের নায়ক হলেও এই জগতের সঙ্গে যোগ রয়েছে তার। কল্পনা ও স্পষ্ট মূর্তি নিয়েই এই নায়ক। মৃত, জীবিত নরক ও স্বর্গের সমস্ত জগৎকে আবিষ্কার করেছে। সে নারী প্রেমিক, জীবনদাতার মূর্ত প্রতীক, তাই স্বদেশে ফিরেও এই জীবনদাতার রূপের শেষ হয় নি। যে সমস্ত কবি ও নায়কেরা সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণ করেছে, এই সমুদ্রযাত্রী ক্রমশ তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। এমনিভাবেই তার রূপান্তর ঘটেছে। এবং এইভাবেই প্রাচীন গ্রীকরোমান যুগ থেকে রেনেসাঁসের ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগে এসে পৌঁছেছে। প্রথম কাণ্টোর মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতির প্রশংসা যেমন রয়েছে, রয়েছে লাতিন ও রেনেসাঁসের ঐতিহ্যের তথ্য, তেমনি দ্বিতীয় কাণ্টোতে আছে কবি-ঐতিহ্য ব্রাউনিঙ, ত্রুবাদুর কবিতা ক্লাসিক কবিতা অ্যাংলো স্যাক্সন কবিতা, চীনা কবিতা। এম্‌নি করে সমস্ত বস্তু একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

এলিঅটের 'পড়ো জমি' ও আধুনিক কবিতা

অনুবাদে পাঠকের কোনো উপকার হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু অনুবাদকের যথেষ্ট উপকার হয়, কারণ সংশয় অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার গ্রন্থি খুলে যায়, পুরো কবিতার রহস্য হৃদয়ে নূতন বেদনা সঞ্চারিত করতে থাকে এবং তাকে অতিক্রম করবার প্রেরণা জোগায়, নূতন রূপকল্পের জন্ম নেয়। সংবেদনশীল কবির পক্ষে অনুবাদকার্য কখনো কখনো অনিবার্য।

এলিঅটের 'পড়ো জমি' অনুবাদ করবার পেছনে আমার মনে দুটো প্রবণতা সক্রিয় ছিল। প্রথমত 'পড়ো জমি'র বক্তব্যের অনুভূতিচিত্রের সর্বজনীনতা পঞ্চাশ বছরেও শেষ হয়নি; দ্বিতীয়ত, আধুনিক বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক রূপগঠনের উচ্ছৃংখলতা ও অসংযম আমাকে পীড়া দিচ্ছে। তা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যেই এই প্রচেষ্টা।

এলিঅটের কবিতার, বিশেষ করে, 'পড়ো জমি'র দুর্বোধ্যতা এলিঅট নিজেই সৃষ্টি করেছেন কবিতার শেষে বিভিন্ন নির্দেশের সূত্র ও উৎস ধরিয়ে দিয়ে। ফলে পাঠক ও পণ্ডিত সমালোচকমাত্রেই 'পড়ো জমি'র প্রতিটি পঙক্তির উৎস অন্বেষণে উৎসাহিত বোধ করেন। অথচ সৎ পাঠকমাত্রই জানেন শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিটি শব্দ ও ধ্বনিতে সামগ্রিকের ব্যঞ্জনা আনতে চেষ্টা করেন, সুতরাং মনোনিবেশ করা তাঁর পক্ষে অনিবার্য। এদিক থেকে পাউণ্ড-অনুকৃত নির্দেশাত্মক বাক্য এবং বিভিন্ন কবিতার খণ্ড অংশের উদ্ধৃতির প্রসঙ্গ জানলেই ব্যাপারটা চুকে যায়, এবং যেহেতু সকলে বিভিন্ন ভাষা নানা কারণে জানতে পারে না, সেইহেতু অর্থ দিলেই সুষ্ঠু সমাধান হতো। এবং এই দুর্বোধ্যতার ব্যাপারে এলিঅট সচেতন, উনিশ শ ছাপ্পান্ন সালে 'দি ফ্রন্টিয়ার্স অব ক্রিটিসিজম্' প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন যে এই দুর্বোধ্যতার জন্যে তিনি নিজেই দায়ী, সমালোচকদের তিনি প্রলুব্ধ করেছেন। প্রথমে তিনি উদ্ধৃতিগুলিই দিতে চেয়েছিলেন সমালোচকদের কুম্ভীলকবৃত্তিসম্পর্কিত অভিযোগখণ্ডনের জন্যে, কিন্তু ছাপার অক্ষরে কবিতা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় নোট দিয়ে তাকে বাড়িয়ে তোলেন। সেই থেকেই বাজে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটে, এই নোটগুলি উৎসসন্ধানীদের ভুল পথে চালিত করেছে, ট্যারট কার্ড ও হোলি গ্রেইলের

ব্যাখ্যায় মেতে উঠেছে, এই সব কারণেই তিনি অদ্বিতীয়। আর এ সত্য তো অতি প্রকট, তাঁর দেওয়া নোটগুলি 'পড়ো জমি' বুঝতে ও উপভোগ করতে সাহায্য করে না, বরং বিভ্রান্ত করে, না দেওয়া থাকলেই পাঠকের ভালো হতো। উদ্ধৃতিগুলি না জানলেও 'পড়ো জমি'র বিষয়বস্তু বুঝতে কষ্ট হয় না, সংগীতের বিভিন্ন রীতি ও বিপরীত-ধর্মিতা, উত্থানপতন পাঠককে সহজেই মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়। ইয়েট্‌সের কবিতায় নির্দেশ ও উদ্ধৃতি নেই, তাঁর জন্যে তাঁর কবিতা সরল নয়, উপলব্ধি ও উপভোগে আমাদের জাগ্রৎ চৈতন্য সক্রিয় থাকে, এবং আমরা আত্মার গভীরে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হই। বাইজানশিয়ামের কাদা ও রক্ত থেকে আগুন ও নাচের সংকেত জাদুর রঙে দুলতে থাকে। আসলে উনিশ শ বারো সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় দশকে মনস্তত্ত্বে ও নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের যে গভীর অবিষ্কার ঘটেছিল, তা থেকে এলিঅটের মনীষা মুক্ত ছিল না। মুক্ত ছিল না বলেই এই সব নির্দেশ ও উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন, এবং টীকা ও টিপ্পনী দিয়েছেন। চেতন-অবচেতন-অচেতন এবং যৌন ভাবনা যে ফ্রয়েড থেকে কতখানি তাঁকে প্রভাবিত করেছে 'পড়ো জমি'র যৌন অক্ষমতার সমগ্র মিথ্‌টা আলোচনা করলেই ধরা পড়ে। এই যৌন চেতনার সঙ্গে কাজ করেছে রাজনৈতিক হিংসা ও বিপ্লব। আমার নিজের বিশ্বাস, এলিঅট আধুনিক কবি হলেও তাঁর মনের গভীর কোণে প্রাচীন সংরক্ষণশীলের বেদনা তীব্রভাবে তাঁকে আলোড়িত করতো, গভীর নীতিবোধ পীড়া দিত, ফলে বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক যুগের সংস্পর্শে তাঁর সংবেদনশীল মন আঘাতে জর্জরিত হয়েছিল, মূল্যবোধগুলি হারিয়ে ফেলেছিল, যন্ত্রণা বড়ো তীব্র হয়ে উঠেছিল, এবং সেই যন্ত্রণার চিত্রিত কান্না ও ভয়ই সুরের বিভিন্নতায় পাঁচটি অংশে উত্থানপতনে প্রকাশ পেয়েছে।

বিশ শতকের বিশ্বের কবিতা সম্পর্কে যাঁরা সজাগ তাঁরা দেখেছেন এই শতকের দ্বিতীয় দশকের অনেকের কবিতায় এলিঅটের ফাঁপা মানুষ, অবাস্তব শহর, ভয়ের ভীষণতা, ক্লান্তি ও বিরক্তি, বন্ধ্যাত্ব নানা উপায়ে ধরা পড়েছে। এবং কাহিনী ও গল্পের বদলে, সময়ের কালানুক্রমিক পর্যায় বর্জন করে ইম্‌প্রেশনের মধ্য দিয়ে সংগীতরীতি গ্রহণের নজির প্রচুর। ফরাশি সাংকেতিক কবিতার পরিবর্তে নূতন বোধের কবিতার জন্ম সম্ভবত স্পেনে উনামুনোর কবিতায়, মৃত্যু ও বেঁচে থাকবার সমস্যার সম্মুখে বেদনার্ত অনিশ্চয়তার অবস্থা শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধর্মীয় বিশ্বাসে নিয়ে গেছে। সেখানে

ভগবান তাঁর কাছে মুক্তির নায়ক। উনামুনোর ছাত্র মাচাদোর কবিতারও বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজের শক্তি ফাঁপা ও বিপর্যস্ত রূপে ব্যক্ত হয়েছে, সমস্ত স্পেনের দৃশ্যকে 'পড়ো জমি'র মতো মনে হয়েছে তাঁর, কবিতার নায়ক কাফেতে বসে গতকালের জুয়াখেলা এবং ষাঁড়ের লড়াইয়ের কথা ভাবছে, আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখছে, এই বৃষ্টি হয়তো তাঁর জলপাই গাছকে বাঁচিয়ে তুলবে। দূর ভবিষ্যৎ জেনেও ভগবানে বিশ্বাস রেখেছেন, অহংকার ত্যাগেই মুক্তির পথ খুঁজেছেন। এদিকে ফরাশি দেশে লার্কা ও কবুবিয়ের নূতন প্রেরণা নিয়ে এলেন জীবন থেকে। এবং অ্যাপোলিন্যার-এর কবিতার দ্রুত গতি, বিভ্রান্তিকর নির্দেশ ও আকস্মিকতা চমকপ্রদ, স্থান ও কালের নির্দিষ্ট সীমা পেরিয়ে কিউবিস্ট ছবির মতো কবিতায় অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সমন্বিত চলচ্চিত্র দেখাতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর কাব্যের নায়কও এলিঅটের ফাঁপা মানুষের মতো এবং দর্জির দোকানের জামাপরা ডামি বিনষ্ট জীবনের প্রতীক। অ্যাপোলিন্যার-এর কবিতায় কোনো গল্প ও কাহিনী নেই, কোনো কিছু প্রকাশ করে তাকে আবার টেনে ধরেন সময়ের বৃত্তে। এবং কবিতায় আঘাত দেবার চেষ্টা করেন ইতালির কবি উন্‌গারেত্তি ফিউচারিস্ট কবিতার ধারা অনুসরণ করে। এবং উন্‌গারেত্তিই কবিতার ভাষাকে একেবারে পরম নির্যাসে নিয়ে আসেন সহজ সরলতায়। ইতালীয় আরেকজন কবি মন্তালের সঙ্গে এলিঅটের কবিতার মনোভাব ও বিষয়-বস্তুর সাদৃশ্য প্রচুর, এলিঅটের মতো তিনিও বলেন 'অন্ধকারে আলো' (luce-in-tenebra). তাঁর কাব্যের মোটিফ্‌কে তিনিও একত্র করেছেন ঘটনার বদলে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে। স্মৃতি ও তথ্য এক হয়ে যায়, একটার সঙ্গে আর একটা দুই বিরোধী সত্তা মিশে যায়, চিন্তা ও অনুভূতির সঙ্গে ছন্দস্পন্দ পাল্টে যায়, ধ্বনিসাম্য অনুপ্রাস প্রাচীন কবির উক্তি সহজে একাত্ম হয়ে যায়। তবে মন্তালে সাহিত্যদর্শনে ব্যক্তির সত্তা ও অনুভূতিকে স্বীকার করেছেন, আর এলিঅট ব্যক্তিকে বর্জন করে নৈর্ব্যক্তিকতা আনতে চান। এই সঙ্গেই সাদৃশ্য চোখে পড়ে জেমস্ জয়েসের সঙ্গে। বন্ধ্যা জমির ওপর ফিশার রাজার রোগগ্রস্ততা ও জাদুর সাহায্যে তার মুক্তির সঙ্গে য়ুলিসিসের যাত্রা এবং ঘরে ফিরে এসে নিজের পুত্রকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে একটা মিল আছে। বিচিত্র রচনারীতির ভেতর ঐক্য, প্রসঙ্গনির্দেশ, অতিবাস্তবতার সঙ্গে আধুনিকতা, মহাকাব্য, ট্রাজেডি, রোমান্স ও গীতিকবিতার একত্র সমাবেশ,

আধুনিক বৈদগ্ধ্য এসবের দিক থেকে যোগ দেখা যায়, আবার পার্থক্যও আছে রচনারীতিতে এবং বিষয়-বস্তুর পরিণামে। জয়েসের উপন্যাসে কাহিনী ও ঘটনা আছে, সমাধান আছে, পুত্রের সঙ্গে মিলনের মধ্যে মানবতার আদর্শ সিদ্ধান্তের মতো প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এলিঅটের কাব্যে কোনো ঘটনা ও কাহিনী নেই, সময় ও চরিত্র নেই, পরিণামী সিদ্ধান্ত নেই, বেদনার মুহূর্তের উত্থান-পতনের একপ্রকার সূক্ষ্ম গতি আছে, যে গতির মধ্যে সুরের ধারায় বৃষ্টির প্রত্যাশা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। ডি. এইচ. লরেন্সও বীর্যহীন প্রেমের ব্যর্থতা উপন্যাসে বন্ধ্যা জীবনের মিথের মতোই প্রকাশ করেছেন ফ্রয়েডকে অবলম্বন করে।

সুতরাং আইডিয়ার সংগীত প্রকাশে 'পড়ো জমি'তে এলিঅট যে কাব্যের রূপগঠন গ্রহণ করেছেন, তাতে তাঁর কৃতিত্ব অদ্বিতীয় নয়, কৃতিত্ব এইখানে তিনি আমাদের আত্মার গভীর স্তরে মানবজীবনের যৌন ক্রটিকে বীর্যহীন যৌনতায় ও ভয়ের ভীষণতায় গভীরভাবে এঁকে দিয়েছেন। অনেক সমালোচক দেখিয়েছেন টেনিসনের 'মড', টম্‌সনের 'সিটি অব্ ড্রেডফুল নাইট', মালার্মের 'অ্যাপ্রে মিদি ত্যুন্ ফন্', 'ভালেরি'র 'জ্যন্ পার্ক', 'পড়ো জমি'র আগেই রচিত হয়েছে। এইসব রচনাকার্য এলিঅটের অবিদিত ছিল না এবং স্পেন ইতালি ফরাশি দেশে এলিঅটের ভাবনাও ছড়িয়ে ছিল। আর টেক্‌নিককুশলী গুরু পাউণ্ড তো ছিলেনই তাঁর পাশে।

এলিঅটের রচনাপর্বকে দুটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে, প্রথম যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে 'পড়ো জমি'তে, দ্বিতীয় যুগের সমাপ্তি 'ফোর কোয়ার্টেট্‌সে'। প্রথম যুগের বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতার রূপময় চরমপ্রকাশ ঘটেছে 'পড়ো জমি' কাব্যে, দ্বিতীয় যুগের কাব্যের আত্মার গভীরতর বিশ্বাস ও আকৃতি স্ফটিকমূর্তি লাভ করেছে 'ফোর কোয়ার্টেট্‌সে'। দান্তে ও বোদ্‌লেয়ারের কাব্যের প্রতীক দুটি কাব্যে পৃথকভাবে দেখা যায়, আবার একই সঙ্গে দুই কাব্যেই দেখা যায়। দান্তেকে যেভাবে বুঝেছেন, ঠিক সেই ভাবেই এলিঅট ভাষাকে ক্লাসিক আদর্শে স্বীকার করে ভৃত্যের মতো ছন্দস্পন্দধ্বনিকে জাগিয়ে তুলেছেন। এবং বোদ্‌লেয়ারের নরক, আধুনিক নগর জীবনের রূপবর্ণনা, অবক্ষয়, দুঃখ, অনুভবের প্রচণ্ড শক্তির অতিলৌকিক ও অতিমানবিক চেতনা, খৃস্টান পাপ ও মুক্তিবোধ, আদর্শের সঙ্গে অভিজ্ঞতা, যুগচেতনার সঙ্গে চঞ্চলতা, বিশ্লেষণী অনুসন্ধিৎসা এগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ

করেছেন, এবং এগুলি তাঁর কাব্যের অনুভবে ও রূপগঠনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তবে দান্তের মধ্যে অনুভূতির স্তরের যে ব্যাপকতা দেখেছেন, বোদ্‌লেয়ারের মধ্যে তা দেখতে পান নি, অভিজ্ঞতা ও আদর্শ এক সঙ্গে মেলেনি বলে তাঁর বিশ্বাস, সে ক্ষেত্রে তিনি মনে করেন স্বর্গীয়বোধ ও নীতি-ভ্রষ্টতা দান্তের কাব্যে একত্র মিলেছে। এলিঅটের কাব্যে এগুলিই দেখা যায় বিভিন্নভাবে। প্যার্সের 'আনাবাস্' কাব্যের অনুবাদের ভূমিকায় তাঁর টেকনিকের দুর্বোধ্য উল্লম্ফনতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা তাঁর নিজের কাব্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। আধুনিক মনস্কতার যুগপৎ বিরোধিতা ও সমান্তরাল গতি এলিঅটের কাব্যের পঙক্তির শব্দে, স্তবকে ও বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশে নদীর ঢেউ-এর মতো ওঠানামা করছে। বিশ্বাসহীনতার টুকরো বেদনার মতো রূপগঠনেও খণ্ড খণ্ড রূপ প্রকাশ পেয়েছে, ভারসাম্য লক্ষিত হয় না, অথচ সংগীতের সিম্ফনির মতো একটা গভীর ঐক্য বিদ্যমান, আমাদের রাগ সংগীতের মতো আলাপে ও বিস্তারে দ্রুত বিলম্বিত তালে একটা সম্পূর্ণতা দান করছে। জন্ম ও পুনর্জন্ম থাকলেও স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষাই এই কাব্যের মূল কথা। যৌন উর্বরতার সঙ্গে মৃতের পুনরুজ্জীবন জড়িত। এবং 'পড়ো জমি'র কাব্যের প্রথম বাক্যটির মধ্যেই এই কাব্যের সমগ্র বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্য এবং এলিঅটের রচনা-রীতির মৌল স্বাতন্ত্র্য চমৎকার ফুটে উঠেছে। এপ্রিল নিষ্ঠুরতম মাস, কিন্তু এই নিষ্ঠুরতাই লাইলাকের জন্ম দিচ্ছে, জন্মাচ্ছে মরা জমিতে। লাইলাকের জন্মটা অভীপ্সা, ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা, যে আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অতীত স্মৃতি লুকিয়ে আছে, কিন্তু বর্তমানে যেটা রয়েছে সেটা অসাড় শিকড়, বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বসন্তের বৃষ্টির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। এমনিভাবে দুই বিরোধকে, কুৎসিত ও সুন্দরকে, অতীত স্মৃতির স্বপ্ন এবং বর্তমানের গ্লানিকে ভবিষ্যতের অভীপ্সায় মিশিয়ে দিয়েছেন। কাব্যের শেষে ইয়েরো-নিমোর প্রতিহিংসা যেমন একদিকে, অন্যদিকে কাব্য রচনায় মুক্তি দ্যোতিত। তাই বলছিলুম, দান্তের কাব্যের নরক থেকে স্বর্গ, বোদ্‌লেয়ারের কাব্যের পশুত্ব ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধকে এ যুগের মানসিকতায় একাত্ম করে নিয়েছেন। 'মৃতের কবর' এই নামকরণের মধ্যেও তাঁর প্রবণতা প্রকট। খৃস্টানদের মতে মৃত স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবার আগে কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়। এই মৃত বন্ধ্যা যুগ ও মানুষকে ঐশ্বরিক বজ্রের নির্দেশে তিনি মুক্ত করতে চেয়েছেন। এই দুই বিরোধী ধর্ম একই অংশের বিভিন্ন স্তবকে প্রকাশ পেয়েছে

এবং বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সহাবস্থানের মধ্যে বিরোধ ফুটে উঠেছে, নতুবা একই মানসিক অবস্থা বিভিন্ন অংশে চরমে পৌছে ভিন্নতর পথ নিয়েছে এবং নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে।

এই কাব্যের অগ্রগতি নেই কাহিনী ও ঘটনায়, সময় নেই, চরিত্র নেই, নায়ক নেই, বিশেষ স্থান নেই। টাইরেসিয়াস শুধুমাত্র দর্শক; একচক্ষু ব্যাবাসায়ী, কিশমিশবিক্রেতা ফিনিসীয় নাবিকে পরিণত, ফিনিসীয় নাবিক ফার্ডিনাণ্ডে একাত্ম হয়ে গেছে, ফলে মানুষ হারিয়ে গিয়ে মনুষ্য জাতি সমগ্রভাবে এসেছে, সমস্ত স্ত্রীলোক একটি স্ত্রীলোকে পরিণত হয়েছে, স্ত্রী ও পুরুষ আবার টাইরেসিয়াসের মধ্যে মিশে গেছে, লণ্ডন শহরের কথা থাকলেও এ শহর অবাস্তব এবং পরে লুপ্ত, কাল নিত্য কাল। তাই সর্বজনীন কাল স্থান ও মানব, ভয় ভীষণতা ক্লান্তি কদর্য গ্লানি থেকে মুক্ত হবার জন্যে বৃষ্টির প্রতীক্ষা করছে। এর অংশের বিভিন্ন স্তবকে কখনো চরিত্র, কখনো উদ্ধৃতি, কখনো নির্দেশ রূপকথার প্যারডি বা উল্লেখ যুক্ত হয়েছে। কারো উক্তির চেয়ে কণ্ঠস্বরই মুখরিত হয়ে উঠেছে, নায়কের চেয়ে দর্শকের ভূমিকা স্পষ্ট, এখানে টাইরেসিয়াসের মতো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সন্ধ্যাকালে ডিভানে টাইপিস্ট কেরানির উদাসীন সংগমের দৃশ্য দেখছে, কিন্তু কিছু করবার ক্ষমতা নেই, বাধা দেবার শক্তি নেই, এই অসহায়তা এই কাব্যের সর্বত্র, তাই প্রশ্ন উচ্চকিত। আর সাধারণভাবে অগ্রগতি না থাকলেও শাঁখের রেখার মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মানবিক অনুভূতির বেদনা অভিজ্ঞতা ক্রমান্বয়ে ওপরের দিকে উঠেছে। ক্লান্ত ভীত অর্থহীন জগৎ ক্রমান্বয়ে জলের ধারে মৃত্যুর পুনরুজ্জীবনের স্নিগ্ধতায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং দৈব বজ্রের ইঙ্গিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা আনছে, অথচ কাহিনী ঘটনা বক্তব্য একই আছে, 'মৃতের কবরে'র অতীত স্বপ্নস্মৃতি বর্তমানের 'দাবা খেলা'য় এসেছে, অতীত স্বপ্ন এবং বর্তমানের 'দাবা খেলা' 'অগ্নিসূক্তে'র টাইরেসিয়াসের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে, তাঁর চিত্তকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে, এবং এই দাহন থেকেই জলের ধারে অনির্বচনীয় শান্তির ইঙ্গিত, এবং অগ্নির বাষ্প থেকেই জল, জল থেকেই আবার বৃষ্টির সম্ভাবনাপূর্ণ বজ্রের গর্জন, এবং জীবনের শান্তির বাণী। এমনিভাবে ভাবের অগ্রগতি সূক্ষ্ম স্তরে এগিয়েছে। 'মৃতের কবর'কে বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন উত্থান-পতন ও বিরোধী ভাব চোখে পড়ে। এবং এই উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে ভয় ক্লান্তি শূন্যতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। অনুর্বর জমিই এই ভয় ও শূন্যতা

এবং তা থেকেই ধর্মীয় পুনরুত্থান। এই অনুর্বর জমির পরই একটি চরিত্র আসছে, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছি না, এ টাইরেসিয়াস হতে পারে, বা কল্পিত নায়কও হতে পারে। এই কণ্ঠস্বরের মধ্যেই অতীত স্মৃতির আনন্দবেদনা চিত্রিত। ম্যারির আহ্বানে সম্ভবত নিজেকে ধরা দিতে পারে নি, তাই ভয় ও অপূর্ণতা, তাই রক্ত পাহাড়, মৃত গাছ, স্তূপীকৃত ভাঙা চিত্রকল্প, ধুলোর ভেতরে ভয় জেগে থাকে। কিন্তু এই ভয়ের সঙ্গেই অতীত প্রেমের স্মৃতিবেদনা, নিষ্পাপ প্রেমের জন্যে নির্মল আকাঙ্ক্ষা, ভ্যাগ্‌নারের নাটকের গানে প্রকাশ পাচ্ছে, এবং হায়াসিন্থ ও ফুলবালিকার মধ্যে রমণীর প্রেমের সৌন্দর্য আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়েছে, তার রূপসৌন্দর্যের বর্ণনায় এটা তীব্রতর, কিন্তু কথা বলতে না পারায়, দৃষ্টি হারিয়ে ফেলায় আলোর গভীরে শুধু নীরবতা জেগে থাকে, প্রেম শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব সমুদ্রের মতো। এর পরের অংশে সোসোট্রিসের খারাপ সর্দিই ইঙ্গিত করছে সে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে বলে, নতুবা তার ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আতঙ্কের ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে, অজানা ভয় পাঠককে পীড়িত করছে। ফিনিসীয় নাবিকের মৃত্যু, মুক্তোর মতো চোখ যেমন ভবিষ্যতের পুনর্জন্মের ইঙ্গিত করছে, একচক্ষু ব্যাবসায়ী বেলাডোনা পর্বতরমণী শূন্যতাকে জাগাচ্ছে, ফাঁসিতে মরা লোকটাকে দেখতে না পারার মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ভয় বোঝাচ্ছে। হায়াসিন্থ ফুলবালিকা যেমন কাঙ্ক্ষিত প্রেমের আদর্শরমণী, তেমনি বিপর্যস্ত যুগের মূল্যবোধহীন প্রেমের প্রতীক বেলেডোনা, সোসোট্রিস, এলিজাবেথ, টাইপিস্ট; মুক্তোর মতো চোখ ফার্ডিনাণ্ডকে বোঝায় যা শেক্সপিয়রের প্রেমের আদর্শ, আর একচক্ষু ব্যাবসায়ী, স্টেট্‌সন ও 'পড়ো জমি'র সাধারণ ও সর্বজনীন মানুষ, যাদের কোনো মূল্যবোধ নেই, আত্মার বিনাশ ঘটেছে। তাই ভবিষ্যতের অজানা ভয়ের পরই বর্তমানকালের লণ্ডনের শহর এসেছে, যেখানে অগণিত জনতা স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ক্লান্তিতে ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক ধ্বনিতে কাজে বেরিয়ে পড়ে। স্টেট্‌সন ও মাইলের যুদ্ধ সর্বজনীন মানুষ ও সর্বজনীন যুদ্ধের একই ভীষণতার রূপ ব্যক্ত করছে, এবং কুকুরটা সেই ভীষণতাকে জাগিয়ে তুলছে। কপট পাঠকের সঙ্গে লেখকও একাত্ম। গানের স্থায়ীর মতো সাধারণ কথা বিভিন্ন খণ্ড চিত্রে প্রকাশ করেছেন, অন্তরা সঞ্চারী আভোগের মতো এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ইঙ্গিত ও সংকেতকে মূর্তিময় করে তুলেছেন দ্বিতীয় অংশে।

দ্বিতীয় অংশের 'দাবা খেলা'য় দুটি ভাগ, প্রথম ভাগে অভিজাত রমণীর প্রেমহীন জীবনের অমিত ঐশ্বর্য ক্লিওপেট্রার আদর্শে অলংকৃত ভাষায় ও ছবিতে রূপায়িত। এই ঐশ্বর্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে শুধু প্রেমহীন কাম; তাই কামদেব, শুভক, সপ্তশিখা বিস্তারিত মোমের বাতির আলো, কৃত্রিম সুগন্ধ দ্রব্য, অরণ্যশোভা, ফিলোমেলের ধর্ষণ, জাগ্ জাগ্ ধ্বনি সংকেতের অর্থ বহন করে আনছে। ক্লিওপেট্রা ও বন্ধ্যা দুই শূন্য ঐশ্বর্যের প্রতীক, তাই হয়তো এই রমণীকে রক্ষিতা বলেছেন অনেকে। যে জল প্রাণদান করে, সেই জল মৃত্যুও আনে। যে মৃত্যুতে ফার্ডিনাণ্ডের মুক্তোর মতো চোখ ভাসিয়ে দেয়, সেই মৃত্যু ইঁদুরের গলিপথে টেনে নেয়। অভিজাত রমণীদের প্রেমের বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে সাধারণ রমণীদের বিসদৃশ কদর্য নোংরা প্রেমের চিত্র সরাইখানার কথায় প্রকাশ পেয়েছে। এবং এই অংশের নাটকীয়তা মারাত্মক। সরাইখানার মালিকের কণ্ঠস্বরে (দয়া করে তাড়াতাড়ি করো সময় হয়েছে) নিরাশ্রয় অসহায়তার সঙ্গে এই জীবনের পরিসমাপ্তি সূচিত হচ্ছে, এই দ্রুত ও অসহায় মুহূর্তের মধ্যে লিলের ব্যর্থ জীবনের করুণ ইতিহাসের সঙ্গে গোপন অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে, যে রমণী লিলকে উপদেশ ও নির্দেশ দিচ্ছে, তার সঙ্গেই লিলের স্বামীর গোপন সম্পর্ক রয়েছে। অভিজাত রমণীর বিবাহ যেমন প্রেমহীন নিরানন্দে পূর্ণ, দ্বিতীয় অংশে স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন বিবাদে নষ্ট হয়ে গেছে, দাবার খেলার মতো শুষ্কতা বিরাজ করছে। এই অংশের সাংকেতিকতা গর্ভপাত ও গরম শুয়রের মাংসের কথার মধ্যে। দ্বিতীয় অংশে একটা খণ্ড অংশকে পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে, তৃতীয় অংশে সব মেলানো হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আদর্শ ও ব্যর্থ প্রেম বিসদৃশভাবে ব্যক্ত হয়েছে শেক্সপিয়রীয় গানের টুকরো, মুক্তোর মতো চোখ, ওফেলিয়ার বিদায় উক্তির সঙ্গে ইঁদুরের গলিপথের বর্ণনায় এবং দাবা খেলার প্রতীকে। ওফেলিয়ার অনুষঙ্গে প্রেম ও ব্যর্থতার উন্মাদনা দুটোই ব্যঞ্জিত হচ্ছে এক সঙ্গে।

তৃতীয় অংশেই জটিল সাংকেতিকতা তীব্রতর হয়েছে, সিম্ফনির ঝড় উঠেছে, অবরোহণ থেকে আরোহণে উঠেছে, ফিশার কিঙ-এর মিথ্ স্পষ্ট হয়েছে, দর্শক টাইরেসিয়াসের চরিত্র স্পষ্ট, বিভিন্ন রচনাশৈলী সামঞ্জস্যে সুন্দর, বর্তমান প্রাচীন একাকার, স্থান ও কাল নির্বিশেষে উন্নীত। নদীর বর্ণনা দিয়ে শুরু, এ নদীর মধ্যে পবিত্র জলের স্পর্শ নেই, সিগারেটের টুকরো, কার্ডবোর্ড বাক্স, স্যাণ্ডউইচ, খালি বোতল আধুনিক সভ্যতার নোংরাকে প্রতীকিত করে-

ছেন, বনদেবীর পরিবর্তে শহরপরিচালকের দল ভ্রমণ করছে এখানে, যেমন নদী ও টেমস নদী একসঙ্গে মিশে গেছে অতীত বর্তমানের সঙ্গে এবং এখানেই ফিশার কিঙ-এর মিথের সংমিশ্রণ। ফিশার কিঙের মাছ ধরবার মধ্যে এবং কদর্য বর্ণনার সাহায্যে এলিঅট তার বীর্যহীনতার অসহায়তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, 'গাছপালার ভেতর দিয়ে একটি ইঁদুর ধীরে ধীরে বুকে হেঁটে গেল, এই ইঁদুর আমাদের সবকিছু কেটে দিচ্ছে, কিন্তু এই বীর্যহীন রাজা মাছ ধরছে, মাছ আবার জন্ম বা উর্বরতার প্রতীক। এই বিরোধের সঙ্গে ফার্ডিনাণ্ডের কাহিনী যুক্ত হয়েছে, ফলে বন্ধ্যা ফিশার কিঙের সঙ্গে সৃজনধর্মী প্রেমের যুগপৎ মিলন ঘটলো। অথবা ফার্ডিনাণ্ডের মনে জাহাজডুবির ভয় এবং সামনে নতুন প্রেমের ইঙ্গিত যুগপৎ সক্রিয়। এমনিভাবেই তৃতীয় অংশের দ্বিতীয় স্তবক ইঁদুরের পায়ের খটাখটে এবং ফার্ডিনাণ্ডের আদর্শ প্রেমের দ্বন্দ্বে আলোড়িত। তৃতীয় স্তবকে 'জাগ্‌জাগ্‌' ও 'তেরেয়্যু' প্রেমহীন ভালোবাসার শারীর আনন্দকে জাগাচ্ছে, এবং অবাস্তব শহর, ধূসর কুয়াশা, স্মার্না ব্যাবসায়ীর ময়লা দাড়ি, অশিষ্ট ফরাশি ভাষায় তার আমন্ত্রণ এবং সাপ্তাহান্তিক আনন্দ সবই প্রেমহীন ভালোবাসার আগুনকে প্রতীকিত করছে, চতুর্থ স্তবকে টাইরেসিয়াস যা দেখেছে টাইপিস্ট ও কেরানির ক্লান্ত সংগমে, তা এ যুগের চিত্র হলেও যুগ যুগ ধরে এ চলে আসছে। দ্বিতীয় অংশে বিবাহিত রমণী ও পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য জীবনের করুণ নিষ্ঠুরতা দেখা গিয়েছিল, এখানে প্রাক্‌বিবাহ জীবনের, অথবা বিবাহ ছাড়াই কামনাময় জীবনের খণ্ড অংশ ফুটে উঠেছে। তাই সংগম ও চুম্বনের পর নারীর কাছে যৌন সংগম একটা উদাসীন কর্মমাত্র, অন্য কিছু নয়, এই কারণে এ কাজ হবার পর গ্রামোফোনের ওপর রেকর্ড বসিয়ে দেয় স্বয়ংক্রিয় হাতে। এই বীভৎস দৃশ্যের পরই আয়োনীয় সোনা আর রুপোর রহস্যময় বিরাট ঐশ্বর্যকে ইঙ্গিতময় করে তুলেছেন। এই আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের ইঙ্গিতের পরই টেমস কন্যাদের তিনটি গানে কামনার আগুনের রূপ ফুটে উঠেছে ভিন্নরীতিতে। প্রথমটিতে আলকাতরা তেলে বর্তমানের নদীর নোংরা অবস্থা, ক্লিওপেট্রার অনুষঙ্গ; দ্বিতীয় গানটিতে এলিজাবেথ ও লেস্টরের কামনাবহুল অপবিত্র কাহিনী; তৃতীয় গানটিতে ভাঙা নখের বর্ণনায় টাইপিস্টের কাহিনী ও আশাহীন প্রেম। এমনি ভাবে অপবিত্র প্রেমের কড়াই এখানে জ্বলছে। তাকে উৎপাটিত করতে চাইছেন বুদ্ধের ও সেন্ট অগাস্টিনের নিবৃত্ত মার্গের দ্বারা।

চতুর্থ অংশের সিম্ফনির ঝড়ের পরে প্রশান্ত নীরবতা বিরোধাভাসে ফুটে উঠেছে। এই রূপ এখানে শুধু মৃত্যু আনছে না, পুনর্জন্মকে সূচিত করছে। ক্রেবাসের মধ্যে ব্যাবসায়ী ও খৃস্ট লুকিয়ে আছে, কার্ভিনাও জড়িয়ে আছে, চক্রের মধ্যে কাজ করছে ঋতুর আবর্তন, ভালোমন্দ। ভবিষ্যতের আশা ব্যঞ্জিত হয়ে উঠছে। কিন্তু দুঃখ ও দুর্দশাকে অস্বীকার করছে না। এমনি-ভাবে উদ্ভিদের মাটি, ছলনার খেলা, কামনার আগুন, জীবনের জলকে সিম্ফনির বিভিন্ন গতির মধ্যে মিলিয়েছেন।

পঞ্চম অংশে বজ্র শব্দটার মধ্যেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, এই বৃষ্টি পুনরুজ্জীবনের, তাই জলের কথা বারংবার আসছে। ঘর্মাক্ত মুখের ওপর টর্চলাইটের আলো খৃস্টকে ইঙ্গিতবহ করে তুলছে। সুতরাং কবিতায় অগ্রগতি এইভাবেই পরিণতিতে মেলে। পূর্বের সমস্ত অংশের জটিলতা এখানে নতুন উপায়ে ও অভিনব সুরে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। জনতা এসেছে, পাথর এসেছে, জল এসেছে, তৃতীয় ব্যক্তির ইঙ্গিত এসেছে, অবাস্তব শহর ও দস্যুদল এসেছে, কিন্তু সবই নতুন অর্থ নিয়ে। প্রথম অংশের যে পাহাড় আশ্রয় দিতো কিছুটা, এখানে সে নিষ্করুণ পাথর, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মরুভূমি অনাবৃষ্টি ও ভীষণতা, আবার দোয়েল এখানে মুক্তির প্রতীক। বসন্ত বজ্রের সঙ্গে জলশূন্য পাথুরে পর্বতের বিরোধিতায় নূতন বোধ আসছে, এই বোধ তীব্রতর হচ্ছে জল ও পাথরের পরস্পর অনুষঙ্গে এবং পাইন গাছে ধ্যানী দোয়েলের গানের মধ্যে আকাঙ্ক্ষার সদর্থক রূপ অভিব্যক্ত, তৃতীয় ব্যক্তির নির্দেশে খৃস্ট ইঙ্গিতবহ, কিন্তু ভয়ের ছায়া উচ্চকিত, সোসোট্রিস একে চিনতে পারে নি, এর আবির্ভাব মনের মধ্যে এবং আকাঙ্ক্ষায়, কিন্তু বাস্তবে দস্যুদল সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, কারণ আত্মিক মুক্তি নেই। এই ধ্বংসের চিত্রের সঙ্গেই অনুভূতিতে আসছে উর্বরতার প্রতীক নারীর দীর্ঘ কালো চুল, খৃস্টীয় দীক্ষার রঙ বেগনি আলো, স্মৃতির ঘণ্টার ধ্বনি, গম্বুজ, শূন্য চৌবাচ্চা থেকে গানের কণ্ঠস্বর এবং পাহাড়ের মধ্যে এই ক্ষয়িত গহ্বরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ঘাস গান গাইছে বিপর্যস্ত কবরের ওপরে। তার পরই বিদ্যুতের উদ্ভাস, ছাদের ওপর মোরগের ডাকে খৃস্টের আবির্ভাবের ইঙ্গিত, সর্বশেষে ভেজা দমকা বাতাসে বর্ষণের আগমন, এই বর্ষণ বা মুক্তি আসতে পারে ব্যক্তির পবিত্র আত্মিক চেষ্টায়, আত্মসমর্পণে, সহানুভূতিতে এবং সংযমে; যে সংযম সমুদ্রে নৌকাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। পঞ্চম অংশের শেষাংশই এই

কাব্যের রূপগঠন ও বক্তব্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির আগুনে গলে একাকার হয়ে গেছে। শেষ অংশে টাইরেসিয়াস, ফিশার কিঙ, 'পড়ো জমি'র নায়ক এবং যাত্রী একাত্ম। জল ও মৎস্যশিকার পুনরুজ্জীবন ও উর্বরতার প্রতীক, কিন্তু তার পেছনেই রয়েছে শুষ্ক মরুর প্রান্তর, অর্থাৎ মুক্তি আসে নি, শুধু ইঙ্গিত দিচ্ছে। জমি সুবিন্যস্ত করবার মধ্যে আত্মিক মুক্তির জন্যে নিজের মনকে সংস্কৃত করবার কথা আছে। কারণ বাইরের পৃথিবী, বাস্তব ও আধুনিক সভ্যতা তো লণ্ডন ব্রিজের মতো ভেঙে পড়ছে আজ। কিন্তু ভেঙে পড়লেও দান্তের মতো বলা উচিত ব্যথায় মনোযোগী হতে হবে, উদাসীনতা মৃত্যু, এবং আকাঙ্ক্ষা থাকবে সোয়েলের মতো রূপান্তরিত হয়ে উঠবার, রূপান্তরিত হয়ে উঠলেই তেরেয়্যুর কামনাজাত ধর্ষণ থেকে মুক্তি আসবে, কারণ যাত্রীতো বাস করছে বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদে রাজকুমারের মতো, এই ধ্বংসের পুনর্জন্মই তো রাজকুমারের আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ, ধ্বংসের মুখে তাইতো আজও বেঁচে আছে। ইয়েরোনিমো এই রক্তাক্ত সভ্যতার নিষ্ঠুরতার উন্মাদ, পুত্রশোকে পাগল, কিন্তু তাঁর অভীপ্সিত কর্ম থেকে সরে আসছেন না, নাটক লিখতে রাজি হয়েছেন। এই রাজি হওয়ার মধ্যে প্রতিহিংসায় বর্বর সভ্যতাকে ধ্বংস করেছেন, অন্যদিকে নিজের মনে শক্তি সঞ্চয় করছেন, যে শক্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ, সহানুভূতি ও সংযম রয়েছে; ব্যক্তিহৃদয়ের এই সৎ প্রচেষ্টার মধ্যেই ঔপনিষদিক শান্তি ও ব্রহ্মোপলব্ধির ব্যাপকতা আসছে। ধর্মের ক্ষেত্রেই পূর্ব পশ্চিম এবং সমস্ত পৃথিবী, দেশকাল, অতীত বর্তমান এক হয়ে গেছে, তাই বাইবেল বুদ্ধ উপনিষদ এসেছে একসঙ্গে। বিভিন্ন দেশের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এই ইয়েরোনিমো এলিঅট নিজেই, এই কারণেই তাঁর উক্তি দিয়ে এই কাব্যের পরিসমাপ্তি।

রাইনের মারিয়া রিল্‌কে

কবিতা যে অভিজ্ঞতার নির্যাস, অনুভূতি নয়, একথা জোরের সঙ্গে একালে রিল্‌কে ঘোষণা করেছেন, এবং এই সংজ্ঞাই রিচার্ডস্ মেনে নিয়েছেন কবিতার তাত্ত্বিক আলোচনায়। ১৯১০ সালে 'মাল্‌টে লরিডস্ ব্রিগ্‌গে' উপন্যাসে রিল্‌কে বলেছেন : 'সাধারণ লোকেরা যেমন কল্পনা করে পদ্য শুধুই অনুভবের, আসলে পদ্য তা নয়, পদ্য হলো অভিজ্ঞতা।' এখানেই রোমান্টিক আদর্শের সঙ্গে রিল্‌কের কবিতার এবং আধুনিক কবিতার প্রভেদ। যেহেতু কবিতা অভিজ্ঞতা সেইহেতু অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন, পেয়েছেন ; এবং সেই অভিজ্ঞতায় নিজেকে তৈরি করেছেন প্রতিটি মুহূর্তে, তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তিত্ব থেকে কবিতা বেরিয়ে এসেছে, এই ব্যক্তিত্ব ও কবিতার সঙ্গে তার কোনো প্রভেদ নেই, কবিতার মধ্যেই তাঁর জীবন এবং তাঁর জীবনের মধ্যেই কবিতা, কবিতার এরকম সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব একালে কারো মধ্যে দেখা যায় না। কবিতার লোভে যে মানুষ সুন্দরের ধ্যান করে, ব্যাবহারিক জীবনে সে মানুষ নিষ্ঠুর, অসৎ, শয়তান ও চতুর। এই দ্বিধাবিভক্ত সত্তা রিল্‌কের নেই। কবিতার ভাব ও রূপের জন্যে তিনি কবিতার মতোই তাঁর ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছেন নানা পর্যায়ে। আর এই অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবিতকালের পূর্ণ রূপই ব্যক্ত হয়েছে, রিল্‌কের মধ্যেই তাঁর যুগ প্রতিভাসিত ও প্রতিধ্বনিত। এই যুগের কথা কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তাঁর কবিতার শব্দেই তা ব্যক্ত। কবিতায় ভাস্কর্যধর্মিতা তিনি এনেছেন ফরাশি শিল্পী রঁদার ভাস্কর্য থেকে, শব্দের মূর্ত রূপ স্থির, প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট শব্দই নির্যাস ও তাঁর কাঙ্ক্ষিত বস্তু, পাথরের বা ব্রোঞ্জের স্তূপ কেটে কেটে রূপ মূর্তি তৈরি করা। শব্দের ভাস্কর্য রিল্‌কের কবিতাতেই মূর্ত অর্থাৎ 'বস্তু'। কিন্তু এই ভাস্কর্যের সঙ্গে পার্নাসীয় কবিগোষ্ঠীর নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তির অভিজ্ঞতাবিহীন নিরপেক্ষ চিত্র নেই। এবং রিল্‌কেই একমাত্র কবি যাঁর মধ্যে সমগ্র য়ুরোপ মূর্ত হয়ে উঠেছে, বিশেষ দেশের স্থানিকতা নেই তাঁর রচনায়।

রিল্‌কের প্রথম যুগের কবিতায় রোমান্টিক ভাবনায় নিঃসঙ্গ বিষাদ ও স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষা জড়িত ছিল, যার সঙ্গে জীবনের কোনো যোগ নেই, যোগ

থাকলেও তাৎপর্যমণ্ডিত নয়; ঐ যুগের কবিতায় ধর্মীয়বোধ প্রায় হেগেলীয় আদর্শের মতো, আমরা মানুষ নিয়ত তাঁর থেকেই এসেছি এই ইন্দ্রিয়ময় জগতে এবং আমরা তাই পরমকেই পোশাক পরাই, বস্তুর আড়ালেই অগ্নিপিণ্ডের মতো হয়ে উঠতে হবে, কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকাই দেশ, এই দেশই জীবন, আমরা কখনো পরমের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারি না। তিনিও আসছেন, আমরা যাচ্ছি তাঁরই কাছে। এ যেন রবীন্দ্রনাথকেই অন্য ভাষায় পাই, রিল্‌কের এই দেবতা সুন্দর ও ভীষণকে একই সঙ্গে জাগ্রত করেন, এবং এই দুইয়ের মধ্য থেকেই তাঁকে লাভ করতে ও জীবনকে পেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন, 'বাজাও আমারে বাজাও/বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে সেই সুরে মোরে বাজাও।' 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে,/চিরপথের সঙ্গী আমার, চির জীবন হে।' এ কথা রিল্‌কেরও প্রাণের কথা। দুজনের মধ্যে একই আদর্শ অনুস্যূত বলে এই সাদৃশ্য উচ্চকিত।

'ডুয়িনো এলিজি' ও 'অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেটগুচ্ছে'ই রিল্‌কের কবি-প্রতিভার শীর্ষ পরিণাম চিহ্নিত। এলিজির মধ্যে আছে বেদনাকাতর যন্ত্রণার গোলাপ, অর্ফিয়ুসের মধ্যে বিবৃত হয়েছে যন্ত্রণার মুক্তি, সংগীতের ব্যাপ্ত মহিমায় রূপান্তরিত বিশ্বের আনন্দ। তিনি বস্তু দেখেন, বস্তুর আড়ালে লুকিয়ে থাকে আরেক অদৃশ্য গোপন নিভৃত পদ্ম, যার গন্ধে মানবজীবন ঘুমিয়ে বা জেগে আছে; অর্ফিয়ুস মৃতের দেশে গিয়েছে প্রেমকে জাগাতে, মৃতের সঙ্গে আহার করেছে সে, তার পর ফিরে এসেছে রূপান্তরিত হয়ে, এই রূপান্তরিত সত্তায় বিশ্বের অসীম আনন্দের গানই বাজিয়েছে অর্ফিয়ুস। কবির ধর্ম, রিল্‌কের মতে, এই অর্ফিয়ুসের মতো। কবি কোনো ক্রিয়াময় উত্তেজনা তৈরি করে না কোনো পাঠকের হৃদয়ে, কিন্তু এক মৌল সুরকে জাগিয়ে দেন; কবিতার সৃষ্টিশীল আনন্দে যে মৌল অদ্বিতীয় সুর উৎসারিত হয়, তারই সাহায্যে জীবনকে ব্যাখ্যা করতে হবে, এই সুর আসে সংগীতেই। জর্মন সংগীত ও দর্শনই তাঁকে এই উপলব্ধিতে নিয়ে গেছে।

নিঃসঙ্গ বিষাদময় যন্ত্রণাকাতরতা অথচ জীবন ও নিয়তির অমোঘ অস্তিত্ব যা ভীষণ বা আতঙ্কের মতো আমাদের ওপর চেপে বসে, আর সেই সঙ্গে মৃত্যুবাসনা, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনকে উপলব্ধি করবার এক অতীন্দ্রিয় বোধ—যেখানে মৃত্যু আর জীবন পাশাপাশি শুয়ে থাকে, এগুলির সামগ্রিক বোধই রিল্‌কের এলিজিতে মূর্ত; প্রেম ফুল ও মৃত্যু তাঁর কবিতায় যেমন ব্যক্ত

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মৃত্যুও ঠিক এমনিভাবে ঘটেছে। রোমান্টিক বিষাদ ও নিঃসঙ্গতা, ধর্মীয় বোধের অতীন্দ্রিয়তা ও আকাঙ্ক্ষা, বাস্তব জীবনের ভীষণতা, সান্ত্বনাময় সংগীত যেন একসঙ্গে মিশে আছে এই এলিজিগুলির মধ্যে। এখানে 'বস্তু' ও চিত্রকল্পের সঙ্গে আবেগের গাঢ় উচ্চারণ নিয়তির প্রশ্নকে আরো উচ্চকিত করেছে।

রিল্‌কের কবিতায় অদৃশ্য নিয়তি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে মজায়; ইমপাল্‌স্, বংশধারা, অধৈর্য, দুর্বোধ আশা বোঝা যায় না, বোঝায় না আমাদের, এসব আমাদের ওপর কাজ করে, তারপর জীবনসংগ্রামে আমরা হারাই আমাদের যা ছিল, একাকী নিঃসঙ্গ মরে যাই, জানি না কেন? অস্তিত্বের এই নিঃসঙ্গতার তীব্রতা অসহনীয়।

রিল্‌কের কবিতায় চরম সার্থকতা এই এলিজিগুচ্ছ, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার জটিলতা সামগ্রিকভাবে এখানে ধরা পড়েছে; তিনি প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু প্রশ্নের পরই উত্তর দিয়েছেন, দুই বিরোধকে পাশাপাশি বসিয়ে আর্তনাদ করে উঠেছেন করুণভাবে, তারপর সেই বিরোধকে মিলিয়েছেন অনুভূতির প্রত্যয়ে; এখানে তাঁর জিজ্ঞাসা অফুরন্ত, মানুষ প্রকৃতি পশু দেবদূত ঋতু নক্ষত্র সব এসেছে গভীরভাবে, এবং এদের সম্পর্কে এই সব প্রশ্নের সমাধান করেছেন; বস্তু এবং অনির্বচনীয় এখানে একই সঙ্গে কথা বলে উঠেছে।

আধুনিক জীবনের যে জটিল সমস্যা, যা আমাদের নির্বেদকে ব্যক্ত করে, তা এই এলিজির মধ্যেই ব্যক্ত। পরমের জন্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বসে আছি, হৃদয়ে উদ্বেল আনন্দ, মনের গভীরে ও সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ, আর তার পাশেই সন্দেহ অনিশ্চয়তা ও ব্যর্থতার বোধ; এই দুই নিয়েই বেঁচে থাকতে হয় জীবনে; এই দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থাই নির্বেদ, অনন্ত ভয়ের তীব্রতা জাগিয়ে তোলে সর্বদা। প্রেরণার পরম আনন্দে ভেসে যেতে চাই, কিন্তু প্রেরণা বিরল, একবার এলে আর আসতে চায় না, তাই বিপজ্জনক আনন্দময় প্রেরণা শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে থাকে প্রাত্যহিকের ব্যর্থতা ও হতাশায়। আদর্শময় স্মৃতির বিরল মুহূর্তে ডুবে থাকার আনন্দ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, অথচ তাকেই আমরা চাই, এই বিরোধ থেকেই নির্বেদ বা Angst-এর জন্ম। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষ সবচেয়ে অসহায়, মুখোশে মানুষ অর্ধেক নিজেকে ঢেকে রেখেছে, এই অবস্থায় দড়ির ওপর লাফাচ্ছে, কার্পেটের ওপর, আর কার্পেট ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে নিয়ত। এই হচ্ছে মানুষের নিয়তি, অথচ এই নিয়তিকেই মানুষ এড়াতে

চায়। আমরা সৌন্দর্য চাই, কিন্তু সৌন্দর্য থেকেই এই পৃথিবীতে আতঙ্কের শুরু, এই আতঙ্কের মধ্যেই অসহনীয় কান্নার বিপুলতায় অসহায়ভাবে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। এই অবস্থায় দেবদূত মানুষ পশু কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারে না, কেননা অনিশ্চয়তাই আমাদের চিরদিনের সামগ্রী, খুঁজে বিচ্ছিন্ন শিথিল হয়ে থোলে, ভাঙা খেলনার মতো আমাদের পথ এখানে পড়ে থাকে, শাশ্বতের মূল্য আমরা বুঝি না, অথচ একে ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতেও পারি না। নবম এলিজিতে এই অসহনীয় অবস্থা দুটি ছবিতে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন: 'হাতুড়ির মাঝখানে আমাদের হৃদয় বেঁচে আছে, যেমন দাঁতের মাঝখানে জিহ্বা, এই জিহ্বা সব কিছু সত্ত্বেও নিয়তই প্রশংসা করে।' এই সামগ্রিক বোধই এলিজির প্রাণ। এখানে ছবি চিত্রকল্প বক্তব্য স্থাপত্য সব মিশে গেছে হৃদয়ের তীব্র অনুভূতির কাছে, অর্থাৎ শিল্পেরও সামগ্রিকতা এর মধ্যে লক্ষণীয়।

এই নির্বেদ বোধ তখন অস্তিত্ববাদী দর্শনে প্রচলিত। কির্কেগার্ড যখন একে বর্ণনা করেন, তখন রিল্‌কের ধারণার সঙ্গে মিশে যায়; সহানুভূতিময় বিতৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণাময় সহানুভূতি, যার কথা কির্কেগার্ড বলেন, রিল্‌কের ধারণার মধ্যে তা মিলে যায়। কির্কেগার্ডের কাছে মানুষ ওপরে উঠতে চায় আবার সে নীচে নেমে আসে, এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা চলে তার মধ্যে।

দশটি এলিজির মধ্যে রিল্‌কে তাঁর রুদ্ধ আবেগ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু যুক্তিবিন্যস্তভাবে, ক্রমিক পরিণামে, কোথাও এলোমেলো নয়, উপস্থাপ্য বিষয় শেষ পর্যন্ত পরিণতি লাভ করেছে। প্রথম এলিজিতে দেবদূত ভয়ংকর, দ্বিতীয় এলিজিতে দেবদূত ভয়ংকর হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের উদ্দেশেই তাঁর প্রার্থনা উচ্চারিত, কেননা দেবদূতেরাই আত্মার বিহঙ্গ, এই দেবদূতেরা যা দেন মানুষকে তাই ফিরিয়ে নেন, এবং তার থেকে বেশি কিছু নেন, মানুষ তার অস্তিত্বে আরো কিছু নিজের মধ্যে মিলিয়ে নিয়েছে, দেবদূতেরা যখন ফিরিয়ে নেন এই বেশি কিছুও তাদের মধ্যে মিশ্রিত করেন, ফলে দেবদূতেরা অন্তঃসত্ত্বা রমণীর মতো, আরো পূর্ণ ও বেশি-কিছু হয়ে ওঠেন। এখানেই মানুষের জয়, এই জয়েই দেবদূতের সার্থকতা। নবম এলিজিতে রিল্‌কে দেবদূতকে পৃথিবীর বন্দনা শোনাতে চেয়েছেন, এই পৃথিবীর বন্দনায়ই দেবদূত সার্থক, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রূপান্তরের গোপন আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে। এই পৃথিবীকে পরিহার নয়, তাকে বন্দনা করে রূপান্তরের মধ্যে পূর্ণতা দিতে হবে। দশম

এলিজিতে দেবদূতেরা সম্মত হয়েছেন, আতঙ্ক থেকে মুক্তির জন্যে বন্দনা গানের উচ্চারণ করেছেন গভীর স্বরে। এমনি করে পরিণতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে।

অন্য বিষয়বস্তুর পরিণামও অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এই বিষয়বস্তুর মধ্যে তাঁর প্রিয় সংকেতগুলি নিত্য নতুন হয়ে জলে উঠছে, সংকেতের মধ্যেই তিনি অর্থকে অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছেন; শিশু, পশু, অকালমৃত, পাখি, পুতুল বারংবার তাঁর চেতনাকে আঘাত করেছে, এগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর বিশ্বাস ও অনুভূতিকে তীব্র করে তুলেছেন। মানুষের তুলনায় পশু সুখী, কারণ অতীতে ও ভবিষ্যতে সে পীড়িত নয়, বর্তমানের নিবিড় আনন্দে নিমগ্ন, শিশুও তাঁর খেলার জগতে নিত্য বর্তমানে সর্বদা আনন্দময়, এদের থেকে আরো সুখী মাতৃগর্ভে স্থিত অণুজ, গর্ভের উষ্ণ পরিবেশে বাইরের চাপ থেকে নির্বিঘ্নে রক্ষিত ও অথচ প্রাণময় সত্তায় স্পন্দিত; তাই রিলকে প্রেমে ও অনুভূতিতে ফ্রয়েডীয় রীতিকে মেনে মাতৃগর্ভের আনন্দে নিয়ত প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন, অকালমৃত দেবদূতের কাছে যেতে পারে।

এই সঙ্গেই আদর্শ মিলেছে প্রেমের ও বীরের। সাধারণ মানুষের জীবন খণ্ডিত, সীমিত, অনিশ্চয়তায় পূর্ণ, অধৈর্য ও উদ্বিগ্নতার মধ্যে দোদুল্যমান, এই কারণেই অনবরত সে বিষণ্ণ ও অপূর্ণ। তাই তাদের জীবন অর্থহীন হয়ে ওঠে। বেঁচে থাকার মধ্যে যেমন সার্থকতা নেই, তেমনি মৃত্যুও এখানে অসার্থক। বিচ্ছেদ ও ক্ষতির মধ্যেই তাদের জীবন পর্যবসিত হয়, এরা নিজের মধ্যে থেকেও আলাদা ও পৃথক, এই অসম্পূর্ণতা তাদের জীবনে আছে বলেই তাদের জীবন পাপের, এই পাপ থেকে মুক্তিই কাম্য, এই মুক্তি হলো রূপান্তরে ও মৃত্যুতে।

রিলকের প্রেম একদিকে আত্ম-অস্বীকৃতি, অন্যদিকে আত্মোপলব্ধি, নিজেকে অস্বীকার করার মধ্যেই আত্মোপলব্ধি ঘটে। আর সার্থক প্রেমের মধ্যেই অনাদ্যন্ত কালের প্রাণ স্পন্দিত হয়ে ওঠে, পিতৃপুরুষ, শিশু, ভাঙা পাহাড়, মায়েদের শুষ্ক নদীগর্ভ, নিঃশব্দ ভূদৃশ্য নিয়তি ধীরে গোপনে স্থান পায়, পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রেমের মধ্যে কোনো আত্মবিসর্জন থাকে না, নিজেদের খণ্ডিত সত্তায় লিপ্ত বলে তাদের রূপান্তর ও উত্তরণ ঘটে না। কিন্তু সার্থক প্রেম শাশ্বতকে অনুভব করে, পরস্পরের চুম্বনের মধ্য দিয়েই এই শাশ্বত বোধ জেগে ওঠে ধীরে ধীরে, এখান থেকে কিছু অন্তর্হিত হয় না।

প্রেমের সঙ্গেই মিশে আছে বীরের ধারণা ও বোধ। বীর তার কর্মের মধ্যে নিজের ভেতরে সর্বদা বর্তমান ও সত্য হয়ে উঠছে। এই কারণে বিপদ তাকে পূর্ণতা দিচ্ছে, বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আত্মনির্ভরতায় সক্তিময় হয়ে উঠছে, ভালোবাসাকেও সে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, অনবরত হয়ে উঠছে, দূর অতীত থেকে বহু দূরে, তাই সে দেবদূতের মতো, এমনিভাবে তার উত্তরণ ঘটছে। এবং প্রেমিক ও বীর তাঁর কল্পনায় বারবার নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে, পশুপাখি, শিশু অকালমৃত প্রতীক হয়ে জেগে উঠেছে তাঁর কাব্যে।

সাধারণ জীবনের অতৃপ্তি দুর্দশা ও গ্লানি, তার থেকে মুক্তি, অথবা welt ও raun এই জগৎকেই একসঙ্গে ধরতে চেয়েছেন। সত্যকে পেতে চেয়েছেন হৃদয়ের গভীরে; অলৌকিক বস্তুশূন্য নয়, বস্তুর পূর্ণ স্বরূপ হৃদয়ের অনুভূতিতে তীব্র হলেই রূপান্তর ঘটে, এই রূপান্তরের মধ্যে সত্য। তাই রিল্‌কে বিশ্বাস করেন, মৃত্যু বিনাশ নয়, এই জীবনের রূপান্তর। নিজের উত্তরণ এবং মৃত্যুর মধ্যেই সমগ্র জগৎ বিধৃত হয়ে ওঠে, জগৎ সৃষ্টির মূলে পৌঁছোনো যায়, দেবদূতের সঙ্গে মিশে যাওয়ার অর্থই হলো মৃত্যুকে লাভ করা, ঈশ্বরকে পাওয়া যদি বিনাশ না হয়, তাহলে এই মৃত্যুর মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, সব না পাওয়ার বেদনা হয়ে-ওঠার পূর্ণতায় রঙিন হয়ে জ্বলে।

কিন্তু রিল্‌কের কবিতায় হেগেলীয় ও রোমান্টিক আদর্শ থাকলেও তাঁর অভিজ্ঞতায় বস্তু নতুন মর্যাদা পেয়েছে। অভিজ্ঞতাই তাঁর মূল কথা, এই অভিজ্ঞতায় বস্তু পৃথিবী গভীরতায় তাৎপর্যময়। বস্তু (die Dinge) সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বস্তুকে রিল্‌কে 'সম্পূর্ণ' বলে ভাবেন, এই সম্পূর্ণ সত্য হয় অভিজ্ঞতায়, এবং বৃক্ষ পশু পাখি পুরনো বাড়ি ভাঙা গম্বুজের প্রতীকে এই সত্য প্রতিভাসিত। নবম এলিজিতে এই পৃথিবী ও বস্তু সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন; অনির্বচনীয় নয়, এই পৃথিবীর বন্দনাই দেবদূতকে শোনাতে হবে, কেননা জ্যোতির্ময় উদ্‌ভাস তো দেবদূতের মধ্যেই আছে। বরং বস্তুকে তাঁর কাছে তুলে ধরতে হবে, এই বস্তুই সহজ ঐতিহ্যবাহী ও প্রাণবন্ত। বস্তুই নির্দোষ ও সুখী। কেননা বস্তুরা ক্ষণজীবী; ক্ষণজীবী বলেই রূপান্তর হতে পারে এদের। আমাদের বিশুদ্ধ কান্না সেও বস্তু। অর্থাৎ বস্তুকে বস্তুরূপেই দেবদূতের কাছে স্তবনীয় করে তুলতে হবে। এই বস্তু যেমন রূপান্তরিত হয়, তেমনি এই বস্তুকে গ্রহণ করেই দেবদূত পূর্ণ হয়ে ওঠেন, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই রূপান্তরের অনির্দেশ্যতায়ও এই বস্তুই সক্রিয় হয়ে উঠছে। এমনিভাবে জীবন

মৃত্যু ও অনাত্মত্ব অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, ক্রমিক পর্যায়ে অনবরত হয়ে উঠছে, অনির্দেশ্য লোকে উধাও হচ্ছে।

প্রত্যেকটি এলিজিতে ক্রমবিস্তৃত, অথচ গাঢ় হৃদয়াবেগে তীব্র, বেদনাধারা উচ্ছ্রিত। প্রথম এলিজিতে প্রথমেই মানুষের আর্তি ও চিৎকার, সেই সঙ্গে তার অসহায়তা। দেবদূতের ভীষণতা আমাদের নিরাশ্রয়তা ও অনিকেত বোধকে তীব্র করছে। তারপরেই প্রকৃতিজগৎ বৃক্ষ, কাল, পথ ও রাত্রি। এগুলিই পৃথিবীর বস্তু। কিন্তু এখানেও মানুষ নিঃসঙ্গ, দুঃখের মধ্যেই তার জীবন। জিজ্ঞাসা করেছেন প্রেমিকদের, কিন্তু তাদের অদৃষ্টও তো জানা যায় নি, প্রেমিকের সঙ্গেই পাখির কল্পনা এসেছে। মানুষের জীবন বর্তমানে পীড়িত। পীড়িত বলে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে সে। কিন্তু অতীতের বসন্ত স্মৃতির মধ্যেও মানুষের ভবিষ্যৎ কাজ করে। আবার এই ভবিষ্যৎকেও আশ্রয় দিতে পারে না সে। তবু এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে প্রেমের কাছেই শরণ নিয়েছেন রিল্‌কে, প্রেমেই মানুষ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে আর স্মরণ করেছেন বীরদের, যারা ক্রমাগত হয়ে উঠেছে। ভালোবেসেই মানুষ পারে বস্তুকে ছাড়িয়ে যেতে, ধনুর গুণ থেকে বাণ যেমন ছাড়িয়ে যায়, অথচ ধনুককে সে অস্বীকার করে না কখনো। প্রেমের কথা বলতে বলতেই দৈবী কণ্ঠস্বর শুনেছেন কবি। মানুষ দীক্ষিত না হলে এই স্বর শোনা অসম্ভব, তবু এই কণ্ঠস্বরের নিশ্বাস বয়ে চলেছে এই পৃথিবীতে। এই নিশ্বাসের সঙ্গে অকাল-মৃতদের বেদনাধ্বনি স্পন্দিত। মৃত, অতীত ও নিয়তি এই স্বরের সঙ্গে মিশে যায়। অতীত মিশ্রিত দৈবী কণ্ঠস্বরে স্থায়ই প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে।

প্রেম ও দৈবী কণ্ঠস্বরে কবি যেন মুক্তি পেলেন, কিন্তু এই মুক্তি তো তিনি হৃদয়ে অঙ্গীকার করে নিতে পারেন নি, তাই এই অদ্ভুত পৃথিবীতে ফিরে এসে শূন্যতায় ঝুলছেন আবার। প্রেম দৈবী কণ্ঠস্বর অতীতে পরস্পর সম্পর্কে আর গ্রথিত নয়, শাশ্বতের অনুভূতি বয়ে চলেছে জগতে, জীবিত ও মৃতের মধ্যে। কিন্তু মানুষ ধরতে পারছে না একে। কিন্তু তাই বলে কি মানুষ চির কালই বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে? অতীতের দুঃখময় বেদনার মহিমা কি তাকে সান্ত্বনা দেবে না এগিয়ে যাবার জন্যে! এই আকূতি দিয়েই প্রথম এলিজি সমাপ্ত হয়েছে। এবং এই একই আকূতির পূর্ণতা অর্কিয়ুসের সনেটে।

নবম এলিজি অনুভূতির গাঢ়তায় ও বস্তুর সত্যে আরো গভীর। ১. ক্ষুদ্র অস্তিত্ব মানুষ শেষ করতে চায়, কিন্তু মানুষ পারে না, কেননা মানুষের ভাগ্যই

মানুষকে অনবরত নিয়তির পেছনে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ২. মানুষের ভাগ্য বা নিয়তি তাকে সুখের সন্ধান দেয় না; কৌতূহল নিবৃত্ত করে না। মানুষের নিয়তি বর্তমানকে চায়, চায় দেশ ও কাল, তাদের উষ্ণ অস্তিত্ব ও উপস্থিতি, মানুষও চায়, তারাও চায়। আমাদের জন্ম একবার, কিন্তু একবারের জন্যেই আমরা এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চাই গভীরভাবে। ৩. এই কারণেই আমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টা নিয়ত চলছে। এই চেষ্টা, প্রেম ও কষ্ট স্বীকারের, এর দ্বারাই আমরা অনির্বচনীয়ে পৌঁছুতে পারি। তারপরে অব্যক্ত. এই অব্যক্তের জগতে প্রকাশমান শুধু শব্দ, যে-শব্দ অভিজ্ঞতায় আহরণ করেছি, শব্দের মধ্যেই নীল ও হলুদ উদ্ভিদ কথা বলে ওঠে। ৪. এই শব্দের মধ্যে দিয়ে যে উচ্চারণ তাতে পৃথিবীর বস্তু—কলস জানলা দেউড়ি কুয়ো বাসা সাঁকো—হয়ে ওঠে। এমনভাবে অভিজ্ঞতায় অর্জিত শব্দে বস্তু পৃথিবী আমাদের হৃদয়ে হয়ে ওঠে পূর্ণ। এমনি করেই প্রতিটি বস্তু হয়ে ওঠে তাৎপর্যময়। ৫. তারপরে দুই চাপের মধ্যবর্তী মানুষের জীবনের কথা বলা হয়েছে, এই চাপের মধ্যে দেবদূতকে শোনাতে হবে পৃথিবীর বন্দনা, বস্তু; বস্তুই সত্য হয়ে উঠবে। বেদনার ধারাও বিশুদ্ধ রূপ পেলে বস্তু হয়ে ওঠে, ক্ষণজীবী বস্তু আমাদের হৃদয়ের ঘোষণায় মুক্ত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ৬. এমনিভাবেই রূপান্তর ঘটে আমাদের সাহায্যে। কিন্তু এই রূপান্তরে পৃথিবী বর্জিত হয় না। হৃদয় থেকে অস্তিত্বের সীমাহীন রূপান্তর ঘটে।

এবং তার ফলেই দেবদূতকে পাওয়া যায়। এবং সেই কথা অন্যভাবে দশম এলিজির মধ্যে ব্যক্ত।

স্যাঁ-জন্ প্যার্সের 'আনাবাস্'

প্যার্সের কবিতার মাধুর্য ছন্দোময় স্পন্দিত গদ্যে ও অপূর্ব ছবির অভিনবত্বে। প্রতীকী কবিতার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও অনুষঙ্গের সঙ্গে পরম এসেছে রোমান্টিক সুদূরতার উপলব্ধি নিয়ে। জগৎকে বাদ দিয়ে অসীমের গভীরে নতুনকে অন্বেষণ করেন নি প্যার্স; এই জগতের প্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্যেই অশেষ ও অসীমকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন। এখানে প্রতীকী কবিতার ধারাকে অনুসরণ করলেও রোমান্টিক ধারাকে স্বীকার করেছেন তিনি; ফরাশি রোমান্টিকতার স্মৃতি নস্টালজিয়া নির্বেদ ও অন্যদেশের রোম্যান্সময় সৌন্দর্য যেমন আছে, তেমনি ইংরেজি রোমান্টিক কবিতার সত্তার সৃষ্টিশীল অসীম স্বাধীনতা মিলেছে, এই সৃষ্টিধর্মী স্বাধীনতা নিয়েই প্যার্সের 'অনাবাসে'র নায়ক অনন্ত যাত্রায় চলেছে। আবার প্রতীকী কবিতার অবচেতন তাঁর সামগ্রিক মানসিকতা নিয়ে উপস্থিত; শব্দের ব্যঞ্জনায় রহস্যময় অনুভূতিকে পুরোপুরি তুলতে চান, বস্তু সঙ্কেত হয়ে ওঠে, সঙ্কেতময় বস্তুর মধ্যেই অনুভূতি ভাসে; তিনিও বর্ণনা বা নাম করেন না, কিন্তু মালার্মের দেবদূতের আবির্ভাব তাঁর মধ্যে নেই; প্যার্সের চেতন অবচেতন ও বস্তুজগতের সঙ্গে যোগ এতো গভীর যে প্রতীকী কবিতার চৈতন্যের বিচ্ছিন্নতা 'আনাবাসে' লক্ষ্য করা যায় না; এই বিচ্ছিন্নতায়ই র‍্যাঁবো বলেছিলেন 'আমি অন্য' (Je est un autre)। প্রতীকী কবিতায় এই বিচ্ছিন্নতাবোধ বস্তু জগতের পরপারে অসীমের গভীরে নতুনের অন্বেষণ। দেবদূতীয় আবির্ভাব প্যার্সের কবিতায় নেই, এছাড়া প্রতীকী কবিতার সব উপাদান তাঁর কবিতায় আছে। এদিক থেকে ক্লদেলের সঙ্গে প্যার্সের যোগ বেশি।

প্যার্সের কবিতায় মিথ্‌ বাইবেল ফরাশি কবিতার ঐতিহ্য আন্তর্জাতিক মনন ও শিল্পবোধ এক সঙ্গে এসে মিশেছে। চিত্রকল্পের পেছনে যে অনুষঙ্গ ও সঙ্কেত আছে, তাকে বুঝতে গেলে গ্রীক লাতিন ও ফরাশি কবিতার ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। প্যার্স এ যুগে কবির কবি, তাঁর কাছে কবিতা হৃদয়ের গোপন নিভৃতের বেদনার উৎসধারা, এর সঙ্গে মিলেছে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। ব্যক্তিগত জীবনে রাজনৈতিক কূট আবর্তে তাঁর সময় কেটেছে কর্ম-

ব্যপদেশে বাইরে, দেশের বাইরে গিয়েই দেশকে পেয়েছেন তিনি, তাঁর দেশের মহিমাকে চিত্রময় ও ধ্বনিমুখর করে তুলেছেন ক্ষীণ কাহিনীর অনুষঙ্গে। কূটনীতির সতর্ক ভাষার সঙ্গে হৃদয়ের বেদনার সামঞ্জস্য এখানে স্থাপিত। হেলেনীয় সংযম ও বাইবেলের উচ্ছ্বাস স্রোতবান চিত্রকল্পে মন্ত্রের মতো ধ্বনিময়। ফরাশি কবিতায় ইন্দ্রিয়ময় স্বতীক্ষ্ণতা ও কাব্যিক ছন্দস্পন্দ, ইন্দ্রিয়ের রূপান্তরীকরণ, ভাষার বিশুদ্ধ ধ্বনি ও ছবি আমাদের নিয়ত ব্যাকুল করে অতৃপ্তির অনন্ত বেদনায়।

প্যার্সের আধুনিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন অনেকে। অ্যাপোলিন্যার যে অর্থে এই শতকের প্রথম দিকে আধুনিক, সেই অর্থে প্যার্স কখনোই আধুনিক নন, এমনকি এলিঅটের জীবনদর্শনের দিক থেকেও নয়; এবং অ্যাপোলিন্যারের জন্মের অনিশ্চয়তা ও উদ্‌ভ্রান্তি, তাঁর জীবনের নিরাশ্রয়তা ও ব্যর্থ প্রেম আর অকাল মৃত্যুর বেদনা প্যার্সে নেই। অ্যাপোলিন্যারের চমক-লাগানো খেয়ালিপনা, আশালীনতা ও খেয়ালখুশির আবিষ্কার প্যার্সের কবিতায় অনুপস্থিত। অ্যাপোলিন্যার যন্ত্রসভ্যতা থেকে পেয়েছিলেন মোটর গাড়ি অ্যারোপ্লেন ট্রেন, তাঁকে বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে দিয়েছে এগুলি। 'ফভ্‌' ছবির উজ্জ্বলতা, কিউবিস্ট ছবির বাঁকাচোরা রূপ, দিয়াখিলেভর ব্যালের ঘূর্ণি রঙ ও সুর, পার্নাসীয় কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে সুররেয়ালিজমের যৌনচেতনার অবচেতনে রঙিন খেয়ালিপনা, ক্যালিগ্রাম নীতির অভিনবত্ব, আভাঁগার্দদের উদ্‌ভটত্ব অ্যাপোলিন্যারের কবিতাকে সুস্পষ্ট সংহত ও একক করে তুলতে বাধা দিয়েছে। পিকাসোর ছবির সঙ্গেই বরং অ্যাপোলিন্যারের মিল বেশি; ক্ষয়ে-যাওয়া ধসে-পড়া জীবনের বিশৃঙ্খলতা ও আশালীনতা উলঙ্গ হয়ে অ্যাপোলি-ন্যারের কবিতায় প্রকাশিত। এই রকম ভাঙাচোরা জীবনের আশালীনতার যন্ত্রণা প্যার্সের কবিতায় নেই।

তবু প্যার্সের কবিতার ভাষার ধ্বনি, ছন্দের সুর, চিত্রকল্পের অজানা গান নদীর স্রোতের মতো আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়; ভাসতে ভাসতে স্রোতের সুরের গোপন ধ্বনির মন্ত্র শুনি, ভাষার অতলে অন্ধপ্রদেশে নিভৃতে তিনি আলো জ্বালিয়ে দেন, আমাদের মুগ্ধ বিস্ময়কে ইন্দ্রিয় চৈতন্যে দীপিত করতে থাকেন অনবরত, ক্রমশ আমরা এগিয়ে যাই, কখনো আমরা এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারি না; বিরোধকে সঙ্গে করে নিরন্তর যাত্রায় সর্বদাই আমরা অজানার দিকে যাচ্ছি। এই অজানা আবিষ্কার বাইরে ভৌগোলিক দেশের

সীমা বিস্তারে ও অতিক্রমণে, আর ভেতরে র‍্যাঁবোর মতো চৈতন্যের অজানা প্রদেশে। তাই দেশের সংস্কার ও সীমার বাধা পেরিয়ে যাবার মতো আমাদের গুহাহিত চেতনার নিগূঢ় প্রদেশে ইন্দ্রিয়ের আলো জেলে আমরা স্থলভূমি থেকে জলভূমিতে এগিয়ে চলেছি, সচেতন মানুষ এমনিভাবে মৃত্যু পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং তার অনন্ত যাত্রা মৃত্যুকেও ছাড়িয়ে যায় নতুন জীবনের আবিষ্কারে। বাইরের কাহিনীর কাঠামোর মধ্যে স্থূল ঘটনার উল্লেখ আছে; কিন্তু কাহিনীর অন্তরালে সংকেতের ভেতরে সর্বজনীন প্রকৃতিবিজয়ী মানুষের অসীম আর্তি ও আকূতি তাকে ঘরছাড়া করে। এদিক থেকে হোমারের ওদিসি, দান্তের কমেদিয়া ও জয়েসের য়ুলিসিসের সঙ্গে এর যোগ আছে। সুতরাং দুদিক থেকে আলো ফেললে প্যার্সের কবিতার রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশুদ্ধতা যে-কোনো প্রতীকী কবিরই ধ্যেয়, কিন্তু মালার্মের বিশুদ্ধতা প্যার্সের কবিতায় নেই; কারণ মালার্মে ইন্দ্রিয়কে অব্যবহার্য ও নিষ্ক্রিয় করে তুলতে চেয়েছেন, তাঁর বিশুদ্ধতা বরফের মতো শুভ্র ও শীতল, কুমারীর মতো অক্ষতযোনি ও অপাপবিদ্ধ, পুরুষের আলিঙ্গনকে সে ভয় করে। এই শুভ্র বিশুদ্ধতা শূন্যতারই নামান্তর। বোদ্‌লেয়ারের অভিজ্ঞতায় শূন্যতা বাসা বেঁধেছিল, (যদিও এই শূন্যতা অন্য প্রকার)। কিন্তু শব্দের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের শূন্যতার স্পর্শ লাগেনি; মালার্মের শব্দের মধ্যে গাণিতিক বিশুদ্ধতা এনেছেন, কিন্তু বোদলেয়ারের শব্দে সমগ্র ইন্দ্রিয় একসঙ্গে পরস্পরে কথা কয়ে ওঠে সংকেতের অরণ্যে। দৃশ্য বস্তুর মধ্যে অদৃশ্য অজানার ইঙ্গিত আভাসে সহসা উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে, মিস্টিক রহস্যের কণ্ঠস্বর এখানে নিয়ত ধ্বনিত হয় গোপনে; প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু পরস্পরে অজানা ধ্বনির ইঙ্গিতে কথা বলে আলো অন্ধকারের ইশারায়, বস্তু ও আত্মা যেন বাসা পাল্টায়, সেই সঙ্গে গন্ধ বর্ণ ধ্বনি পরস্পরে প্রতিষঙ্গ তৈরি করে। এই ভাবেই প্রকৃতির মধ্যে উপমা সাদৃশ্য ইঙ্গিত ও সঙ্কেত লুকিয়ে আছে। বোদ্‌লেয়ার চেয়েছিলেন সমগ্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুর ভেতরে এই সঙ্কেতময় অজানাকে পেতে। র‍্যাঁবো চেয়েছিলেন তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে জীবনের গভীরে ও জগতের ভেতরে সেই রহস্যকে মাতালের ইন্দ্রিয় বিপর্যয়ের মাধ্যমে আলোকিত করতে, এই চেষ্টা বোদ্‌লেয়ারের মধ্যেও আছে; দুজনেরই লক্ষ্য যন্ত্রণা ও পাপবোধে জড় চিত্তকে সচেতন করে অজানার প্রতি উন্মুখ হওয়া, উন্মুখ হৃদয় বারবার তাই যাত্রাপথের উদাসীন কান্নায় ছিন্ন পাতার মতো ভেসে যেতে চায়। প্যার্স বোদ্‌লেয়ার ও

র‍্যাবোর কাছ থেকে এই পথিকের যাত্রার আনন্দবেদনা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে অজানার অতৃপ্তিজনিত অমৃত পান করেছিলেন। এই যাত্রাপথে তাঁর সহায় হচ্ছে ভেরলেনের ভাষার সংগীতের স্রোতময় কম্পন, যদিও তা গদ্যে।

কিন্তু যাত্রাপথকে মেনে নিলেও দুজনের থেকে প্যার্সের প্রভেদ বিস্তর। রোমান্টিকেরা জগতের কেন্দ্রে এক স্থির বিন্দুর বিশুদ্ধ আলোয় মুগ্ধ হয়েছেন যেমন, তেমনি স্থির বিন্দু থেকে বিচ্ছুরিত বিচিত্রের রঙে আবেশ ও পুলকে ভরে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা' কবিতায় এই পরমেরই দুই রূপ প্রকাশ করেছেন এক সঙ্গে, 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে তুমি বিচিত্র-রূপিণী।' বিচিত্রের বর্ণ গন্ধ ছন্দ সংগীতে পূর্ণ; আবার এই বিচিত্র রূপই 'অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী তুমি অন্তর রূপিণী।' 'অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি'। বলাবাহুল্য, রোমান্টিকেরা পরমের বিচিত্রের রূপেই অধিকাংশ পাগল, আর প্রতীকী কবিরা বিচিত্রকে ছেড়ে আত্মার গভীরে পরমের অসীমকে পেতে চেয়েছেন, পৃথিবীর বস্তু ও উপাদান সেখানে প্রতীকের মতো কাজ করে, তাই বিপর্যয় যন্ত্রণা সেখানে অনিবার্য, এবং এই প্রতীকী কবিতাতেও মাঝে মাঝে বিচিত্রের মধ্যে পরম আবির্ভূত হয়েছে মৌল মুহূর্তের বিস্ময়ে; বোদলেয়ারের 'প্রতিষঙ্গ' কবিতায় এবং র‍্যাবোর 'ইলুমিনাশিও' কবিতাগুচ্ছে এর রূপ ব্যক্ত; কিন্তু মালার্মের কবিতায় কোথাও এই রূপ নেই। রোমান্টিকদের আর এক শাখা শুধুই ব্যক্তির বেদনার রঙিন গান গেয়ে থাকে, সেখানে হেগেলের পরমের কোনো স্থান নেই, এই জাতীয় রোমান্টিকতা ফরাশি কাব্যেই বেশি। প্যার্সের কবিতায় পরম বা আত্মা বস্তুকে অবলম্বন করে সঙ্কেতিত হয়েছে; বস্তু প্রকৃতি মানুষ দৃশ্যমান জগৎ এ সবের মধ্যেই বিশুদ্ধ আনন্দ ও পরম আছে; 'ঈশাবাস্যমিদম্'। তাই প্যার্সের কবিতা প্রত্যক্ষ বস্তুধর্মী, সংক্ষিপ্ত, কঠিন, কিন্তু সঙ্কেতময়। এই সূত্রে মনে হয়, প্যার্সের কবিতায় প্রতীকী কবিতার সঙ্গে রোমান্টিক কবিতার যোগসূত্র রচিত হয়েছে, এই ধারা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বোদলেয়ারের পর থেকে।

অবচেতনের আদিমতা শৈশব ও যৌবনকে মহাব্যাপ্ত অসীমের বিপুল মিলনে নিয়ে যায়, সেই আদিমতাই প্যার্সের কবিতার মিথ্, মনের এই সংশ্লেষণ-ধর্মী ক্রিয়ার সাহায্যে তিনি আদিম জগতে আমাদের নিয়ে গেছেন, যে জগতে বিশালতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুভবের মুক্ত প্রকাশ আমাদের উদ্ভাসিত করে;

অভিযান বা যাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা পৃথিবীর মানুষ সেই সমষ্টিগত অবচেতনার জাতিগত স্মৃতিতে পৌঁছে শৈশবের নিষ্পাপতা স্পর্শ করতে চাই; বিশুদ্ধ চৈতন্য পেতে চাই; এই বিশুদ্ধ চৈতন্যই প্যার্সে'র কাছে বিরাট যুগ, যা একালে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। এই নিষ্পাপতা এখনো প্রাচ্যে আছে, প্রাচ্য দেশে অশিক্ষিত উপজাতিদের মধ্যে মুক্ত জীবনধারায় আছে; তাই প্রাচ্যের মোঙ্গলীয় প্রকৃতির খর রৌদ্রপ্রখর গোবি মরুভূমি ও তার অসীম ব্যাপ্ত নীল আকাশ, সমস্ত প্রান্তর জুড়ে নির্জন নীরবতা 'আনাবাসে' বারবার ছবির মতো এসেছে; এই কারণে পূজা উৎসব ধর্ম প্রভৃতি যুগের আর্কিটাইপের অনুষঙ্গ নিয়ে আসে। মানব জাতির শৈশবের বিস্ময় আনন্দে বিস্ফারিত হতে চাই; তাই প্রুস্ত বলেন, শৈশবের অভিজ্ঞতার পূর্ণতাই সাঙ্কেতিক উপায়ে আদিম মানুষের কাহিনীকে ব্যক্ত হয়েছে এই কাব্যে।

হয়তো কাব্যিক অনুভূতির প্রথম স্তরে প্যার্সকে প্রণোদিত করেছে দুটি চেতনা, 'আনাবাস' যখন রচিত হয়, তার কিছুকাল আগে থেকে ফরাশি সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যে ঔপনিবেশিকতা বিস্তার করছে প্রবল পরাক্রমে, এই বিজেতা জাতির আনন্দ উল্লাস ও অনন্ত বিস্তারের কাহিনী 'আনাবাসের' রাজপুত্রের বিজয়ের মধ্যে আভাসিত, এই রাজপুত্রকেও হয়তো প্যার্স পেয়েছিলেন আলেকজাণ্ডারের পারস্য অভিযানের গৌরবময় ইতিহাসে। আর একটি চেতনাও পার্সের কাব্যে সক্রিয়; রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি তর্ক ও বিচার থেকে তাঁর মন মুক্তি চেয়েছিল কৈশোর সেই আদিম নিষ্পাপ বন্য জীবনের অসীম উপলব্ধিতে। হয়তো এই দুটি চেতনাই প্যার্সকে এই কাব্য রচনায় প্রণোদিত করেছে; কিন্তু কাব্যরচনার এই ভিতকে ছাপিয়ে বিশ্ববোধের সামগ্রিকতা মহাকাব্যিক অনুভূতি নিয়ে আসে। গোবি মরুভূমির সূর্যদগ্ধ প্রকৃতির সঙ্গেই পলিনেসীয় দ্বীপের গ্রীষ্মকালীন ঘাসের সবুজ নেচে ওঠে; সমুদ্রের শব্দ ও ধ্বনি উজ্জীবন মন্ত্রের মতো সম্মোহিত করে আমাদের। এখানে পুব ও পশ্চিম স্বপ্নের দেশে মিশে গেছে; অতীতের ধ্বংস ও চিরকালীন মানবতা রূপ পায়। আমরা আত্মায় বা অবচেতনায় ঘোড়ায় চড়ে অনন্ত যাত্রায় দিগ্বিজয় করে চলেছি বিশুদ্ধ চৈতন্যকে পাবো বলে, তেমনি কাহিনীর মধ্যেও দেখি অশ্বারোহী রাজপুত্র তার শৌর্যবীর্যে অদম্য কৌতূহল ও বাসনা নিয়ে আদিম বিস্ময় ও সৌন্দর্যে নিরন্তর দিগ্বিজয় করে চলেছে; এমনিভাবে জ্ঞানে প্রেমে শৌর্যে সে হয়ে উঠছে, কৌতূহল কোথাও তাকে থামতে দিচ্ছে না; নিয়ত হয়ে-ওঠার মধ্যেই তার

পূর্ণতা ও সার্থকতা। সম্ভবত প্যার্স এখানে বের্গসঁর দার্শনিক প্রত্যয়ের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ; কালের ধারায় আমাদের চৈতন্য ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠছে, কর্মের মধ্যে এই চৈতন্যের মুক্তি ও স্বাধীনতা ও বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা, একান্ত নতুনের নিয়ত বিস্তার ঘটছে সামনের দিকে, এই নতুনের মধ্যেই 'এলাঁ ভিতাল' বা সৃষ্টিধর্মী বিবর্তন, যে গতিবাদ আকাশের গ্রহনক্ষত্রকে রূপান্তরিত করে, বস্তু ভেঙে গতি বার করে, একদিন নশ্বরতা অস্বীকার করে মৃত্যুর রাজ্য অধিকার করবে। এ দুটি সুরকেই প্যার্স এখানে মিলিয়ে দিয়েছেন।

এই দুই সুর কাহিনী ও অবচেতনায় শুধু নয় ; লিরিক ও মহাকাব্য এখানে মিলে গেছে, যেমন মিলিয়েছেন উন্‌গারেত্তি ও মন্তালে ; নিধাসময় কাহিনী হিসাবে যখন পাড় তখন 'আনাবাসে'র নায়ক যে-কোনো রাজপুত্র, অতীতে প্রাচ্য দেশে অভিযান করেছে সে, আদিম যুগ থেকে ব্রোঞ্জ ও ইস্পাতের যুগে তার পদার্পণ, তাই পাথর সীসা ইস্পাত ব্রোঞ্জ স্থির শক্ত কঠিন বস্তু বাতাস ও অদৃশ্য শক্তির মধ্যে রূপ পাচ্ছে ; এই রাজপুত্রের সঙ্গে আছে একজন নাবিক ও একটি নারী চরিত্র। রাজপুত্র যাযাবর পথিক যোদ্ধা, এই রাজপুত্রই স্বয়ং কবি, আইননির্মাতা, নগরপ্রতিষ্ঠাতা ও বিজেতা ; জীবনকে স্বীকার করে শুভ মেনে নিয়ে হৃদয়ের অনন্ত ও অতল প্রদেশকে জয় করে চলেছে সে অনবরত ; সেখানে নির্দিষ্ট দেশ ও কাল নেই। এখানেই ওদিসি ও ইনিদের সঙ্গে আধুনিক যুলিসিস মিলে যাচ্ছে। হয়তো তাৎপর্যের ক্ষীণসূত্রে জেনোফোনের 'আনাবাসিসে'র সঙ্গে মিলও এই জায়গায় ; কুরুস্ সিংহাসনে বসেছেন তাঁর ভাই আর্তাজারাগজেসের কাছ থেকে রাজ্য পেয়ে, তারপর মৃত্যু হলো তাঁর, মৃত্যুর পরই গ্রীক অভিযানের শুরু। এখানে রাজ্যজয় গ্রীক অভিযানের শেষ কথা নয়, দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়ে অনন্ত যাত্রাই তার লক্ষ্য। ওদিসি বা জেনোফোনের 'আনাবাসিসে' পথিকের অনন্ত যাত্রা প্রতীকিত হয় নি ; বস্তু-ঘটনা-দৃশ্য প্রত্যক্ষ, এবং অলৌকিক রহস্য ও মায়ায় বিস্তৃত ও সার্বভৌমিক ; প্যার্সের কবিতায় কাহিনীর নিশ্বাসের সঙ্গে চলমান ছবির স্রোত ও প্রতীক সংগীতের সুরে একই সঙ্গে অভিযানের মতো এগিয়েছে। এই বিরোধী চিত্রকল্পের স্রোত যখন হৃদয়ে স্মৃতির ভেতর দিয়ে সামগ্রিকতা পায়, তখনই এই কাব্যের আধুনিক টেকনিক সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। উপমা, সংগীত, ছবি ইন্দ্রিয় রূপান্তর ভাষার সামঞ্জস্য ও ইম্‌প্রেশনধর্মিতা, কাহিনী লিরিক মহাকাব্য, চেতন অবচেতনের মিলনে

সামগ্রিক বোধের তীক্ষ্ণতার মধ্যেই প্যার্সের আধুনিকতা, এই টেকনিক বা কাব্যের উপাদানই পুরনো বিষয়কে গুণগতভাবে পরিবর্তন করেছে এবং আধুনিক করে তুলেছেন তাকে। আমাদের অস্তিত্বকে আলোকিত করে রূপান্তরের মাধ্যমে সত্তায় উর্ধ্বায়িত করতে চেয়েছেন প্যার্স। 'আনাবাস' শুরু ও শেষ হয়েছে গান দিয়ে, প্রথমে গানের পর কাহিনী বা অনন্ত যাত্রার প্রতীকিত স্বপ্নময় বর্ণনা, এবং এর প্রত্যেকটি অংশে ক্রমপারম্পর্য ও অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ব্রোঞ্জ পাতার নীচে অশ্ব শাবকের জন্ম, প্রকৃতি ও প্রাণের শক্তি ও তেজ একই সঙ্গে প্যার্সের কাছে গ্রহণীয়। পরবর্তী বাক্যে অশ্বশাবক বড়ো হয়ে উঠেছে, তারই পিঠে চড়ে আগন্তুক এসেছে অভিজ্ঞতার তিক্ত ফল নিয়ে; কিন্তু কষ্টে অর্জিত অভিজ্ঞতায় অন্য প্রদেশের সংবাদ কৌতূহল জাগাচ্ছে; তার পরই কবি আহ্বান করছেন নিজের বিশুদ্ধ সত্তাকে কন্যা বলে; প্রখর সূর্যদাহন মৃত্যুর মতন, আগন্তুক মৃত্যুকেও বশীভূত করেছে। এই আগন্তুক শুধু সংবাদ নয়, হাসি ও আনন্দ এবং সম্ভাবনা এনেছিল। আগন্তুকের সঙ্গে যাত্রাপথে কবিও চলেছেন এবার, বিভিন্ন প্রদেশের বাতাস অনুভব করছেন তিনি, নতুন দেশ জয়ের আনন্দ তাঁকে পেয়ে বসেছে; আবার বিশুদ্ধ আত্মাকে আহ্বান করেছেন তিনি। বিশুদ্ধ আত্মার অনন্ত সম্ভাবনার সঙ্গে সীমিত মানুষের সংকীর্ণতার ব্যথা প্রকাশ পাচ্ছে। তাই হয়তো অতীতে আগত আগন্তুকের স্মৃতির কথা পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত। এর পরই বিরোধী চিত্রকল্প ও ছবি, যা দান্তে ও এলিঅটকে একই সঙ্গে স্মরণ করায়, আগুন ও গোলাপ, বজ্র ও বাঁশি গানের উপহার এগুলির সহাবস্থানের মধ্যেই পরিপূর্ণ জীবন, এদের গ্রহণ করলে মানুষের গতিপথ সহজ হয়, আগন্তুক এগুলিকে নিয়ে অনন্তযাত্রায় চলেছে। আবার তাঁর কাঙ্ক্ষিত বিশুদ্ধ সত্তাকে আহ্বান জানাচ্ছেন কবি, অভিবাদন জানাচ্ছেন তাকে, নতুন করে পেয়ে হয়ে উঠবার জন্যে। 'আনাবাসে'র সমস্ত কাহিনী এখানেই বিবৃত।

প্রকৃতি, প্রাণিজগৎ, আগন্তুক, বিশুদ্ধ চৈতন্য একসঙ্গে চলমান ছবির মতো এসেছে এবং মিলে গেছে পরস্পরে, তারপর বিরোধী ছবি আমাদের মনকে সচকিত করে ও পূর্ণ করে তোলে। দৃষ্টি-ইন্দ্রিয়কে প্যার্স চোখের সামনে তুলে ধরেন, সবুজ পাতা সূর্যের তাপে কঠিন ও ব্রোঞ্জের রঙ ধারণ করেছে, ছবির এই স্থির কঠিনতা প্যার্সের 'বাতাস' কাব্যে সর্বত্র। প্রতিটি বাক্যের মধ্যে কাহিনী ও মনের অগ্রগতি ধরা পড়েছে, সব বাক্য শেষও হয় না।

কাহিনীর ধারার সঙ্গে নিজের মনের ভেতরে সত্তার কাছে প্রশ্ন তোলেন। ডানার বিস্রস্ততায় পালক আনন্দ উপভোগ করছে, ছবির মধ্যে স্পষ্ট রূপ ও গতি একই সঙ্গে; পাখির ডানায় অনন্ত যাত্রার ইঙ্গিত, আর পালকের আনন্দে সৌন্দর্যবোধ একই সঙ্গে মূল কাহিনীকে ব্যক্ত করছে। আগন্তুক ও যাত্রার সঙ্গে পাখির ডানার বিস্রস্ততা ও পালকের আনন্দ এক সঙ্গে গ্রথিত, গতিবান ছবির উজ্জ্বলতা এই চিত্রকল্পে স্পষ্ট। মূল কবিতার ধ্বনির সংগীত এই ছবিকে আরো স্পষ্ট করে (la plume savante au scandale de l'aile !)

এর পরেই দুই স্তরের কাহিনী শুরু হয়েছে: ১. নগর প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে শহরের প্রান্তে যোদ্ধা উপস্থিত। সমুদ্র, তৃণহীন পৃথিবী, নিষ্কলুষ আকাশের নীচে নামহীন সূর্যের মধ্যে মানুষের নিহিত শক্তি নিয়ে অসীম যাত্রা; জনশূন্য বাজারে আত্মার বিশুদ্ধ বাণিজ্য। ২. শহরের পরিকল্পনা ও সীমানা নির্ধারিত। সীমানা নির্ধারিত হবার পর সূর্য লবণ ও তৃষ্ণা নিয়ে নারীর জন্যে কামনাময় প্যাশন জাগছে যোদ্ধার হৃদয়ে; রানীর ও তার কন্যার পোশাক মাড়িয়ে চলেছে বিজেতা; খোসা-ছাড়ানো ফলের সত্তেজ পুষ্টি লাভ করছে সে; জনশূন্য বাজারের পর বাস্তু দেশ জেগে উঠছে; বাস্তু দেশের মধ্যে মহত্তম নীরবতা। ৩. চতুর্দিকে শস্যপূর্ণ পৃথিবী থেকে সুমধুর গন্ধ উঠছে, রমণীর চিৎকারের মতো নদী বয়ে যায় সামনে, মৃত্যুকে পেছনে ফেলে রোগমুক্ত হয়ে ভেড়ার চামড়ার মতো অতীব সুন্দর পৃথিবীর অন্বেষণে মানুষের চিরন্তন যাত্রা একমাত্র কাম্য; একথাই ভবিষ্যদ্ দ্রষ্টা বলেছেন; এই তৃষ্ণার পূর্ণতা চাই। ৪, শহর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, চারদিকে পাথর ও রোদ্র, প্রখর সূর্যের নগ্ন আগুন চতুর্দিকে বিস্তৃত, শহরের নিবিড় দৃশ্য ও মানুষের বিচিত্র বর্ণনা; প্রতিষ্ঠা-উৎসবে মিলনের আনন্দ। ৫. শহর প্রতিষ্ঠার পরই নতুন দেশে যাবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা; পুরনো শহরের কুকুরের বশ্যতার চিৎকার আগুন হয়ে জ্বলছে; তাই মুক্তি চাই। স্বপ্নের রাত্রির জলে চোখ স্নান করবার জন্যে উন্মুখ; নক্ষত্রগ্রহে অশ্বারোহী সৈন্যদল যাত্রা করছে তাকে অন্তপ্রান্তে নিয়ে যাবার জন্যে। ৬. এই প্রতিষ্ঠিত বাক্যে কিছুকালের জন্যে শান্তি, বাতাস আশ্রয় পেয়েছে, গৃহে গৃহে জীবনের প্রাচুর্য ও শোভা। স্ত্রীদের পরিচারিকাদের নিয়ে ভাগ্য ও প্রতিষ্ঠা। ৭. নতুন অভিযানের উন্মাদনা আসছে; সমস্ত ঘাসের পৃথিবী যেমন পুরনো খড় থেকে আলো নেয়, নির্জন বৃক্ষের সবুজ থেকে আকাশ যেমনি রস টেনে নেয়, তেমনি

ঘাসের মতো রস টেনে জীবনের বিস্ময়ে আবার ব্যাপ্ত হতে চাইছেন। ঘোড়ার সুগন্ধে অর্থাৎ গতির জন্যে আত্মা অন্ধকারাচ্ছন্ন; ঘোড়ার মুখের ওপর পাখির ছায়া গতির চঞ্চলতাকে দ্যোতিত করে, এই গতিই শেষ পর্যন্ত নীরবতার দিকে ওঠে। (এখানে রোমান্টিক ও প্রতীকী কবিতা মিলে গেল একসঙ্গে) ৮. বেগবান জলোচ্ছ্বাসের মতো সঙ্গীরা এগিয়ে যাচ্ছে বালির ওপর দিয়ে: শুষ্ক বৃক্ষ, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অশনি, এগুলি ছাড়িয়ে তৃণে গুল্মে আচ্ছাদিত দেশ আবিষ্কারে উন্মুখ; ভারতীয় রসালো ফলের বীজ উন্মাদিনী শক্তি পেতে চায়। ৯. তরুণী ভূমির সুগন্ধির জন্যে যোদ্ধা এসে পৌঁছেচেন। তরুণী প্রকৃতির মতোই নারীর দেহে কালো আঙুরের গেঁজে-ওঠা উত্তেজনার তেজ ঢুকিয়ে দিয়েছে রাজপুত্র; নারীর গর্ভে আনন্দ গড়ে তুলেছেন কবি। স্বপ্নের ভেতরে পাতার আনন্দের মতো নতুন দেশের আশীর্বাদ নেমে এসেছে, আলোয় সব খোলা; যৌন আবেগের সঙ্গে পৃথিবীর উপলব্ধি ঘটছে এই নতুন দেশে। ১০. রাজপুত্র এই নতুন দেশে অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত; চারদিকে জীবন্ত বস্তু; মৃত্যু জীবনে রূপান্তরিত, জীবনের আনন্দের উৎসব ও অনুষ্ঠান, মরা জায়গায় ঝর্নার আবিষ্কার, এমনি করে বিশুদ্ধ চৈতন্যে এসে পৌঁছেচে রাজপুত্র। এই অংশে স্থানের ও মানুষের বিচিত্রতা ও বিশালতা মহাকাব্যের পূর্ণতা গড়ে তুলেছে। এতো বিচিত্র মানুষের ছবি কল্পনায়ও আনা যায় না; সেই সঙ্গে সর্বজনীন আইন, নিয়মনীতি কাজ করছে; স্থলভাগ অধিকৃত হবার পর এখন নৌযাত্রায় যোদ্ধা উৎসুক। এমনিভাবে আদিম পৃথিবীর সভ্যতার সঙ্গে পাথর ইস্পাত ও ব্রোঞ্জের সভ্যতা, যে সভ্যতায় গতি হলো ঘোড়া, ঘোড়ার গতির সভ্যতার সঙ্গে জলের গতির আধুনিকতা মিশে গেছে। আধুনিক মন আত্মার নারকীয় দংশনে যেমন যন্ত্রণাদিগ্ধ, তেমনি বিশুদ্ধ চৈতন্যে সে নিত্য উৎসুক ও গতিমুখর; এই গতিমুখর বিশুদ্ধ চৈতন্যকেই স্মৃতির ও ইম্‌প্রেশনে, সংহত ও লাফানো ভঙ্গিতে, অদ্ভুত ছবির সাহায্যে প্যার্স প্রকাশ করেছেন 'আনাবাসে'। হয়তো এই কারণেই এলিঅট প্রলুব্ধ হয়েছেন এই কাব্য অনুবাদ করতে। বাতাস, সমুদ্র, লবণ, ঝড়, আকাশ, সূর্য, বিস্তৃত ভূমি, এই সব শব্দ প্যার্সের কাব্যে বার বার এসেছে; পৃথিবীর আদিমতম শক্তির তেজ এসব বস্তুর মধ্যে লুকিয়ে আছে, এগুলিকে উদ্বোধন করে সেই শক্তিকেই প্যার্স পুনরায় আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে চান; কেননা এই আদি ও আদিম নিষ্পাপ শক্তি থেকে যন্ত্রসভ্যতায় আজ আমরা বহুদূরে বিচ্ছিন্ন।

শেষ গানে মৃতকে অতিক্রম করে অনন্ত মহাদেশে যাবার মহৎ মাধুর্য বরণ করে নিয়েছেন তিনি। ঘুঘুপাখির গাছের নীচে ঘোড়া থেমে আছে, বিশুদ্ধ সংগীত তিনি বাজালেন বাঁশিতে; সংশয় ও আশা জাগছে, যে জলে তিনি যাত্রা শুরু করবেন, সেই নদীর দুই তীর কি বিশ্বাস ভাঙবে? এই সংশয় পরের বাক্যে মরে যাচ্ছে; সকালে সজীব পাতার গৌরবের রূপ; সবুজ পাতার আনন্দেই যাবেন তিনি। তাই ফরাশি রোমান্টিক কাব্যের বিষাদ নেই, সকালের আগে উঠে পুরনো গাছের সঙ্গে মিলনে প্রাজ্ঞ বিদায়ে তিনি যাত্রা করবেন, তাঁর চিবুক শেষ বিদায়ী তারায় ন্যস্ত, দ্রুত চঞ্চল আকাশে তিনি বিশুদ্ধ বিরাট জিনিস দেখেন, এই বিশুদ্ধ জিনিস আনন্দ উন্মোচিত করে। বিদায়ী তারায় চিবুক রেখে আকাশে বিশুদ্ধ জিনিস দেখার মধ্যে বিশালতা ও ঊর্ধ্বায়ন একসঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে। এই উন্মোচিত আনন্দেই মৃতের জীবনে শান্তি আনবে; সহধর্মী কবিদের কাছে মহৎ সৌন্দর্যের গান ধ্বনিত হবে, হয়তো এই গানের কথা কেউ কেউ জানে। এই বিশুদ্ধ আনন্দের সংগীতই প্যার্স আমাদের শুনিয়েছেন এই কাব্যে।

পাবলো নেরুদা

'আমরা যার খোঁজ করছি সেটাই কবিতা হোক ; হয়তো বাধা ব্যবহারে জীর্ণ, যেমন এ্যাসিডে, ঘামে ও ধোঁয়ায় ভেজা, লিলি ও পেচ্ছাবের গন্ধ, ব্যাবসার মধ্যে আমাদের চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়', যেভাবে আমরা আইনের ভেতরে কিংবা আইনের বাইরে বাস করছি।

অবিশুদ্ধ কবিতা হলো আমাদের পরিহিত পোশাকের মত অথবা শরীরের মতো ; ঝোলের দাগে চিহ্নিত, আমাদের লজ্জাজনক ব্যবহারে বিনষ্ট, আমাদের ত্রিবলী, জাগরণ ও স্বপ্ন, পর্যবেক্ষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী, ভালোবাসা ও ঘৃণার ঘোষণা, রাখালিয়া কবিতা ও পশু, মুখোমুখি সাক্ষাতের ধাক্কা, রাজনৈতিক আনুগত্য, অস্বীকার ও সন্দেহ, স্বীকৃতি ও যন্ত্রণা।

প্রেমের কবিতার পবিত্র নিয়ম, স্পর্শ, গন্ধ দৃশ্য স্বাদ শ্রবণের আদেশ, ন্যায়ের জন্যে প্যাশন, যৌন আকাঙ্ক্ষা, সমুদ্র গুনন, ইচ্ছা ভরে ত্যাগ করছে এবং কিছুই গ্রহণ করছে না, প্রেমের পক্ষে বস্তুর গভীর অন্তর্ভেদ, বিশুদ্ধ কবিতা পায়রার নখের দ্বারা বিনষ্ট, বরফে ও দাঁতে চিহ্নিত, হয়তো আমাদের ব্যবহারে ও ঘামের ফোঁটায় সুন্দরভাবে দংশিত। বিশ্রামহীনভাবে বাদ্যযন্ত্র যতোক্ষণ না বেজে চলেছে, যতোক্ষণ না এই বাদ্যযন্ত্র আমাদের এর সান্ত্বনাদায়ী বাহুরূপ সৃষ্টি করছে, এবং বন কণ্টকতম লালিত্য দেখাচ্ছে, যে লালিত্য যন্ত্রের গর্বে রূপ পেয়েছে। ফুল, জল এবং গমের শীষ একটি মূল্যবান সামঞ্জস্য পারস্পরিকভাবে সৃষ্টি করছে, স্পর্শানুভূতির লোভনীয় আবেদন।'

বলা বাহুল্য, 'অবিশুদ্ধ কবিতা'র ঘোষণাপত্রে বস্তুজগৎ ও কবিতার সম্পর্ক বারংবার প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে লিলি ও পেচ্ছাবের গন্ধ একসঙ্গে মিশে গেছে, এই বিরোধ ও সমন্বয় ফরাশি কবিতায় বোদ্‌লেয়ার থেকে শুরু, কিন্তু বোদ্‌লেয়ার যা অনুভব ও প্রকাশ করেছিলেন পরবর্তীকালে বিশুদ্ধ কবিতায় তা হারিয়ে গেছে। ভালেরিকে যদি বিশুদ্ধ কবিতায় প্রধানতম ও সার্থক প্রবক্তা গণ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো তাঁর কবিতার বস্তু আমাদের বাস্তব জগৎ থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে, যে বস্তুগুলি দেখছি এবং অনুভব করছি এগুলির বস্তুসত্তা আমাদের কিছুই বিচলিত করে না, বস্তুর সাহায্যে আমরা

সংকেতে ভুলতে থাকি, এবং এই সংকেতের মধ্যে তাঁর দার্শনিক চিন্তা ও অনুভূতি কিভাবে সক্রিয় তাকেই লক্ষ্য করি, আসলে বস্তুর চেয়ে কবির মন সংকেতিত বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত। বাহ্য জগতে ভালেরিও হত্যা ও চুম্বন একসঙ্গে দেখতে পেয়েছেন (La caresse et le meurtre hes'itent dans leure mains) জনতার মধ্যে, কিন্তু এগুলি তাঁর লক্ষ্য নয়, বরং এদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তাঁর নার্সিসাস উদ্বিগ্ন; কারণ এরা জলে নির্জনতাকে তাদের স্থবির উপস্থিতি দিয়ে বিনষ্ট করছে. সেই বিশুদ্ধ নির্জন জলের গভীরে নার্সিসাস একাকী থাকতে চায়, তাই তাঁর অনুভূতিতে একথা প্রকাশ পায় যে জনতার উন্মত্ত নির্জনতা ভেড়ার মতো নির্জনতাকে মাতৃষিত করছে এবং প্রতারিত করছে। (Leur folle solitude, a' le'gal du sommeil,/peuple et trompe l'absence) এই যে দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্ব থেকে ভালেরি কখনো মুক্ত হতে পারেন নি। বিশুদ্ধ চিন্তা কবিতার ক্ষেত্রে এলে নষ্ট হয়, অথচ বিশুদ্ধ চিন্তা বা প্রশান্ত নির্জনতাই কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু দুয়ের সংস্পর্শে কোনোটাই স্থির থাকে না; কারণ মানুষ যতোই নার্সিসাসের মতো জলের দিকে প্রশান্তি ও নির্জনতার জন্যে স্থির তাকিয়ে থাকুক, জলে বাতাসের ঢেউ উঠবেই এবং সেই সঙ্গে শান্ত নির্জনতা নষ্ট হচ্ছে মালার্মের 'রাজহাঁস' কবিতার দ্বন্দ্ব এবং পরমও কবিতার শব্দের ছন্দেই স্পর্শেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে এখানে সুন্দরতরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যদিও মালার্মের চেয়ে দ্বন্দ্ব এখানে মারাত্মক।

ভালেরির এই মনোভাব আরো সুন্দর লক্ষ্য করা যায় 'পা' কবিতাটির মধ্যে। তার 'পা' কবিতাটির মধ্যে প্রেম ও কবিতার প্রেরণা দুইই প্রকাশ পেয়েছে। পা কবির কাছে নীরবতার শিশুসন্তান, পবিত্রভাবে ও ধীরে স্থাপিত হয়, এই পা নিঃশব্দে ও বরফের মতো কবির উদ্‌বাস্ত শয্যাপ্রান্তে যাচ্ছে, এবং কবিকর্মকে সক্রিয় করছে, এই কবিতা সৃষ্টির ব্যাপারে এত মধুর যে মনে হয় এ হচ্ছে আবার হচ্ছে না অর্থাৎ সত্তা যুক্ত আবার যুক্ত নয়। সুতরাং ভালেরি কবিতার প্রেরণা নীরবতার মধ্যে আসতে দেখেছেন এবং বস্তুজগৎকে নীরবতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন; এমনিভাবে জগৎ ও চিন্তার মধ্যে এই নীরবতার পদযাত্রার জন্যে ভালেরি সর্বদা শশব্যস্ত। নীরবতা এলে এবং নীরবতার মধ্যে গেলেই তাঁর কাব্যচিত্ত তৃপ্তি পায়। কিন্তু বস্তুজগতে তা হতে পারে না বলেই দুই বৈপরীত্যে তাঁর চিত্তে দ্বন্দ্ব বাধে, এবং এই দ্বন্দ্ব অনেকটা প্লেটোর মতো, 'আগুনের শিখায় তৈরি হে ছায়ার রাজা' (O roi des ombres fait de

flammes !) আগুনের শিখা পরম, তার থেকে ছায়া অর্থাৎ বস্তুজগৎ, তাতেই সমস্ত কিছু ছেয়ে আছে, মন আকর্ষণ করছে এবং ভোলাচ্ছে, কিন্তু এতো পরম নয়, তাই দ্বন্দ্ব।

এই রকম আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব থেকে নেরুদার কবিতা গড়ে ওঠেনি। যদিও স্বীকার করতে বাধা নেই ভালেরির এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির রঙিন কবিতা আমাদের চৈতন্যের গভীর স্তরে দ্বন্দ্বজাত বেদনা তৈরি করে ও মথিত করে, আনন্দ দেয়। কিন্তু অন্যের কাছে এই বিশুদ্ধ কবিতা পাণ্ডুর হয়ে গেছে, হয়ে গেছে বলেই বস্তুজগতের প্রতি মনোভাব গভীরতর হয়েছে, হয়তো এই প্রতিক্রিয়াতেই অবিশুদ্ধ কবিতার জন্ম। রিল্‌কে বা ভালেরির দ্বন্দ্ব পরম ও বাস্তবতার সঙ্গে; আর নেরুদার দ্বন্দ্ব বস্তু জগতের মধ্যে, বস্তুজগতে মানুষের পূর্ণতা পেতে হলে এই বিরোধে সমন্বয় করে এগোতে হবে, তাই লিলি ও পেচ্ছাব একসঙ্গে মেশে। নেরুদা যতোক্ষণ পর্যন্ত এই বিরোধকে স্বীকার করেছেন, ততোক্ষণই তাঁর কবিতা সার্থক, এবং যেখানে একমুখীন হয়েছেন, বক্তব্যে উচ্চকিত হয়েছেন, সেখানে তাঁর কবিতা আমাদের ভাবায় না, মাতায় না, কোনোদিকে নিয়ে যায় না।

নেরুদার কবিতার বিভিন্ন স্তর আছে, ১৯২৫—৪৫ এর মধ্যে Residencia en la tierra (পৃথিবীতে বাসস্থান) ১৯২৫—৩১ এর প্রথম ভাগ, ১৯৩১—১৯৪৫ এর দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৫০ এ Canto General (সাধারণ সংগীত) ১৯৫৪—৫৭এ Odas elementales (আদিমপ্রথম ওড) ১৯৫৯ এ Navegaciones Y Regresos (ভ্রমণ ও গৃহে ফেরা) ১৯৫৮ সালে Estravagario (খেয়ালখুশির বই) ১৯৬০ সালে Cien sonetos de amor (একশটি প্রেমের কবিতা)

তাঁর কবিকীর্তি মূলত 'সাধারণ সংগীতে'র মধ্যেই বিধৃত, কিন্তু এর বিবর্তন আছে। তিনি যখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলেন, পৃথিবীতে তখন কিউবিজম, ফিউচারিজম, দাদাইজ্‌ম, আল্‌ট্রাইজম ক্রিয়েশিনিজম্ ও সুররেয়ালিজমের জয় জয়াকার। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য কাব্য আদর্শও বিশ্ব যুদ্ধের পর ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে, প্যারিস বার্লিন আমেরিকার সংস্কৃতি দক্ষিণ আমেরিকায় নতুন কোনো প্রেরণা জোগাতে পারছে না, কারণ সকলের মধ্যেই পররাজ্য আগ্রাসী মনোভাব প্রকট। তৃতীয়ত, সেই কারণেই বাইরের প্রভাব প্রতিপত্তি বর্জন করে নিজের দেশের প্রকৃতি মানুষ ইতিহাস সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিকে মুখ তিনি ঘোরাতে

বাধা হলেন। এবং এই মনোভাব নেরুদার পূর্ববর্তী কবি রুবেন দারিও-র মধ্যে পাওয়া যায় না, তিনিও আধুনিতার একজন ঋত্বিক, স্থূল রোমান্টিকতার মধ্যে আদর্শান্বিত ও সর্বজননীন শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, গ্রীক ও ল্যাটিন জগৎকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন, ভাষায় ছন্দে চিত্রকল্পে টেকনিকের বিশুদ্ধতার পরিপূর্ণতা আনতে চেয়েছেন, এই পর্বের মধ্যে কবির ব্যক্তিগত রুচি প্রকাশিত। কিন্তু এ সবই বাস্তবতা থেকে অপসৃত, প্রাত্যহিক জীবনের স্পর্শ এর মধ্যে নেই, অথবা সৌন্দর্যের জন্যে কামনা ও রক্ত মাংসের বিরোধকে তীব্রতর করে তার অর্থ নিষ্কাশন করবার চেষ্টা করা হয়েছে, নশ্বরতা ও জীবনের অর্থ সন্ধান করা হয়েছে। ১৯২০ সালের নেরুদা যখন এলেন তখন আধুনিকতার এই জগৎ দূরে সরে গিয়ে প্রাত্যহিক জীবনবোধ স্পষ্টতর হচ্ছে। মার্কিনী সাহিত্য হুইটম্যানের মধ্যে যে রূপ পায় সাহিত্য হিসাবে এর মূল্য কম, এবং পো-কেই সার্থক শিল্পী হিসেবে গণ্য করা যায়। আধুনিক যুগে পাউণ্ড কথ্য ভাষা, নির্দেশাত্মক বাক্য, ইউরোপ ও আমেরিকায় বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে একটা সামগ্রিকতা আনতে চাইলেও জীবনের সঙ্গে তাঁর যোগ কম; সাহিত্যিক আদর্শই তাঁর কাম্য, স্টিভেন্সের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা বলা যায়, যদিও তিনি আধ্যাত্মিক উপায়ে সত্যের গভীরে পৌঁছুতে চেয়েছেন। এবং এলিঅটকে মার্কিন কবি বলা যায় না। সুতরাং মার্কিনী সাহিত্যেও নেরুদার কবিতা নূতন ভাবনা এনেছে। এই ভাবনার মূলে একদিকে যেমন মাটি প্রকৃতি জীবন ও স্বদেশ, অন্যদিকে ভাষার মধ্য দিয়ে স্পেনের ঐতিহ্য—তার সাহিত্য রীতি ও প্রেরণা এসেছে। সুতরাং আমেরিকা ও স্পেন এক সঙ্গে মিশেছে, সেই সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর জীবনবোধ।

রোমান্টিকতা থেকে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মুক্তি আধুনিক রূপ ও আধুনিকতার স্বরূপ নিয়ে এসেছে কাব্যে। প্লেটোর মতোই ভাবতেন এঁরা, সময় হচ্ছে শাশ্বতের চলমান চিত্রকল্প। ব্যক্তির হৃদয়ে জগতের প্রতিভাস পড়ে, জগৎ রূপান্তরিত হয়, হৃদয়ে রূপান্তরিত জগৎই কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত। তারপর মাঝে মাঝে এই জগৎ হারিয়ে যায়, ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা ও বাসনা জগদাতীতে গিয়ে পৌঁছয়; জগৎ ও জীবনের সংঘর্ষে উঠে-আসা সমন্বয় আর আমরা দেখতে পাই না। রোমান্টিক ও প্রতীকী কবিতায় এই ব্যক্তির স্বরূপই লক্ষ্য করি আমরা। এই ব্যক্তির সঙ্গেও তার বাসনার বিরোধ আছে। হেগেলের দর্শনে চিন্তার আবির্ভাব হয় প্রথমে; এই চিন্তা বস্তু বা

প্রকৃতির মধ্যে আসে, প্রকৃতি থেকে সে যাত্রা করে পরমে। চিন্তা বা মন থেকেই প্রকৃতির জন্ম। মানুষের চিন্তা তার ক্রিয়ায় প্রকাশ পায়, মানুষের ক্রিয়ার মধ্যেই ইতিহাস, এই চিন্তার মধ্যে মন কাজ করে। এই মনের দুটি রূপ, এর একটি নিজের ভেতর থেকে উত্থিত হয় এবং জগতে বাস করে, অন্য রূপটি জগতের বাইরে অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারকে ধারণা করতে পারে। হেগেল-প্রভাবিত রোমান্টিক ও প্রতীকী কবিতায় মনের দুই লীলাই ব্যক্ত।

বের্গস'র কাছে ইতিহাসের বোধ নেই, আছে কালের বোধ; এই কালের বোধ নিহিত আছে ব্যক্তির চৈতন্যে; পরিবর্তন নয়, অগ্রগতিই তার লক্ষ্য; এই কালের বোধের মধ্যে তিনটি কালই অবিচ্ছেদ্যভাবে বিধৃত; অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগেই এই বোধ নিয়ত হয়ে উঠছে, নতুনের নিরন্তর বিস্তার ঘটছে, এই হয়ে-ওঠাই হলো সময়, এই সময়ই আমাদের স্বাধীনতা এনে দেয়; এমনিভাবে জগৎকে ও সময়কে ব্যক্তি উপভোগ করে — হয়ে ওঠে তার মানসিক জগতে; এখানে বস্তু জগৎ ও বুদ্ধি থাকলেও তার কোনো স্বতন্ত্র রূপ নেই, সংবেদন ও ইম্প্রেশনের মধ্য দিয়ে সে শুধু উপভোগ করে, বেড়ে ওঠে, হয়ে ওঠে, সরে সরে যায়, অনন্ত যাত্রায় পথ চলে, এই অনন্ত যাত্রায় ভগবান ব্যক্তির সঙ্গে একাত্ম। জগদতীতের দিকে রহস্য উঁকি দিলেও তার স্বরূপ জানিনা। দেহের কেন্দ্রে ব্যক্তির হৃদয়ই অনন্ত সম্ভাবনা, বস্তু বেগে গতিতে রূপান্তরিত।

ক্রোচের কাছে শিল্প আর ইতিহাস এক, ইন্দ্রিয়জনিত আনন্দ নয়, রূপ গঠন ও উপভোগের আনন্দ নয়, বা প্রাকৃতিক ঘটনার প্রকাশ করে না শিল্প। শিল্প হচ্ছে ব্যক্তিত্বের স্বজ্ঞাজনিত দৃষ্টি। ইমোশনের ক্রিয়া নয় শিল্প, শিল্প হচ্ছে শিল্পীর জ্ঞান। এই অর্থে ইতিহাসও ব্যক্তির স্বজ্ঞা ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। পরবর্তীকালে এই স্বজ্ঞার সঙ্গে সর্বজনীন বোধ মিলিয়েছেন ক্রোচে; ঘটনা ও সমালোচনায় ইতিহাসের বিশেষ ঘটনার মধ্যে সর্বজনীনতা ও কন্‌সেপ্টকে যুক্ত করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের এই ব্যক্তির ঘটনার সঙ্গে হেগেলের দ্বন্দ্বময় ঘটনা স্বীকার করেননি ক্রোচে। কেননা, ব্যক্তির কন্‌সেপ্টে বিরোধ নেই। ফ্রয়েড তো ব্যক্তির অবদমিত যৌন চেতনার ঊর্ধ্বায়িত প্রকাশই সাহিত্যে দেখেছেন। ইতিহাস, দ্বন্দ্ব, জ্ঞান মানুষ হারিয়ে গেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধারণা ছিল প্রাকৃতিক সত্যকে গতিময় সত্যে রূপান্তরিত করা, সেখানে যুক্তি ও বুদ্ধির চেয়ে ইন্‌স্টিংক্ট সংবেদনা ইম্প্রেশন ও স্বজ্ঞাকে বড়ো করে দেখা হয়েছে। এই সব ব্যক্তিকেন্দ্রিক দর্শনের ধারা

তখনকার সাহিত্যে পড়েছে। মার্কস এসে এই চাকা ঘুরিয়ে দিলেন, আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রকৃতি-বিজ্ঞানে আমাদের মন নিয়ে গেলেন সরিয়ে, বাস্তববাদে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন সব কিছু। মার্কস প্রকৃতির বাইরে কোনো কিছু স্বীকার করেননি, ইতিহাসে জগদতীত ব্যাপার কিছু নেই। এবং চিন্তা থেকে বস্তু নয়, বস্তু থেকেই মনের জন্ম, আসলে হেগেলের চিন্তা মার্কসে নেহ। তাই মার্কসের কাছে ইতিহাসের ঘটনা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাহিত্যও জীবন ও জগতের ওপর ভিত্তি করে রচিত জগদতীতের রহস্যের মধ্যে নয়। বস্তুজগৎ ও মানবজগতে যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলেছে, সেই দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব থেকে বিশুদ্ধ আনন্দের প্রকাশই সাহিত্য। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর, জীবের সঙ্গে বস্তুর, জীবের সঙ্গে চৈতন্যের, চৈতন্যের সঙ্গে আর এক চৈতন্যের দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্ব থেকে সমন্বয় চলছে, সাহিত্য একেই প্রতিফলিত করে; একে এড়িয়ে যায় না বা বাদ দেয় না, তাকে গ্রহণ করে। বস্তু ও মানবজগতের দ্বন্দ্ব থেকে নতুন সৃষ্টিপ্রেরণায় সত্যকে উন্মোচিত করে সাহিত্য; এই সত্য মানবের জীবন সত্য; মানবের সঙ্গে সমাজ জড়িত, তাই সমাজের ন্যায়নীতি শুভ বোধের প্রতিষ্ঠা এখানে অপরিহার্য; যেহেতু মানুষ বাঁচতে চায়, তাই তাকে সর্বদা ভবিষ্যতের অগ্রগতির দিকে এগোতে হয়। মার্কস বলেন, কবিতায় চিত্রকল্প ও মিথ্‌গুলি প্রকৃতি ও সমাজের সম্পর্কের প্রতি কবির মনোভাব ব্যক্ত করে। চিত্রকল্প ও পৌরাণিক কাহিনী কল্পনায় প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করে, অতিক্রম করে এবং সৃষ্টি করে। এমনিভাবে ছবির মধ্য দিয়ে যুগের প্রাকৃতিক শক্তি প্রকাশ পায় কল্পনার সাহায্যে। যে কোনো সৎ সাহিত্যের মধ্যে সমগ্র ইতিহাসের ধারা, মানবিক ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক সমস্যা জড়িত। সমস্ত কিছু নিয়ে দ্বন্দ্ব স্বীকারে একটি সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করে। আসলে সাহিত্যের সৌন্দর্যকে, আমার মতে, কান্টের গুণ পরিমাণ সম্বন্ধ ও আকারের শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত করে সামগ্রিকতা দিলেই বিশুদ্ধ চৈতন্যের আনন্দ আবির্ভূত হবে। এই বিশুদ্ধ চৈতন্যের আনন্দকে সামাজিক সত্যের হাতিয়ার রূপে কাজ করতে গেলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীবিপ্লবের দিকে অপরিহার্যভাবে নির্দেশ দিতে হয়। এই ক্ষেত্রে মার্কসীয় সাহিত্যে শিল্পকে উপেয়ের পরিবর্তে উপায় রূপে অধিকাংশ জায়গায় গণ্য করা হয়েছে। নেরুদার কাব্যে ব্যক্তি ও সমাজের দুই রূপ আছে; তিনি কবিতাকে কখনো বিশুদ্ধ চৈতন্য রূপে, কখনো সমাজবিপ্লবের হাতিয়ার রূপে গণ্য করেছেন। তাই তাঁর কবিতায় ভালোমন্দ প্রত্যক্ষ

অপ্রত্যক্ষ, কর্কশ মসৃণ সব জাতীয় রচনাই স্থান পেয়েছে। কর্কশ কবিতা বস্তুজগতের সংস্পর্শের জন্যে এসেছে বলে আমার বিশ্বাস। পৃথিবীর কবিতায় এখন এই ব্যক্তির ও জগতের দুয়ের আকর্ষণের লীলাই প্রকাশিত।

'পৃথিবীতে বাসস্থান' কবিতার যুগে নেরুদা সুররেয়ালিজমের প্রভাবে আকৃষ্ট। এখানকার ছবি ও চিত্রকল্পের মধ্যে স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন, চিত্রকল্পের অনুষঙ্গ, অসংলগ্ন ও আকস্মিক কথার সংযোগ, সম্মোহিত শব্দ প্রয়োগ একত্র সন্নিবিষ্ট। দালির তুষারীভূত ডিমের ঘড়ির রূপান্তরের মতো তাঁর কাব্যের রূপগঠন অবিন্যস্ত, বিশৃংখল, সর্বদা একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তনশীল। এই কবিতাগুলির মধ্যে কোন বিশেষ চিত্রকল্প নয় বা ছবি নয়, কতগুলি চিত্রকল্পের সমাহার, এই সমন্বিত চিত্রকল্পগুলি তাঁর অনুভূতির বিভিন্ন স্তর বা ছায়াকে পাশাপাশি এক সঙ্গে ধরতে চেষ্টা করে, কিন্তু এর জন্যে কোনো পূর্ব প্রস্তুতি পাঠকের কাছে তুলে ধরেন না, তবে এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন পারস্পরিক অনুষঙ্গময় চিত্রকল্পের সাহায্যে তিনি সামগ্রিক ঘৃণা বা অন্য কোনো অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চাইছেন। প্রতিটি চিত্রকল্প নূতন বক্তব্য প্রকাশ করছে এবং সব মিলিয়ে বিশেষ একটা পরিবেশ তৈরি করছে :

> সেখানে পাখিরা গন্ধকের রঙ এবং ভীষণ অন্ত্র
> বাহির দরজা থেকে ঝুলে আছে, ওই বাড়ি আমি ঘৃণা করি
> নকল দাঁতেরা কফি পটে ভুলে পড়ে আছে
> অনেক আয়না
> ভয়ে ও লজ্জায় অবশ্যই এরা কেঁদে থাকবে
> সর্বত্রই ছাতা, এবং বিষ এবং নাভি।

ভীষণ অন্ত্র, নকল দাঁত, ভয়, লজ্জা, বিষ নাভি এগুলি ক্ষয়ের, আমাদের অবচেতনে ক্ষয়ের চিত্র ; এর মধ্যে কবি মজে থাকতে চান না, তাই ঘৃণা করেন, বেরিয়ে আসতে চান এই ছবি থেকে। 'যৌবন' কবিতায় এ্যাসিড ও খোলা তলোয়ার—এরি সঙ্গে রাস্তায় ফুলের সুগন্ধি, এবং সব মিলে যে সামগ্রিকতা তাহলো বৃষ্টির ভেতর প্রদীপের মতো কৈশোর। 'কবি' কবিতার মধ্যেও সেই একই রীতি লক্ষণীয়। প্রথম জীবনের যৌনতা থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে সুররেয়ালিজমের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন।

যৌনতা, অনিশ্চয়তা, ধ্বংস, উচ্ছৃংখলতা ও সুররেয়ালিজমের প্রভাব তাঁর মধ্যে থাকলেও নেরুদার কবিসত্তা পুরোপুরি বস্তুধর্মী, বস্তুর প্রতি ভালোবাসার

মধ্যেই তাঁর মুক্তি। বস্তু ও তার প্রসারই নেরুদার কাম্য। দেশের চিন্তার শূন্যতা ও অভিনব বিস্ময়বোধ তাঁকে বারংবার বস্তুর কাছে নিয়ে এসেছে ; তিনি নারী ও পুরুষের শারীর ধর্মের কাছে ধরা দিয়েছেন। বস্তুর মতো নগ্ন দেহও তাঁর প্রিয় এবং এখানেই তাঁর মুক্তি। সুতরাং সুররেয়ালিজমের মৃত্যু থেকে তিনি বেঁচে উঠলেন বস্তুর আদিম রহস্যের মায়ায়, এখানেই প্রাচীন মন্ত্রের মতো তাঁর ভাষা উদ্গীত হয়েছে, পৃথিবী শরীর ও বস্তুর মধ্যে আবার তাঁর প্রাণের সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন। কিন্তু এই বস্তু রিল্‌কের বস্তু নয়, যা স্তবে রূপান্তরিত হয় ; এই বস্তু এখানকারই।

এই পরিবর্তনের মূলে তাঁর অন্তরের ধর্ম যেমন সক্রিয়, তেমনি দেশের পরিবর্তনও স্বীকার্য। সেনাপতি বিদ্রোহ করে বসলেন, লোরকা নিহত হলেন, স্পেন ধ্বংস হলো গৃহযুদ্ধে। বিশ্বজোড়া সর্বজনীন মানবিক ক্ষতির মধ্যে তাঁর অন্তরের ধর্মীয় রূপান্তর ঘটলো, নিজের জন্য জনগণের জন্যে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়। এরি সঙ্গে যুক্ত হলো তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, প্রবাসজীবনের দীর্ঘ অদর্শনে প্রকৃতি তাঁর কাছে আলিঙ্গনে ধরা দিলো ; বন পাহাড় নদী বৃষ্টি ভূমি শস্যক্ষেত্র বীজ গমের শীষ তাঁকে আহ্বান জানালো ; এমনিভাবে ইতিহাস এসে মিশলো প্রকৃতির বর্ণনার সঙ্গে, এই প্রকৃতির হাত ধরেই পশু পাখি ও মানুষ এসে জড় হলো তাঁর কাব্যে। পূর্বের কবিতায় অব্যবহিত অভিজ্ঞতা প্রকাশেই তাঁর বাস্তবতা ছিল, সেন্সিবিলিটি প্রকাশের জন্য দুর্বোধ্যতা এলেও তাঁর ক্ষতি ছিল না, কিন্তু এখনকার কবিতায় এই রীতি পরিহার করলেন, পাঠকের কাছে বোধ্য করতে চেষ্টা করলেন, সংযোগ রক্ষা করতে চেষ্টা করলেন সকলের সঙ্গে। কবিতা এখন তাঁর কাছে সামাজিক কর্তব্যও বটে, সমষ্টিগত দিকটা প্রকাশ করতে চাইলেন। কবিতা হয়ে উঠলো ব্যবহার্য ও উপলক্ষ। এই সমস্ত দিক থেকে তাঁর 'সাধারণ সংগীত' সৃষ্টির আদি ক্রিয়া রূপে গণ্য, এর মধ্যে সৃষ্টির আদ্য যুগের জলবায়ু পাথর পৃথিবী পশু উদ্ভিদ মানুষ সব একাকার হয়ে আছে। তাদের প্রতি ভালোবাসা অপূর্ব প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর সামগ্রিক বস্তুতে অবিশুদ্ধ কবিতার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তাদের একত্র সন্নিবেশ করেছেন, এই সন্নিবেশে মানুষের জয় ঘোষিত হয়েছে। অবিশুদ্ধ এই কারণে যে বস্তু এখানে হেগেলীয় উর্ধ্বায়ন স্বীকার করে না কখনো। কিন্তু এই সামগ্রিক অনুভূতি বাদ দিয়ে রাজনৈতিক প্রবন্ধাকারে যখন তিনি কবিতা লেখেন, তখন সে শুধু চিৎকার হয়ে ওঠে। কবি যখন কবিধর্ম ত্যাগ করেন তখন একপেশে

জীবনধারাই তাঁর কাব্যের উপজীব্য হয়। সাম্প্রতিক মানুষের বিদ্রোহ প্রকাশ পেলেও পরিপূর্ণ জীবনসত্য প্রকাশিত হয় না, জীবনের চেয়ে সমাজ বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু বলতেই হবে, 'সাধারণ সংগীতে' তাঁর চেতনা বিশেষ সাধারণ বস্তুর একত্র সমন্বয়ে একান্ত উন্মুখ বলেই এগুলি সার্থক কবিতা।

নেরুদা বস্তুভূমিক, বস্তুই তাঁর কাব্যের উপজীব্য, বস্তুর ও শরীরের প্রতি ভালোবাসাতেই তাঁর প্রীত হৃদয়ের আলো ছড়িয়ে পড়েছে. বস্তুর মধ্যেই মানুষের মুক্তি দেখেছেন, কিন্তু বস্তুর অভ্যন্তরে ভালেরির মতো আগুন না দেখলেও বস্তুর অপর প্রান্তে রহস্যময় নির্জনতা এক নিঃসময় পরিবেশের গভীরে টেনে নিয়ে গেছে তাঁকে। রাজনৈতিক বুদ্ধিতে, মার্কসীয় চেতনায় তিনি যেমন মানুষের মুক্তি, শান্তি ও ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তেমনি প্রকৃতির আদি স্তরে বিশ্ববোধে নিজেকে সমর্পণ করেছেন ; সেখানে যে নিয়মে মৃত্যু হয়, সেই নিয়মেই সৃষ্টি হয়, নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে মৃত্যু নীরবে আসে।

কেমনভাবে কখনো শহরের শীতের রাস্তায়
অথবা বাসের মধ্যে, কিংবা অর্ধ আলোকিত
অথবা রাত্রির গভীরতম নিস্তব্ধ নির্জনতায়, উৎসব রাত্রির
নিস্তব্ধতায়, ছায়ায় ও ঘণ্টার শব্দে
মানুষের আনন্দের অতীব সমাধি
আকাঙ্ক্ষা করেছি আমি থামতে, শাশ্বত খুঁজেছি
অতলান্ত শিরা যা আমি পাথরে একবার ছুঁয়েছিলাম
অথবা চুম্বনে উদ্‌ভাসিত বিদ্যুৎলেখায়।

এ সকলের মধ্যে শাশ্বতের বিশুদ্ধ চৈতন্যের সন্ধানই তাঁর কাঙ্ক্ষিত। এই দুই প্রান্তে তাঁর কবিতা আলোড়িত। ১৯৫৪ সালে লেখা ওডগুলির মধ্যে তাঁর কাব্যের রূপগঠন আরো সহজে হয়েছে, বোধ্য হয়েছে, মায়াকোভস্কির রীতিতে পঙক্তি অতি সংক্ষিপ্ত, দ্রুত, গতিময়, চিত্রে পরিপূর্ণ, টেকনিকের কোনো জটিলতা নেই, কিন্তু হৃদয়ের ভালোবাসা বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে প্রকাশ পেয়েছে, সমস্ত বস্তুর প্রতি প্রীতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে ; বৃক্ষ, রাত্রিতে ঘড়ি, খরগোশের সঙ্গে বালক, বনের গন্ধ, তেলের স্তুতি, আগুনের পা, চালক, লেবু, দুই শরৎ, কালো চিতাবাঘ, বাগান, কর্মে নিরত বালিকা, সমুদ্র থেকে আলো—সবই এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। এর পরে দেখতে পাই বিড়াল, হাতি, পিআনো তাঁর

কাব্যের বিষয়বস্তু। সূর্য কবিতার মধ্যে তাঁর এযুগের কাব্যের রীতি পরিস্ফুট : 'হে সূর্য/পৈতৃক কাচ/টাইমপিস্/ও শক্তি/নক্ষত্রের আদি পুরুষ/বিরাট/সোনালী গোলাপ/সর্বদা/বিক্ষুব্ধ আগুন নিয়ে/সর্বদা/তোমার আগুনে/নিজেকে নিঃশেষ করছো/আকাশ শীর্ষের/রান্না ঘর/বিশুদ্ধ/চোখের পাতা/রাগান্বিত ও শান্ত/অগ্নিকুণ্ড ও অগ্নি গ্রাসক/সূর্য/আমি তোমাকে/দেখতে থাকবো/আমেরিকার প্রাচীন/চোখ নিয়ে/' এই রীতিই 'লেবু' কবিতায় আছে। এবং এই কাব্যরীতিকেই পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে বয়ে নিয়ে চলেছেন, এখানে তবু চিত্র ছিল, প্রবহমানতা ছিল, পরবর্তীকালে এই রীতি আরো সহজ হয়ে উঠেছে, শুধু সহজ হৃদয়ের সরল ও স্বাভাবিক উদ্ভাস কয়েকটি রেখায় প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৫৮ এর 'খেয়াল খুশির কাব্য' গ্রন্থে 'রাখালিয়া' কবিতাটি তার উদাহরণ, এই টেকনিকই প্রেমের একশত কবিতা বইয়ে অনুসৃত।

যৌনতার অন্ধকার স্তর পেরিয়ে, সুররেয়ালিজমের ধ্বংস, মৃত্যু ও জীবনের জটিলতা অতিক্রম করে মানুষ ও প্রকৃতির ভালোবাসায় সামগ্রিকভাবে তিনি ধরা দিয়েছেন এবং এই ভালোবাসা শেষ পর্যায়ে এতো গভীরতরভাবে প্রকাশিত না হলেও প্রীতিস্নিগ্ধ হৃদয়ের উদ্ভাসে সমস্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি দীর্ঘ জীবন ধরে নিজের জন্যেই নিজে প্রতীক্ষা করছেন, এবং নিদ্রার মধ্যে ফিরে গেছেন এবং হেসে মরেছেন। এমনি করেই জীবনের বৃত্ত পূর্ণ করেছেন নেরুদা।

silence silence silence
silence silence silence
silence silence
silence silence silence
silence silence silence

ping pong
ping pong ping
pong ping pong
ping pong

du blau
du rot
du gelb
du schwarz
du weiss
du

the black mystery
is here
here is
the black mystery

w w
d I
n n n
I d i d
w w

il peut
peut il

il doit
doit il

il dit
dit il

il prend
prend il

small and yollow
unfinished
disappears
where slowly
spreading
large and green
but shining through
achieves
its figure
remains in mind
losing ground.

white and small
grows
a little
but becomes black
so stops
stops
suddenly

e
ei
ein
ein
int
n te
tex
text
ext
xt p
t pa
pas
pass

stille
stille

stille die
stille

die stille
stillen
stiele

die stiele
der stille

die stiele
der stille

tau
taub
taube
taub
tau
taub
taube
taub
tau
taub
taube
taub
tau

assi
ssie
sier
iert
ert
rt
t

stillen
die stille

stille

stille

schritte
nacht

schritte
nacht

schritte
schritte

e	c	c	e		e	c	c	e
c	e	e	c		c	e	e	c
e	c	e	c	f	c	e	c	e
c	e	c	e	l	e	c	e	c
e	c	c	e	e	e	c	c	e
c	e	e	c	e	c	e	e	c
e	c	e	c	c	c	e	c	e
c	e	c	e	e	e	c	e	c
e	c	c	e		e	c	c	e
c	e	c	e		c	e	e	c

baüme
baum

baum
baüme

pool
peopl
e plopi
cool

আমাদের সাহিত্যে এই অভিনবত্ব আমরা কখনো প্রত্যাশা করি না। ভারতীয়, বিশেষ করে আমরা যারা বাঙালি, কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির বিশ্বাস আমাদের স্থবির হবার প্রেরণা জোগায়। সাংখ্যের প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও বিবর্তন আমরা দেখতে চাই না। বিবর্তনের পরিবর্তে আমরা চাই পরিণাম। এবং এই পরিণাম শেষ পর্যন্ত আরেক পরিণাম বা চরম পরিণামে বা পরম পরিণামে পৌঁছয়। তখন আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত ও মোক্ষ।

শুনি, পাশ্চাত্যে নাকি বহু প্রকার কবিতার পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে আজকাল, শ্রবণেন্দ্রিয়ের কবিতা (audio poetry) কর্মচঞ্চল কবিতা (action poetry) এবং kinetic poetry, এবং এ সব কবিতার শেষ পরিণতি নাকি মহাশূন্যের কবিতা অর্থাৎ spacialist poetry. ১৯৬০ সালে এই কবিতার আন্দোলনই এখনো পর্যন্ত সর্ব শেষ পরীক্ষান্তরের কবিতা। টেপরেকর্ডারে শ্রুত ধ্বনির সমারোহই শ্রবণেন্দ্রিয়ের কবিতা, অনেকে এক সঙ্গে বসে পরস্পর কথা বলছে সেটিই কর্মচঞ্চল কবিতা এবং গতিশীল বস্তুর পরিচয়ই 'কাইনেটিক'

কবিতা। এ সব একত্র করেই মহাশূন্যের কবিতার জন্ম। অর্থাৎ যার মধ্যে এ সব বস্তু একসঙ্গে প্রকাশ পায়। কারণ এযুগ তো মহাশূন্যের!

সুতরাং কংক্রীট কবিতাও এই জাতীয় কবিতা থেকে প্রাচীন হয়ে গেছে। এই কংক্রীট কবিতার নজির বাংলাদেশে অন্তত দুজন কবির মধ্যে বিশেষ দেখতে পাই, পুষ্কর দাশগুপ্ত এবং পরেশ মণ্ডল। গদ্যে, বিশেষ করে গল্পে, বলরাম বসাক রমানাথ রায় কিছুটা অনুকরণ করবার চেষ্টা করেন।

কংক্রীট কবিতার আন্দোলন যতোদূর মনে পড়ছে ১৯৫২ সাল নাগাদ দানা বেঁধেছে। এর আগে হয়তো এর বীজ ছিল। এর উদ্গাতা ইউজেন গোমরিঙের, ইনি ম্যাক্সবিলের সেক্রেটারি ছিলেন একটা ফার্মে। ফার্মটির নাম হোশ্‌শুলে ফুর্‌ গেস্টালটুঙ। এঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে দেকিও পিগ্‌নাতারি নামক একজন ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন ও সংযোগতত্ত্বের শিক্ষকের। এই পিগ্‌না-তারির বাস ছিল ব্রাজিলে। এর আগে দু বছর য়ুরোপে কাটান।

এবং পিগ্‌নাতারি সংযোগ স্থাপন করলেন দুই দলের কবিদের সঙ্গে, অগস্তো ও হারাল্‌দো দ্য কোম্পো এবং পরে নোয়াগাঁদ্রের কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে নূতন এক কাব্যচেতনার জন্ম দিতে চেষ্টা করলেন ১৯৫২ সালে। এই সময় গোমরিঙের 'নক্ষত্রপুঞ্জ' নামে (konstellationer) একটি বই প্রকাশ করলেন। এঁরা দুজনেই কবিতার ক্ষেত্রে কংক্রীট শব্দটির প্রয়োগ করলেন পৃথকভাবে। এবং এখান থেকেই কংক্রীট কবিতার শুরু। এঁরা প্রথমে আলাদা ছিলেন, পরে যুক্ত হন নীতি ও আদর্শের সূত্রে।

বাঙালিরা প্রাচীন পন্থী, সেই সূত্র ধরে আমি মনে করেছিলুম কংক্রীট কবিতা মানে হয়তো হেগেলের কংক্রীট ইউনিভার্সালকে বোঝায়। অর্থাৎ কোনো বস্তু সত্যই কংক্রীট কিনা সেটি নির্ভর করে বস্তুর বিভিন্ন অংশ, অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিপূর্ণতা, ঐক্য, স্বাধীনতা ও নিজস্ব রীতির ওপর। এগুলি সব মিলিয়েই কংক্রীট ইউনিভার্সালের চিন্তা আমাদের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং এই সূত্র ধরে হেগেল এগিয়ে বলেছেন যে কংক্রীট ইউনিভার্সাল হচ্ছে অ্যাব্‌সলিউট। এই অর্থে অনেক ব্যাখ্যা যুক্ত হয়েছে।

আর কবিতায় কংক্রীট-অ্যাব্‌স্ট্রাক্টের দ্বন্দ্ব তো চিরকালের। সেই বাঁধা-ধরা বুলি তো আমরা জানি নানা প্রসঙ্গে। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদই সিড্‌নি 'কবিতার সপক্ষে' প্রবন্ধে কংক্রীট শব্দটির মূল্য দিয়েছিলেন, এবং অ্যাব্‌স্ট্রাক্টের নিন্দা করেছিলেন তীব্রভাবে; কিন্তু জনসনের আমলে কংক্রীটের পরিবর্তে

নব্যক্লাসিক কবিতায় অ্যাবস্ট্রাক্টের প্রাধান্য পেল। রোমান্টিকরা আবার সিডনির কংক্রীট রূপকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, কিটসের কবিতায় তার সুন্দর উদাহরণ মেলে। বিংশ শতাব্দীতে পাউণ্ড এবং হিউম, বিশেষ করে, কংক্রীটের নাম দিয়ে রোমান্টিকদের সাধারণ অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন জোরালোভাবে। সেই ধারাই চিত্রকল্পবাদীরা টি. এস. এলিঅটের মাধ্যমে বিশ্বের কবিতায় প্রচার করে এসেছেন। কবিতার মধ্যে তাত্ত্বিক বা আইডিয়াগত সাধারণ বক্তব্য ও চিন্তা অবশ্য অপরিহার্য। এলিঅটের বস্তুগত পারম্পর্য এই সূত্র ধরেই এসেছে, এবং এই ধারাই রিচার্ডস ব্রুকস এবং র‍্যানসম ও অন্যান্য সমালোচকেরা গ্রহণ করে একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, এই কারণেই উপমা ও বক্রোক্তি কাব্যের ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছিল, অন্তত ইংরেজি সাহিত্যে চল্লিশ দশক পর্যন্ত। মনে করেছিলুম, এই প্রত্যক্ষ বোধ বিশ্বের কাব্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশের কবিতায় হয়তো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কারণ এঁরা সাধারণ কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইছেন সেই কংক্রীট কবিতার আদর্শে। বস্তু ও শব্দের মিলন চাইছেন নূতন করে। কিন্তু তা নয়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।

সাম্প্রতিক কংক্রীট কবিতার পেছনে সক্রিয় হচ্ছে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব এবং বিশেষ করে জনসংযোগে তথ্যমূলক তত্ত্বের সরবরাহ। এবং এই দুটির উৎপত্তি আধুনিক সমাজব্যবস্থা থেকে। এ যুগে শুধু বস্তু নয়, মানুষ প্রকৃতই মানুষ কিনা তা পুরো নির্ভর করে তথ্যকে কিভাবে বিজ্ঞাপনে সকলের সামনে উজ্জ্বল চমৎকারিত্বে উপস্থাপিত করতে পারা যায়, এর সার্থকতার ওপর। সমগ্র বিশ্বের এখন নাম বিজ্ঞাপন, এখানে কলঙ্কিত অভ্রও সকলের কাছে বিভূতিময় হয়ে ওঠে, অশুদ্ধ চিত্তের কালো দাঁতও বিমলানন্দে লোকের রক্তে ওঙ্কার মন্ত্র তোলে। সুতরাং এহেন জাগতিক অবস্থায় নূতন রূপকল্প ভাষা ও ভঙ্গি আসতে বাধ্য। মূলত সেটাই এসেছে এই জাতীয় কবিতায়। কারণ বিজ্ঞাপনে বস্তুর চেয়েও অবস্তুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। তাই তার এতো মনোহারিত্ব।

বিজ্ঞাপনের ব্যাবহারিক প্রয়োগ ভাষাকে জটিল করেছে, এবং এই জটিল ভাষা থেকে কবিতার ও ব্যবহারের বিভিন্ন ভাষাকেও সরল করা প্রয়োজন। এই সরল করবার প্রেরণা থেকেই ভাষাকে সরলতম করবার চেষ্টা এসেছে কবিদের মধ্যে। ভাষা শেষ পর্যন্ত শব্দে পরিণত হয়েছে, শব্দ পরে অক্ষর এবং অক্ষরউত্থিত ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভাষায় এটা চরম

পর্যায়। কিন্তু এই চরম পর্যায়কে ঠেলে নিয়ে এসেছে সমাজব্যবস্থা। সেখানে ভাষা মানে নিরর্থকতা, ধ্বনি মানে বেদনা। তাই 'পিঙপঙ' এই দুই ধ্বনি আমাদের স্বপ্নের জগতে কল্পনার সংগীত নিয়ে আসে।

কিন্তু এর সাহায্যেই কবিতায় রূপকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, কর্মের সামঞ্জস্য বোধ আনতে হবে। পূর্বের অ্যাব্‌সলিউটকে পরিহার করা জরুরি। এই কর্মের সামঞ্জস্যের বোধের সঙ্গে শব্দ উচ্চারিত হয়, এই শব্দ কখনো বিশেষ অর্থে দ্যোতিত, কখনো শুধু ধ্বনির অর্থে সঙ্কেতিত। কিন্তু এই শব্দসমূহ এবং কর্মের বিন্যাস ও রূপ—সব মিলে যে ঐক্য তৈরি করে তাতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা বা ডাইমেনসন গড়ে ওঠে, এই ডাইমেনসনের মধ্যে খেলা করে মন, পাঠক এবং কবির!

তাহলে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে এখনকার কংক্রীট কবিতার শারীর রূপ যা অক্ষরে বিন্যস্ত এবং শব্দ সমাহার—এই দুটিই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: বলা বাহুল্য, সকল কালের কবিতায় এই দুটিই বর্তমান, আপোলিন্যার থেকে শুরু করে মালার্মে, এবং মালার্মে থেকে মেটাফিজিক্যাল কবিতায়, এবং মেটাফিজি-ক্যাল কবিতা থেকে গ্রীক কবিতায় অক্ষরবিন্যস্ত কবিতার স্বরূপ লক্ষ্য করি। সুতরাং এক্ষেত্রে অভিনবত্ব সামান্যই। শব্দ নিয়েই কবিতা। আমাদের অলংকার শাস্ত্রে বলে শব্দ অর্থের সঙ্গে যুক্ত হলেই কাব্য সৃষ্টি হয়। এঁরা শব্দকে কখনো নিয়েছেন, কিন্তু শব্দ ও অর্থ বাক্যে মিলিয়ে দিতে চান নি, শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন। ক্রিয়া সর্বনাম বিশেষণ বিশেষ্য সমাপিকা অসমাপিকা উপসর্গ উদ্দেশ্য-বিধেয়—সব মিলে যে বাক্য গঠিত হয়, এখানে তা হয় না। শব্দগুলি পাশা-পাশি বসানো হয়, এবং শব্দ ছুঁড়ে দেওয়া হয়। কখনো এই শব্দও থাকে না, থাকে অক্ষর, এবং অক্ষরজাত ধ্বনি। এবং সর্বশেষ পরিণতিতে এই অক্ষর ও ধ্বনিও লুপ্ত হয়ে যায়, থাকে কতগুলি চিহ্ন, এই চিহ্নগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে একটা ছবি, বা ছবির আভাস। এই আভাসিত ছবির মাধ্যমেই মনের ভাব ব্যক্ত হয়। এখানেই আধুনিক বিজ্ঞাপনের জয়।

কংক্রীট কবিতার তাত্ত্বিকেরা অস্বীকার করেন যে অ্যাপোলিন্যারের ক্যালিগ্রাম থেকে কংক্রীট কবিতার অক্ষরের রূপ এসেছে, ওঁদের মতে অ্যাপোলিন্যারের ক্যালিগ্রাম প্রাকৃতিক বস্তুকে অনুকরণ করে। সুতরাং বর্জিত, কারণ কংক্রীট কবিতায় নূতন বস্তু কল্পনায় সৃষ্টি করতে চায় কবিরা। সেটা নির্ভর করে শব্দের বিন্যাসে। প্রত্যেকটি শব্দ এখানে পরিপূর্ণ রূপের

অংশ। সুতরাং অংশগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য আনা দরকার। এবং প্রত্যেকটি শব্দ অংশ বলেই শব্দগুলি এমনভাবে নির্বাচিত করতে হবে যাতে এদের মধ্যে সংবেদনশীলতা না থাকে, শক্ত ও কঠিন হয়, রূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা এখানে কথা নয়, শব্দ নয়, এর স্ট্রাকচার অর্থাৎ রূপগঠন, ব্যক্তিগত বেদনা নয়, কোনো ব্যাখ্যা বা অনুভব নয়, সব মিলে একটা বস্তু, বস্তু থেকে যা ভাবা যায়, বা লোকে ভাবতে পারে। তাহলেও শব্দের মধ্যে ধ্বনি, তার বাইরের রূপ এবং শব্দার্থ মিলেমিশে থাকে, এগুলির সঙ্গে সহাবস্থান করে পারস্পরিক যোগ এবং পারস্পরিক যোগ থেকে গড়ে ওঠে বস্তু, এই বস্তুই রূপ নিয়ে পাঠকের কাছে দৃষ্টিগোচর হয়। এবং এই রূপটাই অন্তর যোগ। ক্ষীণভাবে হেগেলের সঙ্গে একটা যোগসূত্র এর মধ্যে পাওয়া যায় এবং আধুনিক চিত্রকলার রীতি ও আদর্শও এই রূপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

চিত্রের কথা বলছি এই কারণে যে আধুনিক চিত্রশিল্প কোনো বাহন নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ; অর্থে রূপে ভাবনায়। শব্দের পুনরাবৃত্তি, শব্দ ভাঙা, শব্দের স্থানচ্যুতি, পরস্পর বিন্যাস—সব মিলে একটা ফর্ম তৈরি করে, এই ফর্ম তো অংশের সমাহার, কিন্তু ফর্ম গঠিত হয় কবির কল্পিত ডিজাইনে। এবং এই ডিজাইন থেকেই বিষয়বস্তুর প্রচণ্ড প্রকাশ ঘটে, অর্থাৎ বিষয়বস্তুজাত চিন্তা ভাবনা অনুভূতি প্রকাশ পায়। সুতরাং প্রকৃত বস্তুর চেয়ে প্রকৃত বস্তুর শক্তিকে চিত্রকরেরা যেমন রঙেরেখায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন আধুনিক চিত্রকলায়, এই কবিরা সেই আদর্শই অনুসরণ করতে চেয়েছেন।

তবে এঁরা স্বীকার করেছেন যে কংক্রীট কবিতার সঙ্গে হাইকু কবিতার সাদৃশ্য প্রচুর। ভাবলিপির অনুভূতি বেদনা ও গীতিকবিতার প্রকাশ মাঝে মাঝে ঘটে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শব্দ, অক্ষর, ধ্বনি এই হচ্ছে কবিতার উপাদান, অথবা কতগুলি চিহ্ন। এই শব্দ অক্ষর এবং চিহ্ন কখনো অনুপ্রাসের ভঙ্গিতে, কখনো পুনরাবৃত্তির ঢঙে সাজানো হয়। অথবা কখনো চিহ্ন ও রঙই একটা রূপ সৃষ্টি করে। এই রূপটাই প্রথম কথা, যেমন 'ইক্ ওক' (ik-ok) কবিতার ধ্বনি নেওয়া হয়েছে লাতিন hic-hoc থেকে, কিন্তু এখানে সঙ্কুচিত করা হয়েছে ধ্বনি ও রূপে। এই সঙ্কুচিত রূপটাই এখানে কাম্য।

এই কংক্রীট কবিতা থেকেই 'সেমিওটিক' কবিতার সৃষ্টি হয়েছে, ক্ল-কাম্পোর 'পোপেরেল' কবিতা এসেছে। এবং কংক্রীট কবিতার সঙ্গে

'কাইনেটিক' কবিতার যোগও লক্ষণীয়। ব্যাকরণের সঙ্গে এক্সপ্রেশন একত্র মিশেছে অনেক জায়গায়। গানিয়ের শুধু শব্দকে গ্রহণ করেছেন। প্রতিটি স্বতন্ত্র শব্দের সদর্থক বস্তু রয়েছে, শব্দ শাদা মহাশূন্যে যুক্ত, নক্ষত্রপুঞ্জের মতো শাদা পৃষ্ঠা অধিকার করে আছে। এই প্রকাশধর্মিতার পেছনে তাঁর বক্তা সক্রিয় এবং চিন্তা ও নির্মাণ পরস্পরসম্পৃক্ত। 'একটি শব্দ উজ্জ্বল, উড়ান, আগুন, শিখার নিক্ষেপ, একটি ছুটন্ত তারা' এই হচ্ছে গানিয়ের দর্শন। 'কড্' ও 'সুপ্রেম্যাটিস্ট' গোষ্ঠী বলেও একটি রীতির দাবী আছে, এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেন ফিন্‌লে।

কংক্রীট কবিতায় ভাবলিপি বা ideogram এর কথা বারংবার শোনা যায়। এবং এই সূত্রেই ভাষার ইতিহাসে লিপির উদ্ভব মনে আসতে বাধ্য। আদিম যুগের মানুষ ছবি এঁকে ঘটনাকে ও বস্তুকে স্মৃতির ভেতরে লুকিয়ে রাখতো, স্পেনের গুহাচিত্রে এই স্মারক চিত্রপদ্ধতির নমুনা। অর্থাৎ ঐ ছবিগুলি কোনো বিশেষ ঘটনা ও বস্তুকে আদিম মানুষের মনে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে চিত্রলিপি (pictogram) ও ভাবলিপি (ideogram)। কোনো বস্তু ও ভাব বোঝাতে এই পর্যায়ের লোকেরা রেখায় চিত্র আঁকতো, যেমন বহন করা অর্থে মানুষ বোঝা মাথায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ রেখাচিত্রই ভাবকে বোঝাচ্ছে। ছবি ভাবের দ্যোতক। তৃতীয় স্তরে আসে শব্দলিপি (phonogram)। অর্থাৎ রেখাচিত্র থেকে ভাবলিপিতে বস্তু ও বিষয় বোঝানো হচ্ছে, ভাবলিপির এই বিষয় ও বস্তু শব্দে প্রকাশিত হতে থাকে। শব্দ মানেই ধ্বনিগুচ্ছ। চীন ও মিশরের এই শব্দলিপি আদি যুগে ব্যবহৃত। ধ্বনি এবং চিত্র একই সঙ্গে ব্যবহৃত, যেমন চীনে 'যুন' মানে মানুষ, এই মানুষের আকৃতি সংক্ষেপে রেখায় আঁকা হতো। চতুর্থস্তরে আসে অক্ষর-লিপি (syllabic script)। শব্দচিত্রের রেখা এখানে সংক্ষিপ্ত এবং বিষয় বস্তুর সংকেতবাহী। চিত্র যেমন সাংকেতিক ও সংক্ষিপ্ত হলো, তেমনি ধ্বনিও সংক্ষিপ্ত হলো সুবিধার জন্যে, ধ্বনিগুচ্ছ না বুঝিয়ে আদ্য অক্ষর এবং আদ্য অক্ষরের ধ্বনি শুধু বোঝানো হলো। এবং পঞ্চম স্তরে এলো ধ্বনিলিপি (alphabetic script) অক্ষরলিপির ধ্বনিগুচ্ছের আদ্য অক্ষর না হয়ে একক ধ্বনির চিহ্নরূপে পরিণতি লাভ করলো; ডঃ সুকুমার সেন একটি উদাহরণ দিয়েছেন চমৎকার। প্রাচীন মিশরে সিংহীর চিত্রলিপি শব্দলিপিতে 'লাবোই', অক্ষরলিপিতে 'লাবোই' থেকে 'বোই' লুপ্ত হলো, রইল 'লা', 'ল'

এই অক্ষরের প্রতীক, এবং 'লা' এই অক্ষরলিপি থেকে 'ল্' এই ধ্বনিলিপিতে একক ধ্বনির চিহ্ন হিসেবে গ্রীক রোমান লিপিতে ব্যবহৃত হতে লাগল। গ্রীক লিপির 'আল্‌ফা' 'বিটা' বিশ্লেষণ করলেও শব্দলিপি থেকে অক্ষরলিপি, অক্ষরলিপি থেকে ধ্বনিলিপির 'এ' 'বি' পাবো। এই একক ধ্বনির চিহ্নের মধ্যে গোপনে সাঙ্কেতিক ভাবে রেখাচিত্র লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ ছবিটা কোনো রকমে থেকেই যাচ্ছে এবং ছবির সঙ্গে বিষয় ও বস্তু। সুতরাং কংক্রীট কবিতায় যে শব্দ, শব্দের অংশ অথবা অক্ষর কিংবা শুধু চিহ্ন ব্যবহার করে একটা রূপ দিতে চান কবিরা অজ্ঞানে কিংবা সজ্ঞানে, হয়তো এঁরা লিপির মূলে চিত্র, এবং চিত্র থেকে ধ্বনি, এই দুয়ের পারস্পরিক যোগকে স্থাপন করতে চাইছেন। অক্ষরচিত্র এবং ধ্বনি এক সঙ্গে। অক্ষরের রূপের মধ্যেই ছবি, এবং ছবি দেখেই ভাব উঠে আসছে, এই সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে শুধু ধ্বনি। যেখানে শুধু শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেখানে পরম্পরবিচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ এবং অর্থ থেকে ভাব পরিস্ফুট হতে বাধা নেই, যেখানে অক্ষর ব্যবহার করা হয় বা শব্দ ভাঙা হয়, সেখানে ঝোঁকটা চলে যায় অক্ষরের ছবিতে, সেই সঙ্গে আসে ধ্বনি। আবার যেখানে অক্ষর, শব্দ, ভাঙা শব্দ কিছুই নেই, অর্থাৎ কোনো ধ্বনি নেই, সেখানে আছে শুধু ছবি, চিত্রলিপি, এই চিত্রলিপিই ভাবলিপিকে উদ্বোধিত করে, বিষয় ও বস্তুর ভাবকে জাগায়। সুতরাং একদিকে শব্দের ধ্বনির চিত্র, শব্দকে কেন্দ্র করে অক্ষরের রেখাচিত্র, অন্যদিকে সব মিলে ফর্ম, এই দুই মিলে পরিপূর্ণ কবির কল্পিত ডিজাইন। আমার মনে হয় কংক্রীট কবিতায় এঁরা ভাষাতত্ত্বের এই মূলে অক্ষর ও শব্দের রহস্য ধরতে চাইছেন। সার্থক হচ্ছেন কিনা সে প্রশ্ন পরের।

দেকিও পিগ্‌নাতারি (১৯২৭), হারালদো দ্য কাম্পো (১৯২৯)। অগস্ত দ্য কাম্পো (১৯৩১), রোনাল্‌দো আজেরেদো (১৯৩৭), জোসে লিনো গ্রেমেওয়াল্ড (১৯৩১), পেড্রো জিস্টো এডগ্রাড ব্রাগ্‌ (১৮৯৭) মাথিয়াস গোয়েরিতস (১৯১৫) পিয়ের গার্নিয়ের (১৯২৮) হ্যামিল্টন ফিন্‌লে (১৯২৫) জোনাথান উইলিয়ামস (১৯২৯) ডোম সিল্‌ভেস্তের (১৯২৪) জন্‌ ফার্নিভ্যাল (১৯২৩) স্টিফেন ব্যান্‌ (১৯৪২), এডউইন মর্গান (১৯২০) এমেট উইলিয়ামস্‌ (১৯২৫) রবার্ট ল্যাক্স (১৯১৫) এইসব বিভিন্ন দেশের কবিরা এক জোটে যে কবিতার মুক্তি আনতে চাইছেন, তা বক্তব্য বা বিষয়বস্তু কিংবা অনুভূতির নয়, তা চিত্রের, এখানেই অ্যাংরি ও হাউরির সঙ্গে

পার্থক্য। এঁদের প্রধান কথা চিত্র, নয়তো চিত্রলিপি, এবং সেগুলি ভাবলিপিও বটে।

কিন্তু আমরা ভাবলিপিতে ফিরে যাবো, না যা আছে তা থেকে এগিয়ে নূতন পথ নেবো, কথার ও অক্ষর চিত্রের ক্ষমতা কতটা রাখবো? বিজ্ঞাপনও তো শেষ পর্যন্ত বস্তুরই হয়।

দাদাবাদের উচ্ছৃংখল অনাচারে বিষয়বস্তুর ভাবনা ছিল জড়িয়ে, যা আছে সব কিছুকে ভাঙতে হবে; কেননা প্রচলিত বস্তুর মধ্যে কোনো সৎ ও আদর্শ নেই, সবই পুরনো, পচা, নষ্ট; সুতরাং এদের ভাঙলে কোনো অন্যায় হয় না। তবে ওদের উচ্ছৃংখলতা শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যেই উচ্ছৃংখলতা নিয়ে আসে; ভাষা ও ধ্বনি অর্থ হারিয়ে নবজাত শিশুর অর্থহীন ধ্বনিতে পর্যবসিত হয়, মানবজাতির সভ্যতার ও সংস্কৃতির অগ্রগতি এমন এক ধ্বংসময় পরিণামে ঠেকেছে এখানে। এই ধ্বংসময় পরিণাম থেকে, অর্থাৎ মৃত্যু থেকে শিল্প আবার বেঁচে উঠতে চাইল; মানুষের সৃষ্টি যেমন নারীর দেহে, তেমনি নারী ও যৌন চেতনাকে অবলম্বন করে শিল্পের জন্ম হলো। ব্রেঁতো নারীর কোমরে দেখতে পান বাঘের মুখ, নরখাদক জলজপ্রাণীর মতো মুখ ব্যাদান করে আছে, তলোয়ারের ন্যায় পাতার মতো যোনিদেশ, যোনিদেশকে দেখতে গন্ধমূষিকের মতো, সোনা যেমন আবর্জনায় জড়িয়ে থাকে তেমনি যোনিদেশেও এই আবর্জনা, কিন্তু তবু নারীর চোখে জল, বিষে এই জল পান করেন কবি। অবচেতনার এই যৌনতা শেষ পর্যন্ত সর্বজনীন অবচেতনে বাসা বাঁধে, সেখানে সর্বব্যাপক ধ্বংস সমারোহ তোলে চারদিকে। মারণাস্ত্রের শব্দে সন্ধ্যায় শরতের বনানী প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে; সোনালী প্রান্তর, নীল হ্রদ, ওপরে পাপী সূর্য গড়িয়ে পড়ে, মুমূর্ষু যোদ্ধাদের রাত্রি আলিঙ্গন করে, উদ্দাম অনুতাপ টুকরো টুকরো হয়ে যায়, উইলো গাছের গর্তে লাল মেঘ জমছে, এই গর্তে ক্রুদ্ধ ভগবান বসে আছে। রক্তপাত, চাঁদের মতো নীরবতা, কালো পথে সমস্ত ধ্বংস পূর্ণ। অবচেতনের এই ধ্বংস বিস্ফোরণের মত বাইরে বেরিয়ে পড়তে চায় এদিক ওদিক উদ্‌ভ্রান্তির মতো, আনন্দ ও গতি যেমন উচ্ছল, তেমনি টেলিগ্রামের শব্দের মতো শুধু সংকেত হয়ে ওঠে, তোতলামি আসে, কথা বলতে পারা যায় না, প্রকৃতি মানুষের মতো জীবন্ত হয়ে ওঠে, মানুষ হয়ে ওঠে যন্ত্রের মতো প্রাণহীন। বাস্তব ও পরাবাস্তব মিশে যায় এই অবচেতনায়, আমাদের অনেক বীভৎস বিকৃতি হাঁ করে গিলতে আসে। এক্সপ্রেশনিজমের এই অবচেতন

অ্যাপোলিনেয়ারের কবিতায় বাইরের বিশ্বজাগতিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়েছে ; শুধু বাইরে নিহিত নয়, অ্যাপোলিনেয়ার দেখেছেন খাঁচার মতো ঘরে জানালা দিয়ে সূর্য হাত বাড়িয়েছে, ব্যর্থ প্রেমের চিৎকারে আকাশ ভরে গেছে, মৃত প্রেমের স্মৃতিবিস্মৃতির নরক জাগছে চারদিকে, অদেখা নিশ্বাসে ঘাড়ে চিতার আগুন জ্বলে ; কথা এবং অর্থহীন শব্দ পাশাপাশি থাকে, বিষয়হীন বিশৃঙ্খলার মতো রূপের অনিশ্চয়তা ও বিকৃতি জেগে ওঠে, কবিতার বাইরের ভীষণ অন্ধকার আমাদের কথা বলবার শক্তিকে পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়, শব্দের বর্ণ চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়, ছড়ানো ছিটানো শব্দে বিভিন্ন বস্তুর রূপ চোখের সামনে গড়ে ওঠে, এই বস্তু দেখেই অনুভূতি জাগে, আমি বৃষ্টিকে প্রকাশ করতে পারি না শব্দ দিয়ে, বৃষ্টির শব্দের বর্ণে আমার সামনে বৃষ্টির ধারা বয়ে যায়, কবরের ওপর আমার কফিন জেগে ওঠে, ভাষা বা শব্দ নয়, শুধু বিচ্ছিন্ন বর্ণ। বীট বা হাঙরিরা দাদাবাদের ধ্বংস ও অশ্লীল যৌনতাকে সমাজের কাঠামোয় এনে সব নষ্ট করতে চেয়েছিলেন, কোন শাশ্বতবোধ ধারা বা শৃঙ্খলা নেই, আছে শুধু মুহূর্ত, সংবেদনার ঘূর্ণিময় সংঘর্ষ ; স্বপ্ন দৃষ্টি, ভাবী ইঙ্গিত, রহস্য, আনন্দ, হ্যালুসিনেশন, চিৎকার, এর মধ্যেই এঁদের চরিতার্থতা ও প্রতিবাদ ; ক্রুদ্ধেরা চেয়েছিলেন ওপরিতলার এই পোশাকি সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ করতে, চাকরি অর্থ যৌনতা সার্থকতা সব মিলে তাদের মনে ব্যর্থতা এনেছে ; তাই এদের চরিত্র রূঢ় কর্কশ, অপরিচ্ছন্ন, ভালো পোশাক পরে না, স্নান করে না, মুখ ধোয় না, শুধু চিৎকার করে, ভাঙে। এর পরেই কংক্রীট কবিতার আবির্ভাব, এঁদের মধ্যে সামাজিক বিদ্রোহ নেই, আছে যন্ত্র সভ্যতার চাপে ব্যক্তির মনে প্রতিক্রিয়া, যে প্রতিক্রিয়ায় ভাষা লুপ্ত হয়ে যায়, জেগে থাকে অর্থহীন রূপের অর্থ ; এটা নয় আদিম, নয় লুপ্তি।

শব্দসূচি

অগস্তো দ্য কাম্পো ১২৬
অগুস্তিনে ১,৩,৫,৬ (দর্শন)-৭
অনুপ্রাণিত গণিত ৬৬
অনুবাদ কবিতা ৭৬,৮০
অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ ৪৮,৫৮,৬৬
অবিশুদ্ধ কবিতা ১০৯,১১৬
অবক্ষয়ধর্মী কবিতা ৫৬,৬৭ (নব্বুই-এর কবিগোষ্ঠী)

আইনস্টাইন ৬২
আকুইনাস ১,৪,৭ (দর্শন)-৮
আর্নট ৬৫,৭০,৭৭
আর্নল্ড ৭৭
আর্নো ২৬
আল্ট্রাইজম্ ১১
অ্যাণ্ডার ১২৮
অ্যাপোলিন্যার ২২,৮২,১০০,১২৩,১২৮
অ্যারিস্টটল ৭,২৯

ইউজেন গুমরিঙের ১২১
ইয়েটস্ ৬৫,৭০,৭২,৭৩,৭৫, ৭৭,৭৮,৮১

উনগারেত্তি ২৯-৪৫,৪৯,৫৩,৫৪,৫৬,৮২,১০৪
উনামুনো ৮১

এক্সপ্রেশনিজম্ ১২৭
এড্উইন মর্গান ১২৬
এডিথ সিটওয়েল ৭৭
এমেট উইলিয়ামস্ ১২৬
এলিঅট ৪৮,৫৭ ৬০;৬৮,৭৩-৭৬,৮০-৯০
ওনোফ্রি আর্তুরো ৪৬
ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ২৬,৩৪,৬৫

ওয়ালার ৬৮
ওয়েবস্টার ৭৪
ওয়েস্টন ৫৯

কর্মচঞ্চল কবিতা (action poetry ১২০
কংক্রীট কবিতা ১১৯-১২৮
কাণ্ট ১১৪
কাভালকান্তি ১২,২৩,৩৪,৬৫,৭৫
কামু ২৮
কার্দুচি ৪২
কাস্তেলভেত্রো ১৯
কিউবিজম ১১১
কিকেরো ২,৩
কিটস্ ৬৫
কিকেগার্ড ৯৪
কোলরিজ ২৬
কোয়াসিমোদো ৪০,৪১,৪২,৪৬,৫৬
ক্রিপাসকিউলার ৪১,৪২,৪৩
ক্রিয়েশিনিজম ১১১
ক্রুদ্ধ (angry) ১২৮
ক্রোচে ৪১,৪৬,৫২ (সাহিত্যাদর্শ)-৫৩,৬২,৬৬ ১১৩ (ইতিহাস)
ক্র্যাব ৬৮
ক্লদেল ১৯

গতিয়ের ৬৮
গুর্মোঁ ৬৭
গোল্ডিং ৬৮

চসার ২৮,৬৫,৮৬
চিত্রকল্পবাদ ৪২,৬১-৬২
চিনো ২৩

জন্ কার্নিভ্যাল ১২৬
জনসন ১১১
জয়েস ৭৮,৮২,৮৩,১০১
জিউস ৪৬
জীবনানন্দ দাশ ১৫
জেনোফোন ১০৪

জোনাথান উইলিয়াম্‌স্‌ ১২৩
জোসে লিমো প্রেমেওয়াল্ড ১২৬

টুর্নিয়ের ৭৪
টেনিসন ৮৩

ডানিয়েল ৩৪
ডোম সিল্‌ভেস্তের ১২৬
ডোরসেট ৬৮

ত্রুবাদুর ১১,১১,২৬

দাদাবাদ ১১১,১২৭
দানিয়েল ৭৫
দান্তে ৪,৭,৮,৯.১০,১২,১৩,১৫,১৭,১৮,২১,
২৩,২৫,২৬ (তাহাপ্রসঙ্গে) ২৭.৩৩,৩৪,৩৭,৪৬,
৫৭,৫৮,৬৯.৭৭,৮৩,৮৪,১০১
দালি ১১৫
দেকার্ৎে ৬,৫৭
নগ্ন কবিতা ৪৬,৪৭
নব্য প্লেটোধর্মী ৪৫
নির্বেদ (angst)৯৩-৯৪
নীরবতা ৩৮,৩৯,৪৬
নীৎশে ৪
নেরি যোয়াব্দা ২

পরেশ মণ্ডল ১২১
পাউণ্ড, এজরা ১৫,৩২,৬১-৭৯,১১২,১২২
পাবলো নেরুদা ১০৯-১১৮
পার্নাসীয় কবিগোষ্ঠী ৯১,১০০
পাস্কাল ২৯
পিকাসো ৪২,১০০
পিগ্‌নাতারি দেকিও ১২১,১২৬
পিয়ের গার্নিয়ের ১২৬
পুষ্কর দাশগুপ্ত ১২১
পেড্রো জিস্কো এডগ্রাড বাগ ১২৬
পেত্রার্ক ১-১৬,১৭,২১,৩৭,৩৮
পো ৩৭,১১২
পোপ ৬৮
পোপেয়েল কবিতা ১২৪
প্রতীকী কবিতা ৩২,৪২,৫৭
প্রতীকী ও রোমান্টিক কবিতার পার্থক্য
৯৯,১০৭,১১২
প্রাৎস, মারিও ৬০
প্লেটো, প্লেটনিক প্রেম ৯,১০,২০,২২,৪৪,১১০,
১১২
প্যার্স, সাঁ-জন্‌ ৫৫,৮৪,৯৯-১০৮

ফিউচারিজম ১১১
ফিট্‌জারেল্ড ৬৫,৬৮
ফ্রয়েড ৫৩,৯৫,১১৩
ফ্রেজার ৫৯
ফ্লিট ৩৭
ফ্লোরা ফ্রান্‌চেস্‌কো ৪৬

বলরাম বসাক ১২১
বাওরা, সি.এম্‌ ৭৭
বাটলার ৬৮
বার্ন ৬৫
বার্ন্ট ৬৫
বায়রন ৬৫
বিশুদ্ধ কবিতা ৪৬
বীট ১২৮
বুদ্ধ ৮৮
বেড্‌ডোস ৬৫
বের্গস ৪৯,৫২ (দর্শন) ৫৩,৫৪, ১০৪ (দর্শন)
১১৩ (ইতিহাস)
বৈষ্ণব দর্শন ৮,৯
বোকাচ্চিও ২,৯, ১০,১৫,১৭-২৮
বোদলেয়ার ১১,১৪,১৯,৪৪,৪৬,৪৭ (প্রতিবন্ধ)
৪৮,৫৮, (নারীচেতনা). ৫৭,৬৭,৬৯,৮৩,৮৪
১০১, ১০২,১০৯
ব্রাউনিঙ ৬৫,৬৮,৭৪,৭৫
ব্রাক্ক ৭
ব্রুক্‌স্‌ ১২২
ব্রেতোঁ ১২৭

ভলতেয়ার ২৫
ভাবলিপি ৬৬,১২৫-২৭
ভার্জিল ২,৩,১৫,৩৭,৪৬